ভূমিকা

মনে হচ্ছে মধ্যকালীন ভারতের ইতিহাস নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সব গবেষণাপত্র একত্র করে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে যাতে দেশের বিভিন্ন অংশের শিক্ষক ও ছাত্রদের (সেই সঙ্গে অন্যান্য আগ্রহী ব্যক্তিদের) হাতে সেগুলি পৌঁছয়। এই লক্ষ্য সামনে রেখেই বর্তমান সম্পাদক তাঁর সহকর্মীদের সাহায্যে হিন্দীতে একটি বার্ষিক প্রকাশন, 'মধ্যকালীন ভারত' বার করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানীর উদ্যোগে বাংলায় এই একই ধরনের নিবন্ধ-সংকলন মাঝে মাঝে বেরুচ্ছে দেখে আমি খুবই আনন্দিত। বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে মূল ইংরিজি রচনা থেকে। আশা করা যায়, প্রকাশিত নিবন্ধাবলিতে আলোচিত মধ্যকালীন ভারতের ইতিহাস সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক ভবিষ্যৎ খণ্ডগুলিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে চলবে; এবং দলিলপত্র ও গ্রন্থ-সমালোচনাও থাকবে।

১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ — **ইরফান হবিব**

সূচীপত্র

১

প্রারম্ভিক মধ্যযুগীয় মিশ্রব্যবস্থায় ভারতীয় কৃষকশ্রেণীর নিশ্চল জীবনযাপন ও ব্যবস্থা

বি. এন. এস. যাদব

কৃষক ও অন্যান্য অবনমিত জনগোষ্ঠীর গমনাগমনের উপর বাধানিষেধ, সীমিত সুযোগবিশিষ্ট স্থানীয় অর্থনৈতিক শর্তাবলিতে তাদের অধীনস্থতা, জমির মধ্যস্বত্বভোগী সম্প্রদায় এবং জমিদার অভিজাততন্ত্রের উত্থান—ব্যাপক অর্থে এইগুলিই ছিল সামন্ততন্ত্রের[১] মূল উপাদান। প্রস্তরোৎকীর্ণ প্রমাণাদির বিস্তৃত সংগ্রহ, চীনা পর্যটকের বিবরণ, এবং ভারতপ্রসঙ্গ-সম্বলিত তৎকালীন কিছু রচনা নিয়ে সম্প্রতি গবেষণা করেছেন রামশরণ শর্মা।[২] কোনো গ্রামের সমস্ত কৃষককে হস্তান্তরিত করার প্রথাটির হদিস তিনি পেয়েছেন ষষ্ঠ শতাব্দীতে উড়িষ্যার অনগ্রসর এলাকাসমূহে ও মধ্যভারতে।[৩] এছাড়া আসাম, বাংলা (সেন অনুদান), বিহার, বুন্দেলখণ্ড (চন্দেল অনুদান), রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ও ছাম্ব-এর পার্বত্য রাজ্য থেকে পাওয়া একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর লেখগুলিতে শাসকবর্গ কর্তৃক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ব্রাহ্মণদের ভূমিদান ও গ্রামদানের সঙ্গেই উল্লেখ রয়েছে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে কৃষক বা কারিগরদের, কোথাও এমনকী কারবারি এবং গ্রাম পরিচারকবর্গে'রও হস্তান্তরের।[৪] এ-ধরনের অনুদান অনেক সময় ধর্মনিরপেক্ষও হত।[৫]

কৃষক, কারিগর প্রভৃতিদের গমনাধিকার সংকোচন বা তাদের অধীনস্থতা সম্পর্কে লেখগুলি থেকে স্পষ্টভাবে কিছু জানা যায় না। কোনো কোনো গবেষক সিদ্ধান্ত করেছেন যে, "গ্রামদান বাস্তুবিকপক্ষে গ্রামবাসীসহ গ্রামদান, যার অর্থ হল—এযাবৎ যে-প্রজারা রাজাকে কর দিয়ে এসেছে এবার থেকে তাদের কর দিতে হবে ঐ দানগ্রহীতাকে।"[৬] যুক্তিস্বরূপ বলা হয়েছে যে, গ্রামদান প্রসঙ্গে কৃষক, কারিগর প্রভৃতিদের উল্লেখ থেকে তাদের গমনাগমনে বাধানিষেধ বা পরাধীন দশার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না ; শুধু এটাই বোঝা যায় যে তাদের কেউ কেউ দাস ছিল, এবং অন্যান্যরা হয় গ্রামপরিচারক হিসাবে গ্রামের সাধারণ জমি বা রাষ্ট্রীয় ভূসম্পত্তি ভোগ করত, নাহয় ব্যবসাদি করত যে-সবের রাজস্বে ছিল রাষ্ট্রের একাধিকার।[৭]

লেখগুলি থেকে পাওয়া তথ্যের সম্পূরণ ও স্পষ্টীকরণ হয় পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র ও সমসাময়িক অন্যান্য সাহিত্যকর্মে। স্কন্দপুরাণ (যেটিকে ৮ম-

৯ম শতাব্দী থেকে ১৩শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ের বলে ধরা যায়) থেকে আকর্ষণীয় তথ্যাদি পাওয়া যায়। পুরাকালে রাজা রাম কর্তৃক, কোনো এক ধর্মানুষ্ঠানের পরে, ১৮০০০ ব্রাহ্মণকে ৩৬০০০ বৈশ্য ও তার চতুর্গুণসংখ্যক শূদ্রসহ অনেকগুলি গ্রামদানের কিংবদন্তীটির[৮] দীর্ঘ বর্ণনা এই পুরাণে আছে। বৈশ্য ও শূদ্ররা স্পষ্টতই উৎসর্গীকৃত হয়েছিল দানগ্রহীতা-দের[৯] পরিষেবার্থে, যে-গ্রহীতারা পরে গ্রামগুলিকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছিল। এহেন হস্তান্তরিত প্রজাদের রাম আদেশ দিয়েছিলেন গ্রহীতাদের হুকুম মেনে চলতে, এবং কায়মনোবাক্যে তাদের সেবা করতে।[১০] তিনি আরো ঘোষণা করেছিলেন যে, দানগ্রহীতাদের পরিষেবার্থে যে-শূদ্র নতমস্তকে নিয়োজিত থাকবে সে-ই উন্নতি করবে, এবং এই কর্তব্যপথ থেকে বিচ্যুত ব্যক্তি দারিদ্র্যকবলিত হবে।[১১] যবন, ম্লেচ্ছ, দৈত্য বা রাক্ষসদের ভয় দেখানো হয়েছিল, গ্রহীতাদের কোনো কাজে বিঘ্নসৃষ্টি করলে ভস্ম হয়ে যেতে হবে।[১২] কাহিনীটি এরপর বিস্তৃত হয়েছে কলিযুগ পর্যন্ত, জৈন মতাবলম্বী রাজা কুমারপাল যখন ঐ গ্রহীতা-গণের বংশধরদের ভূসম্পত্তি কেড়ে নিয়েছিলেন। এই কুমারপাল ছিলেন ব্রহ্মাবর্তের শাসক।[১৩] ব্রাহ্মণরা কুমারপালের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেছিল তাঁর শ্বশুর—এবং সম্ভবত তাঁর অধিরাজ—কান্যকুব্জ-নিবাসী রাজা অমা-র[১৪] কাছে। কিন্তু রাজা অমা-র সাহায্যে হৃত সম্পত্তি উদ্ধার করতে ব্রাহ্মণরা পারেনি। শেষ পর্যন্ত তাদের কয়েকজন গিয়েছিল সেতুবন্ধ রামেশ্বরে হনুমত-এর সাহায্য প্রার্থনায়। হনুমতের কাছে তাদের দুঃখ বর্ণনার সময় তারা পূর্বপুরুষগণের উদ্দেশে রাম-কর্তৃক অনুদত্ত গ্রামগুলির উত্তরাধিকারই শুধু দাবি করেনি, তারা অধিকার দাবি করেছিল গ্রামবাসী সেই শূদ্র ও বৈশ্যদের উপরও[১৫], যাদের পূর্বপুরুষগণ রাম কর্তৃক হস্তান্তরিত হয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলির সঙ্গে। হনুমত-এর সহায়তায় তারা শেষ পর্যন্ত রাজার কাছ থেকে এই মর্মে মঞ্জুরি আদায় করতে সফল হয়েছিল যাতে কয়েকটি গ্রামের উপর, এবং সেগুলির জন্য নির্দিষ্ট পরিচারক হিসাবে 'অর্ধবিজ' বলে পরিচিত গ্রামবাসীদের উপর তাদের অধিকার বর্তায়।[১৬] যে-শূদ্ররা ভক্তিসহকারে দ্বিজসেবা করত এবং জৈনধর্মের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকত তাদের 'উত্তম' বলা হত।[১৭] অন্যদিকে যে শূদ্ররা, এবং এমনকী বিপ্ররাও, নির্দেশ অমান্য করার ঔদ্ধত্য দেখাত তাদের দমন করা হত গ্রাম অনুদানের শর্তাদি থেকে উদ্ভূত কাঠামোয় শৃঙ্খলিত করে। 'প্রতিবন্ধেন যোজিতঃ'-তে[১৮] এইরকমই উল্লেখ আছে। শূদ্র ও বৈশ্যদের আদর্শ আচরণবিধি হিসাবে নির্দিষ্ট ছিল দানগ্রহীতাদের সেবা করা ও খাজনা দেওয়া,[১৯] এবং কখনো এই আনুগত্য থেকে বিচ্যুত না হওয়া।[২০]

সমাজসচেতনতাকে সামাজিক অস্তিত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব

নয়, এবং যাজকবৃত্তিভোগীদের অধিকৃত জাগিরগুলির বাস্তব পরিস্থিতিকে এর মাধ্যমেই আমরা বুঝতে পারি। স্পষ্টতই, হস্তান্তরিত[২১] শূদ্র ও বৈশ্যরা দাস ছিল না ; তাদের সবাইকে গ্রামপরিচারকের কাজও করতে হত না। দানগ্রহীতাদের খাজনা দেওয়া ও আজীবন সেবা করার অধীনতা-সম্পর্কটি এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে পরিবাহিত হবে, এ-রকমই ভাবা হয়েছিল। তাছাড়া, গমনাগমনে বাধাদানের জন্য সাধারণত ধর্মীয় অনুমোদন ব্যবহৃত হলেও এ ব্যাপারে বলপ্রয়োগের কিছু কিছু নিদর্শনও 'প্রতিবন্ধেন যোজিতঃ'-তে মেলে।

উপস্থাপিত তথ্যাদি থেকে প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, আনুমানিক ৬০০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী পর্যায়ে শূদ্ররা মূলত নিযুক্ত ছিল কৃষিতে,[২২] যদিও কয়েকটি গোষ্ঠীর মধ্যে যন্ত্রশিল্প, হস্তশিল্প ও অন্যান্য বৃত্তির চর্চাও ছিল। প্রারম্ভিক যুগে মূলত দাস ও ভাড়াটে শ্রমিক থেকে এ-যুগে শূদ্র জনগোষ্ঠীর মূলত কৃষকে রূপান্তরের এই ঘটনাটিকে ভারতবর্ষে সামন্ততন্ত্র উদ্ভবের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।[২৩] বৈশ্যদের শূদ্রস্তরে নামিয়ে আনার ঝোঁকটি প্রারম্ভিক যুগে অল্পস্বল্পই ছিল ; এ-যুগে তা প্রবল হয়ে উঠেছিল।[২৪]

মেধাতিথি (নবম শতাব্দী) উচ্চবর্ণের প্রতি শূদ্রদের সাধারণ অধীনতার তত্ত্বটির পুনরুক্তি করেছেন, এবং অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে জোর দিয়েছেন স্ব-স্ব প্রভুর এলাকায় শূদ্রদের পরিসীমিত রাখার বিষয়টিকে। এ-তে স্বভাবতই নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে তাদের গমনাগমন, এবং কৃষক ও অন্যান্য মেহনতি জনগোষ্ঠীকে বশে রাখায় সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠে মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার ও সর্দাররা। 'মনুস্মৃতি'-র একটি শ্লোকের ভাষ্য দিতে গিয়ে তিনি বলেন:[২৫]

> যেহেতু দ্বিজসেবাই ছিল শূদ্রদের কর্তব্য তাই এলাকার বাইরে তাদের যাওয়া চলত না, এবং যাঁর তারা অধীন সেই অধীন সেই দ্বিজের সেবা করেই তাদের জীবিকা অর্জন করতে হত। কোনো শূদ্রের পরিবার অনেক বড় হলে, বা তাদের কেউ দ্বিজসেবার অযোগ্য বলে বিবেচিত হলে, সে জীবিকা অর্জন ও বসবাসের জন্য দেশান্তরে যাওয়ার অনুমতি পেত, অবশ্যই সেইসব-দেশে যেখানে ম্লেচ্ছরা সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়।

অবশ্য, অন্যত্র ধনবান শূদ্রের উচ্চবর্ণের প্রতি অধীনস্থতা থেকে মুক্তিলাভের অধিকারকে মেধাতিথি স্বীকৃতি দিয়েছেন।[২৬]

শূদ্রজাতির অধীনস্থতা প্রারম্ভিক মধ্যযুগে একটি ধর্মীয় মতাদর্শ হিসাবে প্রবল হয়ে উঠেছিল। পুষ্করিণী, কূপ, ভোজন গৃহ, উদ্যান ইত্যাদি দানের (পূর্তধর্ম)[২৭] এবং তা-থেকে পুণ্য অর্জনের সুযোগ তাদের থাকলেও চতুর্থ আশ্রমের অধিকার অর্থাৎ মুক্তিলাভের অধিকার মেধাতিথি[২৮] শূদ্রদের এই কারণে দেননি যে তারা পারত শুধু গৃহস্থ হয়েই থাকতে, এবং দ্বিজসেবা সন্তানোৎপাদনের মধ্য দিয়ে

পুণ্য অর্জন করতে। ১১শ শতাব্দীতে অলবেরুনি লক্ষ করেন যে এই মনোভাব শুধু শূদ্র নয় বৈশ্যদের[২৯] প্রতিও ছিল, যদিও তিনি আরো অনেকের উল্লেখ করেছেন যাঁরা এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন না।[৩০] বস্তুত, উচ্চতর দর্শনে এ-বিষয়টি বিশেষ আলোচিত হয়নি।

জৈনরা জাতিভেদপ্রথার বিরোধিতা করতেন, কিন্তু সোমদেব সূরি-র 'যশতিলক' (১০ম শতাব্দী) থেকে জানা যায়—জৈনদের রক্ষণশীল অংশটির মধ্যে এই ধারণা গড়ে উঠেছিল যে, ধর্মীয় দীক্ষাগ্রহণের অধিকার শূদ্রদের থাকতে পারে না।[৩১] শূদ্রের মোক্ষলাভের অধিকার না-থাকা তার পার্থিব পরাধীনদশারই প্রতিফলন বলে ধরা যায়। অবশ্য, ১১শ ও ১২শ শতাব্দীতে তন্ত্র এবং অন্য কয়েকটি ধর্মমতের প্রসার ঘটে যেগুলিতে শূদ্রের মোক্ষলাভের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।

সর্দার ও শাসকবর্গের জাগির ও রাজ্যসীমায় বসবাসকারী কৃষক এবং অন্যান্য মেহনতি জনগোষ্ঠীর অবস্থা সম্পর্কে আরো কিছু ধারণা আমরা পাই। লক্ষ্মীধর (১২শ শতাব্দী)-এর 'রাজধর্মকাণ্ড'-এ অনুমোদনসহ উদ্ধৃত 'নারদস্মৃতি'-র[৩২] এক শ্লোকে জীবনধারণের উপকরণের জন্য শাসকের উপর নির্ভরশীল প্রজাদের বর্ণনা করা হয়েছে শাসকের, 'তপস্' বা তপঃশক্তি দ্বারা ক্রীতজন হিসাবে, এবং তাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে ঐ শাসকের আজ্ঞাধীন থাকতে। বিভিন্ন নিষেধ-বিধির মধ্যে কর্মরত একেকটি পরনির্ভর সম্প্রদায়কে এখানে রাজনৈতিক একক হিসাবে ধরা হয়েছে। কৃষি, পশুপালন ইত্যাদির দ্বারা লক্ষ্মীধর 'বর্ত' শব্দটির[৩৩] ব্যাখ্যা করেছেন অথচ বাণিজ্য (প্রাচীন গ্রন্থাদিতে যেটিকে ঐ শব্দের সারার্থ হিসাবে পাওয়া যায়) কথাটি রয়েছে অনুল্লিখিত। এ-থেকে মনে হয় যে তখনকার সামাজিক কাঠামোটি ছিল কৃষিপ্রধান।

বৌদ্ধদোহা (চর্যাপদ ১২)-য় বন্ধনের মূল কারণ যে অজ্ঞানতা, তাতে নিমজ্জিত চিত্তকে বলা হয়েছে ঠাকুর[৩৪], যেটি ১০ম শতাব্দীর পর থেকে অভিজাত জমিদার শাসকবর্গের উপাধি হিসাবে সুপরিচিত হয়ে ওঠে। 'উপমিতিভাব প্রপঞ্চকথা' (১০ম শতাব্দীর প্রারম্ভে)-তেও, যাতে সামন্তীয় বর্গক্রম স্পষ্টত-ই প্রতিফলিত, সংসারবন্ধনকে তুলনা করা হয়েছে সর্দার বা শাসকের জাগিরের সঙ্গে। এই গ্রন্থের কয়েকটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে, একজন শাসকের রাজ্যের মধ্যে বসবাসকারী দীন ও পতিত জনসাধারণ তাদের জীবনধারণের উপকরণের জন্য শাসকের উপর নির্ভরশীল ছিল, এবং একমাত্র মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তারা পারত ঐ বদ্ধ কাঠামোর বাইরে আসতে ও পরিচর্যাব্রত থেকে নিষ্কৃতি পেতে।[৩৫] অতিশয়োক্তি থাকলেও, রূপকটির বাস্তবতা অনস্বীকার্য।

কৃষকের অধীনস্থতার ইঙ্গিত রয়েছে বৃহন্নারদীয় পুরাণ (৯ম শতাব্দী)-এর একটি শ্লোকে, যাতে কৃষিকাজ নির্বাহের জন্য লাঙলে বাঁধা মানুষদের (বদ্ধহলৈঃ)[৩৬] কথা আছে, এবং আরো বলা হয়েছে যে, কলিযুগে কৃষিকাজ

বিনষ্ট হবে। এ-প্রসঙ্গে 'লেখপদ্ধতি'-তে[৩৭] 'ভূমিসংস্থা'র জন্য একটি নমুনা দলিলও তাৎপর্যপূর্ণ। একটি অঞ্চলের অন্তর্গত গ্রামসমূহের অধিবাসীদের উদ্দেশে এক রাণা-কর্তৃক অনুমোদনীয় এই অধিকারপত্রে (গুণপত্র) কুটিরবাসী কৃষক (কুটুম্বিক)-দের বলা হয়েছে তাদের নামে নথিভুক্ত জমি (নিবন্ধভূমি) চাষ করতে, অকর্ষিত জমির জন্য জরিমানা এবং স্থানীয় রীতি অনুসারে খাজনা ও সেবা দিতে[৩৮]-এর মধ্যে স্থানীয় আধিকারিক, গ্রাম-কারিগর প্রমুখদের দেয় শস্যের অংশ ভাগও ধরা হয়েছে।[৩৯] এতে বলা হয়েছে যে চাল, গম, বার্লি ইত্যাদির বীজ কৃষকরা খামার বা ঝাড়াই ঘর থেকে পাবে ; অন্যান্য বীজ সংগ্রহের দায়িত্ব তাদের নিজেদের। ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ সর্দারের ভাগ হিসাবে তাঁর শস্যাগারে পৌঁছে দেওয়ার পর বাকি এক-তৃতীয়াংশ ফসল কৃষকরা নিজেদের জন্য রাখতে পারবে। ফসল চুরির প্রথম অপরাধে কৃষককে সতর্ক করা হবে, কিন্তু ঐ প্রবৃত্তি যদি সে ত্যাগ করতে না পারে তাহলে তাকে প্রাপ্য ফসলের ভাগ থেকে বঞ্চিত, এমনকী গ্রাম থেকে বিতাড়িত পর্যন্ত, করা হতে পারে। কৃষকের অভিযোগও শোনা হবে, তবে ব্যক্তিগতভাবে কোনো একজনের নয়, অন্ততপক্ষে চারজনকে একসঙ্গে উপস্থিত হতে হবে গুণপত্রসহ। গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও বসবাসকারী কৃষকের জমি, ফসল, গবাদিপশু ও অন্যান্য সম্পত্তি সর্দার বা শাসক দখল করতে পারেন।[৪০]

শোষিত ও অধীনস্থ কৃষককে এখানে এক ধরনের ভাগচাষী[৪১] হিসাবে দেখানো হয়েছে যার প্রাপ্য হল ফসলের এক-তৃতীয়াংশ। লিখনটিতে বিশেষতঃ পশ্চিম ভারত ও রাজস্থানের পরিস্থিতি প্রতিফলিত থাকায় এ-ধরনের ভাগচাষ ঐ অঞ্চলের স্থানীয় প্রথা হিসাবে ধরা যেতে পারে। কিন্তু অন্যান্য প্রমাণাদি থেকে, বিশেষত 'পরাশরস্মৃতি' (৬০০-৯০০ খ্রিষ্টাব্দ)-তে[৪২] একটি মিশ্র বর্ণ হিসাবে 'অধিকা' (ভাগচাষী)-র উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে, ভাগচাষপ্রথা ঐ সময়ে ব্যাপকভাবেই প্রচলিত ছিল।

আলোচ্য দলিলটি আরো পরবর্তীকালের (সংবৎ ১৪০৭) বলে সাহিত্যে[৪৩] উল্লিখিত হলেও সে-সময়ের আগেকার রীতিনীতিই এতে প্রতিফলিত হয়েছে। 'লেখপদ্ধতি'র এই প্রমাণের পাশাপাশি জিনসেন (৯ম শতাব্দী)-এর 'আদি পুরাণ'-কে রাখা যায় ; এতেও ঐ অঞ্চলের পরিস্থিতি প্রতিফলিত হয়েছে। 'আদি পুরাণ'-এ শাসককে বলা হয়েছে প্রজাদের এমনভাবে রক্ষা ও প্রতিপালন করতে, যেভাবে একজন গোপালক তার গবাদি পশুর তত্ত্বাবধান করে।[৪৪] এতে নির্দেশ দেওয়া আছে, যেভাবে একজন গোপালক তার গাভীদের উত্তম চারণভূমিতে নিয়ে যায় ও পরে যথাসময়ে তাদের দোহন করে নিজের প্রয়োজনীয় দুধ সংগ্রহ করে, ঠিক সেইভাবে একজন শাসকের উচিত বীজ ও অন্যান্য উপকরণ 'কর্মান্তিক'-দের প্রয়োজন মতো সরবরাহ করে তারপর তাদের, দিয়েই 'ভক্তগ্রাম'গুলিতে কৃষিকাজ করিয়ে নেওয়া।[৪৫] জমির স্বত্বনিয়োগের

বিষয়টিরও ইঙ্গিত এখানে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। শাসককে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তাঁর রাজ্যের সমস্ত অঞ্চলের 'কৃষিওয়ালা'-দের সঙ্গে ঐ ব্যাপারটি সেরে নিতে, এবং তাদের সবার কাছ থেকেই ফসলের উচিতভাগটুকু নিতে।[৪৬] শাসক, অতএব, এখানে চিত্রিত হয়েছেন মুখ্যত একজন ভূস্বামী কৃষকরূপে। কৃষকদের, বিশেষত ভক্তগ্রামগুলির অধিবাসীদের, দেখানো হয়েছে শাসক ও জমির উপর নির্ভরশীল ভাগচাষী বা অস্থায়ী প্রজা হিসাবে। আপাতদৃষ্টিতে, সম্পূর্ণ বিষয়টিই উপস্থাপিত হয়েছে কৃষকের অধীনস্থতার বিষয়টিকে মতদর্শগত প্রলেপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে। নির্ভরশীল প্রজাস্বত্বের অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল বৌদ্ধ মঠগুলির অন্তর্গত জমিতেও; যেখানে কৃষকদের জমি ও বলদ দেওয়া হত, এবং সাধারণত ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ খাজনা নেওয়া হত।[৪৭] কিন্তু কৃষকরা যে নিদারুণ বশ্যতার মধ্যে ছিল এরকম কোনো তথ্য ঐ রচনাটিতে নেই।

কম-বেশি বদ্ধ অর্থনীতির স্থানীয় অঞ্চলগুলিকে বসবাসকারী অবনমিত জনগোষ্ঠীর গতিবিধির উপর নিষেধ আরোপ কীভাবে করা হত সে-সম্পর্কে দক্ষিণ ভারতের একটি লেখ-র (১১৭৩ খ্রিষ্টাব্দ) উল্লেখ করা যায়। সেখানে বলা আছেঃ

> গ্রামের বাইরে গিয়ে যাঁরা এ সমস্ত কাজে নিযুক্ত হবেন, ধরা হবে যে তাঁরা আইন লঙ্ঘন করেছেন, সম্প্রদায় গ্রামবাসীর প্রতি অন্যায় করেছেন, এবং গ্রামের সর্বনাশ করেছেন।[৪৮]

গ্রামগুলির আপেক্ষিক বিচ্ছিন্নতা ভারতীয় আর্থ-সামাজিক কাঠামোরই এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলেও, সামন্তীয় ঝোঁকগুলির দরুন, বদ্ধ অর্থনীতিপুষ্ট আঞ্চলিকতাবাদ এ-সময়ে এত বেশি মাথা চাড়া দিয়েছিল যে, একেক গ্রামে একেক ধরনের স্থানীয় প্রথা ও বিধিনিষেধ চালু হয়েছিল। 'বৃহন্নারদীয়', 'দেবীভাগবত' ও 'স্কন্দ' পুরাণের অন্তিম পরিচ্ছেদগুলিতে 'দেশধর্ম' ও 'জাতিধর্ম' ছাড়াও 'গ্রামাচার'[৪৯], 'গ্রামধর্ম'[৫০] এবং 'স্থানাচার'[৫১] পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্থানিকতা ও আঞ্চলিকতাবাদ চাগিয়ে তোলার পিছনে অভিজাত সামন্তপ্রভুদের হাত ছিল।[৫২] গ্রামগুলি অবশ্য সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একক ছিল না। ধর্মীয় ও বিবাহাদি ব্যাপারে বহির্দুনিয়ার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ হত।

কৃষকদের প্রতি রাজপুত্র ও সর্দারদের মনোভাব এবং স্থানীয় কৃষি অর্থনীতি চালু রাখার জন্য তাদের উদ্বেগের বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে ভোজ-এর 'যুক্তিকল্পতরু' (১১শ শতাব্দী)-তে। ঐ গ্রন্থে জোর দেওয়া হয়েছে প্রতিটি গ্রামে, 'কৃষিওয়ালা'-দের রক্ষণাবেক্ষণের আবশ্যকতার উপর, কারণ সমস্ত সম্পদের উৎস যে কৃষি তা নির্ভর করে তাদেরই শ্রমের উপর।[৫৩] এ-ধরনের মনোভাব নিশ্চয়ই কৃষকের গতিবিধি ও স্বাধীনতাকে আরো কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। সেই যুগের শাসকরা মন্দির, মঠ ও ব্রাহ্মণদের এবং এমন-কী

বেতনভোগী আধিকারিক ও কর্মচারীদেরও. গ্রামদান মঞ্জুর করতে থাকলেন —শুধু যে গ্রামের রাজস্ব আদায়, ও গ্রামবাসীদের উপর সাপেক্ষ কর্তৃত্ব করার অধিকারসহ তা-ই নয়, তৎসহ গ্রামে বসবাসকারী কৃষক, কারিগর ইত্যাদির উপর সুনির্দিষ্ট কর্তৃত্ব এবং ভূসম্পত্তির অধিকার সহযোগেও। কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে পড়ার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অবশ্য যে কোনো প্রকারের দানগ্রহীতাই জনসাধারণের উপর তার অধিকার বৃদ্ধি করতে পারত। কিন্তু জনগণের অধীনস্থতার এটিই একমাত্র কারণ ছিল না। পশ্চাৎপদ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলিতেই ঐ পরিণতির সম্ভাবনা বেশি ছিল।

ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভক্ত অভিজাততন্ত্রের উত্থান ও বিনিময়-অর্থনীতির দুর্বল ভূমিকার জন্য (বিশেষত আঞ্চলিকতাবাদ অধ্যুষিত কৃষি-অর্থনীতির কাঠামোতে) গুপ্তযুগ-এর পরবর্তীকালে বাধ্যতামূলক শ্রম ব্যাপকহারে বেড়ে যেতে থাকে।[৫৪] সর্দার ও গ্রামাধিপতিদের জাগির এবং রাজ্যগুলিতে খাজনা ও দমনপীড়ন ক্রমশ বাড়িয়ে যাওয়ার প্রচুর তথ্য পাওয়া গেছে। আইন-বহির্ভূত যথেচ্ছ আদায়টাই কোথাও আইন হয়ে গিয়েছিল।

সর্দার, আধিকারিক, সেনাপতি এবং এমনকী ব্রাহ্মণ ও ধর্মপ্রতিষ্ঠানের জাগিরগুলিও ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের 'ম্যানর' বলে পরিচিত ভূস্বামীদের জাগিরের সঙ্গে মোটামুটিভাবে তুলনীয়। মার্ক ব্লক-এর ব্যাখ্যানুযায়ী ঐ ভূস্বামীরাই ছিল ইউরোপের প্রথম এবং অগ্রগণ্য "পরমুখাপেক্ষী সম্প্রদায় যারা কখনো রক্ষিত, কখনো আদিষ্ট, এবং কখনো বা নিপীড়িত হত তাদের প্রভুদের দ্বারা, যে-প্রভুর সঙ্গে তাদের অনেকেরই বংশগত বন্ধন ছিল!"[৫৫] কিন্তু প্রাচীন ঐ ম্যানর-ব্যবস্থা ছিল "জমিস্বত্ব-ভিত্তিক এক বিশেষ ধরনের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক সংগঠন" এবং "অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ ও পণ্যবিনিময়-অর্থনীতির[৫৬] যুগের সঙ্গে মানানসই।" আর তাই বহুদিক থেকেই ভারতীয় প্রতিরূপটির সঙ্গে এর অমিল ছিল। ভারতীয় পরিস্থিতিতে কৃষকের বশ্যতা ও নির্ভরশীলতার তীব্রতা ও সুযোগ ছিল পাশ্চাত্য সামন্ততন্ত্রের দাসকৃষকদের তুলনায় কম। সেখানে প্রভুর খামারে বাধ্যশ্রম ও বহুবিধ খাজনার চাপে কৃষকদের প্রভু ও জমির আশ্রয়াধীন করে রাখা হত।[৫৭]

'বৃহন্নারদীয় পুরাণ'-এ[৫৮] বলা হয়েছে যে, দুর্ভিক্ষ ও খাজনার চাপে দুর্দশাগ্রস্ত জনতা দলে দলে গ্রামত্যাগ করত, এবং গম ও বার্লিসমৃদ্ধ অঞ্চলে গিয়ে বসবাস শুরু করত। বিদ্যাকর (১২শ শতাব্দী)-এর 'সুভাষিত-রত্নকোষ'-এর একটি শ্লোক থেকে এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, 'ভোগপতি' (জমিদার বা সামন্তসর্দার)-র অত্যাচারেও জনগণ গ্রামত্যাগী হত।[৫৯] তাছাড়া, ভারতবর্ষে মজুরির সামাজিক ভূমিকা পাশ্চাত্য ম্যানর-ব্যবস্থার মতো অতটা গুরুত্বহীন ছিল না।[৬০] এটাও উল্লেখ করার মতো যে, ধর্মশাস্ত্রীয় সাহিত্যের

ব্যাপক প্রভাব[৬১] থাকার ফলে তদন্তর্গত 'ধর্মে'র নিয়ন্ত্রণবিধিগুলি হয়ত—অনেকটা ইংল্যাণ্ডের পাবলিক ল-এর[৬২] মতো—সামন্তবাদের প্রধান লক্ষণ যে এলাকাবাদ, তার বিরুদ্ধে এক যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ঐক্যবিধায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করেছিল। ফলস্বরূপ, ন্যায়বিচার ও সামাজিক প্রথাগুলিকে (সম্পত্তির আইনসহ) ব্যাপকভাবে সামন্তীয় ধাঁচে পর্যবসিত করা যায়নি। সামন্তীয় ধাঁচের আইনকানুন ভারতবর্ষের কোনো কোনো অঞ্চলে চালু থাকলেও সেগুলি কখনোই—মধ্যযুগীয় ইউরোপের কয়েকটি অঞ্চলে যেমন হয়েছিল—তেমন সুসংবদ্ধ ও সুব্যবস্থিত হয়ে উঠতে পারেনি।

ভারতীয় অর্থনীতির সাধারণ সাদৃশ্য ছিল—যতটা না প্রথম সামন্তযুগের, তার চেয়ে বেশি পরবর্তী সামন্তযুগের ম্যানর-ব্যবস্থার সঙ্গে। ১২শ শতাব্দীর ঐ যুগটিকে কতকগুলি লক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত করা যায়, যেমন, খাসজমির পরিমাণ হ্রাস, বাধ্যশ্রমমূলক পরিষেবার অবনতি, জাগিরদার কর্তৃক জাগিরের ব্যক্তিগত শোষণ, করভারে পর্যুদস্ত অথচ অর্থনীতিগতভাবে স্বশাসিত উৎপাদকের ভূমিকায় কৃষকের অবস্থান্তর, এবং সর্বোপরি, মানুষ কর্তৃক মানুষের উপর শোষণের শিথিলতা।[৬৩]

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দাসত্বাধীন শূদ্ররা হয়তো কখনো কখনো হিংসার আশ্রয় নিয়েছে। এ-প্রসঙ্গে মহীপাল ও রামপালের রাজত্বকালে বাংলায় কৈবর্তদের সশস্ত্র বিদ্রোহের[৬৪] প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু এ-ধরনের দৃষ্টান্ত খুব বেশি চোখে পড়ে না, এবং ভারতবর্ষের তৎকালীন পরিস্থিতিও মধ্যযুগীয় ইউরোপের মতো ছিল না। ঐতিহ্যের প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধা, বিশেষ ধরনের ধর্মীয় ও সামাজিক মতাদর্শ যার ফলে মানুষ তদানীন্তন ব্যবস্থাকেই নিয়তিনির্দেশ বলে মেনে নিয়েছিল, এবং সামাজিক বর্ণভেদ—বিশেষত শূদ্রদের মধ্য থেকেই বহুসংখ্যক জাতপাতের উদ্ভব[৬৫]—এইসবের ফলে সশস্ত্র বিদ্রোহ সংগঠনের প্রবণতাগুলি মাথা চাড়া দিতে পারেনি। অবশ্য কোনোকোনো ঘটনার মধ্য দিয়ে শূদ্রদের অবাধ্যতার দুয়েকটি নিদর্শনও মেলে। এ-প্রসঙ্গে স্কন্দপুরাণ-এ[৬৬] বলা হয়েছে অধিকারপত্রের প্রতি অবাধ্যতার কথা, যে অধিকারপত্রের বলে বৃত্তিভোগীরা গ্রামগুলিকে স্ববশে রাখত। কথাসরিৎসাগর-এও[৬৭] একটি উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, প্রজাপীড়ন ও কুশাসনের ফলে ভূম্যধিকারীদের পতন এবং সম্পত্তিনাশ হতে পারে। কিন্তু এটা জানা যায় না যে, ঐ পরিণতি কোন্ ঘটনার মধ্য দিয়ে আসতে পারে—সেই পরিস্থিতিতে অনুদত্ত গ্রামগুলির পুনর্গ্রহণ, অথবা গণপ্রতিরোধ ও অভ্যুত্থান?

সাহিত্য, শিলালিপি, এবং মুদ্রা ও পদক সংক্রান্ত তথ্যাদি থেকে ১১শ ও ১২শ শতাব্দীতে—বিশেষত পশ্চিম ভারতে—ব্যবসা ও বাণিজ্যের উন্নতির এবং মুদ্রার ব্যাপকতর ব্যবহারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[৬৮] সাহিত্যে এবং

লেখগুলিতে চাষের পদ্ধতি ও শস্যাদির যা উল্লেখ পাওয়া যায় তা থেকে এক উন্নত স্তরের কৃষি অর্থনীতির ছবিই ফুটে ওঠে। অর্থনৈতিক ঐ প্রগতির ফলেই সম্ভবত কৃষক ও কারিগরদের সামাজিক সচলতার উপর নিষেধাবিধি কিছুটা শিথিল হতে পেরেছিল। কিন্তু অন্যদিকে, ঐতিহ্যানুগতা (যার অন্যতম বহিঃপ্রকাশ হল জাতিভেদপ্রথা), এবং স্বয়ম্ভব গ্রামীণ অর্থনীতির যুগল দৌরাত্ম্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল আঞ্চলিকতাবাদ এবং সামাজিক ও ভৌগোলিক নিশ্চলতা।[৬৯] ফলে, অর্থনৈতিক প্রগতির দরুন জনজীবনে যেটুকু সচলতা আসতে পারত তাও বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। যাই হোক, ঐ দুটি ব্যাপারের একটি-নাহয়-অন্যটিব আধিপত্যভেদের উপরই নির্ভর করত আঞ্চলিক বিভিন্নতাগুলি।

১২শ শতাব্দীতে গহড়বাল রাজ্যের পরিস্থিতির প্রতিফলন দেখা যায় 'লতাকমেলক'-তে। গ্রামের সর্দার 'সংগ্রামবিসর'-কে সেখানে চিত্রিত করা হয়েছে এমন এক ব্যক্তিরূপে যিনি যেকোনো উপায়ে ধন অর্জনে মনোযোগী। এই ধরনের মনোভাবের জন্যই শ্রমসেবার প্রচলন বন্ধ হওয়া এবং গ্রামের অবদমিত জনগোষ্ঠীর গতিবিধির উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ শিথিল হওয়া সম্ভব হয়েছিল। কাশ্মিরে অর্থ সঞ্চালন হত, এবং সেখানে বাধ্যশ্রমের বদলে কখনো কখনো নগদ অর্থপ্রদানের ব্যবস্থাও যে ছিল তার সাক্ষ্য পাওয়া যায় 'রাজতরঙ্গিনী'-তে।[৭০] চহমন, চালুক্য, পারমার, গহড়বাল ও চন্দেল রাজ্যের কয়েকটি লেখতে (১১শ-১২শ শতাব্দীর) 'ভিস্তি' (অথাৎ বাধ্যশ্রম) শব্দটির উল্লেখ একবারও না থাকাটা রহস্যজনক। সমসাময়িক কিছু সাহিত্যকর্মে[৭১] ঐ শব্দটির উল্লেখ থাকায় সে-সময় বাধ্যশ্রম সমাজ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এমন ভাবনার কোনো অবকাশই নেই।

সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোগুলি যে বিকাশমান অর্থনীতির সঙ্গে ক্রমশ মানানসই হয়ে উঠছিল তার বেশ কিছু সাক্ষ্য আমরা পাই।[৭২] কয়েকটি চহমন অনুদানে (১২শ শতাব্দী)[৭৩] ভূমিহীন কৃষকদের এক দেবতার উদ্দেশে হস্তান্তরের সুনির্দিষ্ট উল্লেখ রয়েছে। এ-থেকেই বোঝা যায়—রাজস্থানে মুদ্রার ক্রমবর্ধমান ব্যবহার সত্ত্বেও—কৃষকের অধীনস্থতা, ও তাদের সচলতার প্রতিবন্ধকতা ক্রমাগত বেড়েই চলেছিল। বাস্তবিক পক্ষে, কয়েকটি অঞ্চলে ব্রিটিশ যুগ পর্যন্তও টিঁকে ছিল এই ধরনের পরিস্থিতি।[৭৪]

কিন্তু সামগ্রিকভাবে, সুলতানি যুগ থেকেই প্রাচীন ভারতীয় সামন্ততন্ত্র ভেঙে পড়তে শুরু করে। অর্থনৈতিক শক্তিগুলি ১১শ ও ১২শ শতাব্দী থেকেই পশ্চিম ভারতে সামন্ততন্ত্রের প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। অবশ্য এর পতন মূলত হয়েছে পুরানো শাসনতন্ত্র ভেঙে পড়ার মধ্য দিয়ে অভিজাত শাসকগোষ্ঠীর চরিত্র ও সংস্থিতি পাল্টে যাওয়ায়, এবং ব্যাপকতর মুদ্রা সঞ্চালনের ফলে কৃষকদের নগদ অর্থপ্রদান[৭৫] ক্রমশ নিয়মিত হয়ে ওঠায়। কেননা এই সবের

ফলে অর্থনৈতিক সচলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পুরানো ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। ১৪শ শতাব্দীতে শহর ও গ্রামের মধ্যে বৃহদায়তন বাণিজ্যের বিকাশ হয়েছিল বলেও জানা যায়।[১৬] এই সমস্ত কারণেই হয়ত ঝোঁক দেখা দিয়েছিল কৃষকশ্রেণীর উপর বাধানিষেধ কিছুটা শিথিল করার।

টীকা

১. সামন্ততন্ত্রের বিভিন্ন প্রামাণিক সংজ্ঞার্থ ও মৌলিক উপাদানসমূহের উপর আলোচনার জন্য জে. ডব্লু হল : 'কম্পারেটিভ স্টাডিজ্ ইন সোসাইটি এ্যাণ্ড হিস্ট্রি', প্রথম খণ্ড (১৯৬৩), পৃ. ১৬ থেকে দ্রষ্টব্য।

২. আর. এস. শর্মা : 'ইণ্ডিয়ান ফিউড্যালিজ্ম', ৩০০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৫)।

৩. তত্রত্য, পৃ. ৫৫। কৃষককে অধীন করে রাখার ঝোঁকটি আরো কয়েক শতাব্দী আগে শুরু হয়েছিল—"সাম্ আস্পেক্ট্স অফ দ্য চেঞ্জিং অর্ডার ইন ইণ্ডিয়া ড্যুরিং দ্য শক-কুষাণ এইজ্", 'কুষাণ স্টাডিজ্' (প্রাচীন ইতিহাস, সংস্কৃতি ও পুরাতত্ত্ব বিভাগ, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৮)।

৪. আর. এস. শর্মা : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১ ও তারপর।

৫. উদাহরণস্বরূপ, কীর্তিবর্মণের সময়কার একটি চন্দেল্ল লেখ বাস্তব্য পরিবারের জাজুক-এর উদ্দেশে গ্রামবাসীসহ একটি গ্রামদানের উল্লেখ আছে—ই. আই., XXX, সংখ্যা ১৭।

৬. ডি. সি. সরকার (সম্পাদিত) : 'ল্যাণ্ড সিস্টেম অ্যাণ্ড ফিউড্যালিজ্ম ইন এইন্শন্ট ইণ্ডিয়া' (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৬), পৃ. ৬১।

৭. তত্রত্য, পৃ. ৬১।

৮. স্কন্দপুরাণ (ব্রহ্মখণ্ড), ৩, ৩, ৩৫, ৪৪ ও পরবর্তী।

৯. দানগ্রহীতারা গ্রামগুলির প্রভুত্ব ও মালিকানা দাবি করেছিল—তত্রত্য, ৩, ২, ৩৬, ৪৭।

১০. তত্রত্য, ৩, ২, ৩৫, ৫৬।

১১. তত্রত্য, ৩, ২, ৩৫, ৫৭ ও তারপর।

১২. তত্রত্য, ৩, ২, ৩৫, ৫৮।

১৩. তত্রত্য, ৩, ২, ৩৬, ৫৯, ১৮৩।

১৪. অমা-কে শনাক্ত করা গেছে কনৌজনৃপতি যশোবর্মণ-এর পুত্র অমারাজা হিসাবে, যিনি ৮ম শতাব্দীতে প্রভূত সমৃদ্ধি অর্জন করেছিলেন—ডি. সি. সরকার : 'ভারতীয় বিদ্যা', বোম্বাই, VI (১৯৪৫), পৃ. ২৩৭-৪০ ; VII (১৯৪৭), পৃ. ১০২ ও তারপর; 'স্টাডিজ্ ইন দ্য সোসাইটি অ্যাণ্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ এইন্শন্ট অ্যাণ্ড মেডিঈভ্ল ইণ্ডিয়া, I (কলকাতা, ১৯৬৭), পৃ. ১৫৩ ও তারপর।

১৫. মূলত রাম কর্তৃক হস্তান্তরিত বৈশ্য ও শূদ্রদের বংশধরদের কথা বলা হয়েছে।

১৬. 'স্কন্দ পুরাণ', ৩, ২, ৩৮, ৪৮।

১৭. তত্রত্য, ৩, ২, ৩৮, ৬০। আপাতদৃষ্টিতে, জৈনধর্ম ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান-বিরোধী ধর্মের অনুগামী হওয়ার ফলে শূদ্ররা কিছুটা অবাধ্য হয়ে উঠেছিল।

১৮. তত্রত্য, ৩, ২, ৩৮, ৬১।

১৯. দানগ্রহীতাদের জন্য নিযুক্ত লোকদের 'বৃত্তিদঃ' এবং 'সেবাসু তৎপরঃ' বলা হত।

২০. তত্রত্য, ৩, ২, ৪০, ৫৯-৬০।

২১. সাহিত্যিক আলেখ্যগুলিতে বৈশ্য ও শূদ্রদের হস্তান্তরের সাথে 'দত্তঃ', 'প্রদত্তঃ', 'নিরূপিতঃ' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু লেখগুলিতে ভূমি বা গ্রাম-দানের সঙ্গে উল্লিখিত জনসমষ্টির নামগুলিকে সাধারণতঃ 'স' উপসর্গযুক্ত হতে দেখি।

২২. 'শূদ্রের কর্তব্য হিসাবে কৃষি'-র জন্য দ্রষ্টব্য—'লঘু আশ্বলায়ন' ২২, ৫; 'বৃদ্ধ হারীত' ৭, ১৮১; 'নরসিংহ পুরাণ' ৫৮, ১১ (লক্ষ্মীধর-এর গৃহস্থ-কাণ্ড, পৃ. ২৭৩-এও এর উল্লেখ আছে); 'বৃহদ্ধর্ম পুরাণ', বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা সংস্করণ, পৃ. ১৮৯, খণ্ড ৮। জিনসেন-এর 'মহাপুরাণ'-এর সঙ্গেও তুলনীয় (১৭-১৬৪), শুধু হিউয়েন সাঙ্ (ইয়ুআন চোয়াঙ: ট্র্যাভ্‌লস্ ইন ইণ্ডিয়া, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, দিল্লী, ১৯৬১, পৃ. ১৬৯)-ই নন, ইব্‌ন খুর্দাদ্‌বেহ (এলিয়ট অ্যাণ্ড ডাওসন, 'হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া এ্যাজ্ টোল্ড বাই ইট্‌স ঔন হিস্টোরিয়ানস্, I, লণ্ডন, ১৮৬৬, পৃ. ১৬ ও তারপর) এবং আল-ইদ্রিসি (তত্রত্য, পৃ. ৭৬) পর্যন্ত ঐ প্রথাটিকে প্রত্যয়িত করেছেন।

২৩. আর. এস. শর্মা: প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

২৪. ই. সি. সাকো (সম্পাদিত ও অনূদিত): 'অলবেরুনিজ্ ইণ্ডিয়া', I (লণ্ডন, ১৯১০), পৃ. ১০১।

২৫. মনু-র উপর মেধাতিথির ভাষ্য, II, ২৪।

২৬. জি. এন. ঝা (সম্পাদিত): 'মেধাতিথি অন মনু', পৃ. ২৩১।

২৭. 'অগ্নি পুরাণ' ২০৯, ২।

২৮. 'অন মনু', IV, ৯৭; কানে: 'হিস্ট্রি অফ ধর্মশাস্ত্র', II, প্রথম ভাগ (পুণা, ১৯৪১), ১৬৩। এই বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা 'মোক্ষম্ বর্জয়িত্ব' নামে একটি বাক্যাংশ পাই। উচ্চবর্ণের সেবার মধ্য দিয়ে যে শূদ্র মোক্ষফল অর্জন করতে পারে না, সে-ধারণাটি 'শান্তি পর্বতে'ও (৬৩, ১২-৪) আছে।

২৯. সাকো: প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪।

৩০. প্রাগুক্ত।

৩১. 'যশস্তিলক' (নির্ণয় সাগর প্রেস, বোম্বাই, ১৯১৬), VII, খণ্ড ৪৩; তুলনীয়—কে. কে. হন্দিক্যি: 'যশস্তিলক অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান কালচার (শোলা-পুর, ১৯৪৯), পৃ. ৩৩১।

৩২. 'রাজধর্মকাণ্ড', পৃ. ৫; এবং কে. শাম্বশিব শাস্ত্রী (সম্পাদিত): 'নারদীয় মনুসংহিতা' ১৮, ২৩। নারদস্মৃতি-র আরেকটি শ্লোকে রাজা-প্রজার সম্পর্কটিকে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। রাজা যে প্রজাকল্যাণে নিযুক্ত একজন কর্মচারী মাত্র যিনি তাঁর পারিশ্রমিক (বেতন) হিসাবে ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ নিয়ে থাকেন—এই পুরনো ধারণাটিও এক-স্থানে উল্লিখিত হয়েছে।

৩৩. 'রাজধর্মকাণ্ড': প্রাগুক্ত।

৩৪. 'ঠাকুরম্‌বিদ্যাচিন্তম্', নগেন্দ্রনাথ উপাধ্যায় : 'তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধনা ঔর সাহিত্য' (নাগরী প্রচারিণী সভা, কাশী, সংবৎ ২০১৫), পৃ. ৩২৪।

৩৫. 'উপমিতিভাবপ্রপঞ্চকথা', পৃ. ৬৪৭-৮।

৩৬. 'বৃহন্নারদীয় পুরাণ', ৩৮, ৪৩। 'বদ্ধহল' শব্দটির হাজরা কর্তৃক অনুবাদটি—'স্থায়ী লাঙলসহ মানুষ' (স্টাডিজ্ ইন দি উপপুরাণজ্, I, কলকাতা, ১৯৫৮, ৩৬২)—সঠিক নয় বলেই মনে হয়। এ-প্রসঙ্গে আমার বন্ধু ও সহকর্মী ডঃ এস. এন. রায় (প্রাচীন ইতিহাস, সংস্কৃতি ও পুরাতত্ত্ব বিভাগ, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়)-এর কাছে আমি ঋণী।

৩৭. 'গায়কোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজ্', বরোদা, ১৯২৫, XIX, পৃ. ১৮ ও তারপর।

৩৮. তত্রত্য, পৃ. ১৯।

৩৯. তত্রত্য, পৃ. ১০৮—পাঁচ কারিগরের উল্লেখ পাই যারা হতে পারে : ছুতোর, কামার, কুমার, নাপিত এবং ধোপা।

৪০. তত্রত্য, পৃ. ১৯। পলাতক প্রজার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার হুমকি দেওয়াটা ছিল প্রজাদের স্থানত্যাগে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় সামন্তপ্রভুদের ব্যবহৃত কৌশলগুলির অন্যতম। তারা প্রজাদের একজায়গায় বেঁধে রাখতে চাইত কারণ, বদ্ধ কৃষি অর্থনীতির বিরাজমান শর্তাদিতে, জাগির থেকে মজুর না-থাকাটা অর্থহীন হত। কিন্তু কর্তৃত্বের ভঙ্গুরতা ও অকর্ষিত জমির প্রাচুর্য—বিশেষত ফ্রান্সের কোনো কোনো অঞ্চলে—হওয়ার জন্য দেশত্যাগের স্রোত বন্ধ করা দুঃসাধ্য ছিল। মার্ক ব্লক, ফিউডাল সোসাইটি, I (লণ্ডন, ১৯৬৫), পৃ. ২৬৩।

৪১. 'কুটম্বিক' শব্দটি এখানে ভাগচাষী অর্থেই ব্যবহৃত বলে মনে হয়। 'কুটুম্বী' শব্দের এ-ধরনের অর্থ 'মনু'র উপর মেধাতিথির ভাষ্যে (IV, ২৫৩)-ও চোখে পড়ে।

৪২. 'প্রায়শ্চিত্তকাণ্ড', XI, ২৫ 'অর্ধসিরি' বা 'অর্ধিকা'-রা যে সাধারণভাবে শূদ্রজাতিভুক্ত ছিল এটা সুবিদিত হলেও যেভাবে এদের উদ্ভব ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাতে মনে হয় বৈশ্যরাও ব্যাপকসংখ্যায় ভাগচাষীর স্তরে পর্যবসিত হয়েছিল।

৪৩. 'লেখপদ্ধতি', পৃ. ১৮।

৪৪. তত্রত্য. ৪২, ১৩৯ ও তারপর।

৪৫. তত্রত্য, ৪২, ১৭৪-৬।

৪৬. তত্রত্য, ৪২, ১৭৭।

৪৭. তাকাকুসু : 'রেকর্ড অফ দ্য বুদ্ধিস্টিক রিলিজন অ্যাজ্ প্র্যাক্টিসড ইন ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড দ্য মালয় আর্কিপেলাগো বাই আই-ৎসিঙ' (অক্সফোর্ড, ১৮৯৬), পৃ. ৬৫।

৪৮. এ. আপ্পাদোরাই : 'ইকনমিক কণ্ডিশনস অফ সাউথ ইণ্ডিয়া (১০০০-১৫০০ খ্রিস্টাব্দ)', I (মাদ্রাজ, ১৯৩৬), পৃ. ২৭৩।

৪৯. বৃহন্নারদীয় পুরাণ, ২২, ১১।

৫০. হাজরা : 'স্টাডিজ্ ইন উপপুরাণজ', II (কলকাতা, ১৯৩৬), পৃ. ৩২৫-এ উল্লিখিত 'দেবীভাগবত'-এ।

৫১. 'স্কন্দ পুরাণ' (ব্রহ্মখণ্ড) ৩, ২, ৪০, ৬৫। 'স্মৃতিচন্দ্রিকা' (১২শ শতাব্দী)-তে 'দেশধর্ম' অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

৫২. 'লেখপদ্ধতি'-তে 'শিলাপত্র' নামে এক ধরনের দলিলের উল্লেখ দেখা যায় (পৃ. ৫১)। এটি শাসক কর্তৃক জারি হত, রাজপুত্র ও গ্রামপ্রধান বা সর্দারদের মধ্যে নির্দিষ্ট জমি বা গ্রামবাসী পরিবারগুলির উপর অধিকার সম্পর্কিত বিবাদ মীমাংসার জন্য, এবং শাসক পরিষেবা দ্বারা উপার্জিত নিজের নিজের জাগির নিয়ে তাদের সন্তুষ্টিতে রাখার জন্য। কিন্তু গ্রাম বলতে সর্বত্রই যে সর্দারের জাগিরসীমানা বোঝাত---এমনটা ছিল না।

৫৩. 'যুক্তিকল্পতরু' (কলকাতা, ১৯১৭), পৃ. ৬। সুরক্ষা ও নিপীড়নের মধ্যবর্তী এক পোষ্য-ব্যবস্থাই পশ্চিম ইউরোপে দাসপ্রথার জন্ম দিয়েছিল---মার্ক ব্লক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫।

৫৪. ই. আই., XXX, সংখ্যা ৩০; 'যশতিলক' ৩, ১৭২।

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯।

৫৬. 'এনসাইক্লোপিডিয়া অফ সোশ্যাল সায়েন্স', X, ৯৭।

৫৭. মার্ক ব্লক-এর মতে "সামন্তীয় বলতে আমরা যে প্রতিষ্ঠানগুলির কথা বুঝি তার মধ্যে ম্যানরদেয় স্বকীয় কোনও স্থান ছিল না", যদিও পাশ্চাত্য সামন্ততন্ত্রে এটি বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল—প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯।

পশ্চিম ইউরোপের বিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত ম্যানর-ব্যবস্থা ও দাসপ্রথা কিন্তু চীন ও জাপানের—সামন্ততান্ত্রিক পরিস্থিতি বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও—বিকশিত হতে পারেনি। (ওয়ু-তা-ক'উন : 'পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেন্ট', সংখ্যা ১, ১৯৫২, পৃ. ১৯২; জে. ডব্লু. হল : 'কম্পারেটিভ স্টাডিজ ইন সোসাইটি এ্যাণ্ড হিস্ট্রি', V, সংখ্যা ১, ১৯৬৩, পৃ. ৩৫) জমির সাথে যুক্ত ভূমি-দাসপ্রথা রাশিয়ায় অনেক পরে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়েছিল যখন দেশটি অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল—ওয়েন ল্যাটিমোর : 'পাস্ট এ্যাণ্ড প্রেজেন্ট', সংখ্যা ১২, পৃ. ৫৫।

১২শ শতাব্দীর একটি সমীক্ষার ভিত্তিতে এটা বলা হয়ে থাকে যে প্রকৃত অর্থে দাস—'সার্ভি' বা 'নেটিভি'---ইংল্যাণ্ডে অতি অল্পসংখ্যকই ছিল। (আর. এইচ. হিল্টন : 'পাস্ট এ্যাণ্ড প্রেজেন্ট, সংখ্যা ৩১, ১৯৬৫, পৃ. ৬১)।

৫৮. ৩৮, ৮৭।

৫৯. ৩৫, ২৮।

ডি. ডি. কোশাম্বী ও ভি. ভি. গোখেল (সম্পাদিত) : 'হার্ভার্ড ওরিয়েন্টাল সিরিজ', XIII (হার্ভার্ড, ১৯৫৭)---যদিও কয়েকটি পরিবার, যে-দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় তারা অধঃপতিত হয়েছিল তা সত্ত্বেও, গ্রামেই রয়ে যেত এই বিশ্বাসে যে সেটি ছিল তাদের পিতৃপুরুষের ভিটা।

৬০. ডি. [illegible] (সম্পাদিত) : 'ল্যাণ্ড সিস্টেম এ্যাণ্ড ফিউডালিজ্‌ম ইন এইন্‌শন্ট ইণ্ডিয়া' (কলকাতা, ১৯৬৬), লেখকের নিবন্ধ (পৃ. [illegible]৩-৪) দেখুন।

৬১. 'বৃহন্নারদীয় পুরাণ' ২২, ১১।

ড্রেরেট-এর মতে, শাস্ত্রগুলি, সংস্কৃতি ও ব্যবহারশাস্ত্রের মধ্যে—সমরূপতা যদি না-ও হয়—সামঞ্জস্য অবশ্যই প্রচার করত; সব মিলিয়ে শাস্ত্রগুলি ছিল "আদেশাত্মক নয়, বরং সুপারিশমূলক বা খুব-বেশি-হলে নির্দেশমূলক।" ('জার্নাল অফ দি ইকনমিক অ্যাণ্ড সোস্যাল হিস্ট্রি অফ দি ওরিয়েন্ট', VII, ১৯৬৪, ১১৭, ১১৯)।

৬২. মেইট্‌ল্যাণ্ড : 'দ্য কন্‌স্টিটিউশনাল হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া', পৃ. ১৬৪।
৬৩. তুলনীয়, মার্ক ব্লক : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩ ও তারপর।
৬৪. এ. এন. বোস : 'সোস্যাল এ্যাণ্ড রুরাল ইকনমি অফ নর্দার্ন ইণ্ডিয়া', II (কলকাতা, ১৯৪৫), পৃ. ৪৮৬; আর. এস. শর্মা: প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬, ২৬৮।
৬৫. 'স্কন্দ পুরাণ' (৩, ২, ৩৯, ২৯০)-এ শূদ্রদের উল্লেখ করা হয়েছে জাতিবন্ধেন পীড়িতঃ'-রূপে।
৬৬. প্রাগুক্ত ১, ২, ৪০, ২২৭।
৬৭. টাওনি (অনুবাদ), II, ৫৯।
৬৮. তুলনীয়, আর. এস. শর্মা : প্রাগুক্ত, অধ্যায় VI; লাল্লনজী গোপাল : প্রাগুক্ত, অধ্যায় VI-IX
৬৯. ঐতিহ্যভক্তিবাদের আধিপত্যের ফলে জনসাধারণের গতিবিধির উপর বাধা-দানের প্রত্যক্ষ সাধনগুলির ব্যবহার না করলেও, অথবা কম করলেও, চলত।
৭০. V, ১৭২ ও তারপর, VII, ১০৮৮।
'রুদ্ধভারোদি' শব্দটির উল্লেখ আছে 'রাজতরঙ্গিনী'-তে, ভারবহনে নিযুক্ত বাধ্যশ্রমিক অর্থে।
৭১. লক্ষ্মীধর : 'কৃত্যকল্পতরু', 'রাজধর্মকাণ্ড', পৃ. ৯৪।
৭২. কিছুটা একই ধরনের ঘটনা দেখা যায় ১৭শ শতাব্দীর রাশিয়ায় যেখানে দাস-অর্থনীতি "বিকাশমান বাজারের সাথে মানানসই হয়ে উঠতে শুরু করেছিল"—এ. এম. পান্‌ক্রাতভ (সম্পাদিত): 'এ হিস্ট্রি অফ দি ইউ.এস.এস.আর', খণ্ড ১ (মস্কো, ১৯৪৭), পৃ. ১০১।
৭৩. ই. আই., XXXIII, VI (এপ্রিল, ১৯৬০), পৃ. ২৪৫-৬।
৭৪. পরবর্তীকালেও, 'বসাই' নামে অভিহিত এক শ্রেণীর কৃষকদের উল্লেখ দেখা যায়, যারা সম্পত্তি বা নাগরিক অধিকারচ্যুত না হয়েও তাদের প্রভুর জাগিরে বসবাস করত। (টড : 'এ্যানাল্‌স অ্যাণ্ড এ্যান্টিক্যুইটিজ্‌ অফ রাজস্থান, ডব্লু. ক্রুক সম্পাদিত, I, পৃ. ২০৬)। 'হলী' নামক নিম্নস্তরের কৃষকরা বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য শাসকের কাছে তাদের জমি সমর্পণ করতে বাধ্য হত, এবং তারপরে ঐ জমিতে কাজ করেই তাদের জীবিকা অর্জন করতে হত।—প্রাগুক্ত।
৭৫. মোরল্যাণ্ড : 'দি আগ্র্যারিয়ান সিস্টেম অফ মুসলিম ইণ্ডিয়া' (কেম্ব্রিজ, ১৯২৯), পৃ. ২০৪।
৭৬. ইরফান হবিব : 'দ্য সোস্যাল ডিস্ট্রিবিউশন অফ ল্যাণ্ডেড প্রপার্টি ইন প্রি-ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া', 'এনক্যোয়ারি', নিউ সিরিজ্‌ II, সংখ্যা ৩ (১৯৬৫), পৃ. ৪৬, ৫২।

২

ইতিহাস-গবেষণায় প্রযুক্তি-চর্চার গুরুত্ব

ইরফান হবিব

শ্রেণীবিভক্ত একটি সমাজের বৈষয়িক ভিত্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে জানতে হলে কৃষি-সম্পর্ক, শাসক শ্রেণীর সংগঠন, মধ্যযুগীয় শহরের অর্থনৈতিক ভিত্তি—এই সব কিছুর প্রতিই আমাদের অবিচ্ছিন্ন মনোযোগ রাখতে হবে। এই কারণেই, রাজনীতিগত পরিবর্তন ও মতাদর্শগত বিকাশের অধ্যয়ন আমাদের অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে, এবং সেই সঙ্গে এ-সবের ও অর্থনৈতিক ভিত্তির মধ্যেকার যোগসূত্রগুলির সন্ধান করতে হবে। এই বিষয়গুলির সবকটিতেই কিছু-না-কিছু কাজ হয়েছে, অথবা হচ্ছে, যদিও স্বীকার করতেই হবে যে, ক্ষেত্রটি সত্যিই সুবিস্তৃত এবং আমরা এতদিনে কাজটি শুরু করেছি মাত্র।

কিন্তু এখনো যেটা শুরু করিনি, তা হল উৎপাদনের বাস্তব কৃৎকৌশলগুলির অধ্যয়ন। অর্থনৈতিক সম্পর্ক রূপান্তরিত হওয়ার একটি সম্ভাব্য কারণ হিসাবে এ-অধ্যয়নের তাত্ত্বিক গুরুত্ব (যা সম্ভবত সব ইতিহাসবিদ্‌ই স্বীকার করবেন) থাকা সত্ত্বেও প্রযুক্তির ইতিহাস নিয়ে কাউকেই বিশেষ মনোযোগী হতে এ-পর্যন্ত দেখা যায়নি। যদিও ভারতীয় অ্যাস্ট্রোলেব সম্পর্কে, বা ফাতুল্লা শিরাজি (১৬শ শতাব্দী)-র[১] অদ্ভুত যান্ত্রিক উদ্ভাবনগুলি সম্পর্কে কিছু কৌতূহলোদ্দীপক রচনা প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু উৎপাদন-প্রযুক্তির কোনো শাখায় বিশেষ অধ্যয়নের প্রচেষ্টা এখনো চোখে পড়েনি।

মনোযোগের এই অভাবের জন্য অংশত দায়ী হয়ত এমন একটা বিশ্বাস যে, ব্রিটিশবিজয়ের পূর্ববর্তী ভারতে যে-প্রযুক্তির চর্চা হত তা এতই আদিম যে, তার কোনো ইতিহাস না-থাকারই কথা, অথবা বলা যায় স্মরণাতীত কাল থেকেই তা চালু ছিল। কিন্তু, ইয়োরোপ ও চিন এই দুই সভ্যতায় (বিশ্ব-প্রযুক্তিতে যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি) প্রযুক্তিগত বিকাশের ইতিহাস নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ হতে থাকার পর, ঐ ধরনের অনুমান এখন টেঁকে না। ইয়োরোপ নিয়ে গত পঞ্চাশ বছরের গবেষণার ফলাফল এবং নতুন ও মৌলিক বিশ্লেষণগুলি উপস্থাপিত হয়েছে লিন্‌ন হোয়াইট-এর 'মিডিয়েভ্‌ল টেক্‌নোলজি অ্যাণ্ড সোস্যাল চেঞ্জ' (অক্সফোর্ড, ১৯৬২)-এ। জে. নীডহ্যাম-এর 'সায়েন্স অ্যাণ্ড সিভিলাইজেশন ইন চায়না' (যার কাজ এখনো চলছে)-তে চিন সম্বন্ধে প্রচুর তথ্যই শুধু নেই, বরং ঐ সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ঐ সম্পর্কিত বা

সমান্তরাল প্রযুক্তিগত বিকাশ নিয়েও গভীর আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণাগুলি থেকে এটাই দেখা গেছে যে, সরলতম যন্ত্রপাতি বা হাতিয়ারগুলির অধিকাংশেরই নিজস্ব একেকটি ইতিহাস আছে, এবং এগুলির উদ্ভাবন ও ব্যাপক প্রচলনের প্রভাব পড়েছে—অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশসমূহের বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন মাত্রায় শুধু ঐতিহাসিক পদ্ধতির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হলেও যে-বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে তা হল—ইউরোপ ও চিন সম্পর্কে যে-সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি এখন সর্বজনগ্রাহ্য, ভারতের ক্ষেত্রে তা কতদূর প্রযোজ্য।

অবশ্য, এটা অনস্বীকার্য যে, প্রযুক্তি-অধ্যয়নের পথে বাধা অনেক। যেসব সামগ্রী দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে অপরিহার্য অথচ সরলতম, সেগুলি সম্পর্কেই বোধ হয় সবচেয়ে কম বলা হয়েছে। মধ্যযুগীয় ইতিহাসবিদের ক্ষেত্রে বাড়তি সমস্যাটা হল প্রাচীন ভারতীয় প্রযুক্তির কয়েকটি পরীক্ষামূলক দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে সমালোচনাত্মক অধ্যয়নের অপ্রাপ্যতা। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর ঠিক আগে ডঃ দেবরাজ চনানা আমাকে আভাস দিয়েছিলেন যে, ঐ বিষয়ে তিনি তথ্যাদি সংগ্রহ করছেন ; আগেকার একটি প্রবন্ধে আমি তড়িঘড়ি যে-কিছু সিদ্ধান্ত করেছিলাম, সেগুলির উপর একটা সমালোচনাও তিনি প্রকাশ করে ফেলেছিলেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নিয়ে যে-বিশাল গবেষণা সম্প্রতি শুরু হয়েছে তাতে আশা করা যায় আগের ফাঁক ভরাট করতে নতুন নতুন প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই উঠে আসবে।

প্রযুক্তি-ইতিহাসের একজন ছাত্রকে যে-সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে হবে তার মধ্যে একটি হল—১৩শ শতাব্দীর শেষাশেষি তুর্কি বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে, বা তার ফলে যে-যে রূপান্তরগুলি হয়েছিল। এ-ধরনের অধ্যায়ন কোন্ কোন্ বিষয়কে উদ্ঘাটিত করবে এবং রাজনৈতিক, ও সামাজিক বিকাশের উপর কী সম্ভাব্য আলোকপাত করবে—এই ব্যাপারে, আমি বলব বস্ত্রশিল্প, সেচব্যবস্থা, লিখনসামগ্রী ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, এবং অশ্বারোহী সেনা এই চারটি বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রমাণ্য তথ্যাদি (আমি যেমন কিছু সংগ্রহ করতে পেরেছি) নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে। এ-কথা আমি বলতে বাধ্য যে, আমি যেটুকু করছি তা নেহাৎই পরীক্ষামূলক, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমি হয়ত প্রশ্ন উত্থাপনের চেয়ে বেশি কিছু করতে পারছি না।

১. সংশ্লিষ্ট কারিগরি পুস্তকাদিতে বহুদিন থেকেই বলা হয়ে আসছিল যে, চরকার উৎপত্তি ভারতে ; এবং এর একটা আনুমানিক সময়কালও (৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) নির্দেশ করা হয়ে আসছিল।[২] অন্যদিকে, প্রাচীন সংগ্রহাদিতে এটির অনুপস্থিতি এবং ইয়োরোপে বিলম্বিত আবির্ভাবের কথাও বলা হয়েছিল। স্পেয়ার (স্পায়ার্স)-এর বস্ত্র ব্যবসায়ী সঙ্ঘ ১২৯৮-এ (বা ১২৮০ নাগাদ) এই মর্মে একটি বিধি প্রবর্তন করেছিল যে, চরকায় কাটা সুতো দিয়ে দড়ি বানানো চলবে না।[৩] আব্ভিল-এ চরকায় কাটা সুতোর ব্যবহার ১২৮৮-তে নিষিদ্ধ

হয়েছিল বোধহয় এই কারণে যে, ঐ ধরনের সুতো যথেষ্ট শক্ত কিনা সে সম্পর্কে তাঁরা সন্দিহান ছিলেন।[৪] এ-থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ইয়োরোপীয় বস্ত্রশিল্পে চরকার প্রবর্তন তখন সবে হয়েছে। যদি ভারত থেকেই এটি ইয়োরোপে গিয়ে থাকে তবে এই দীর্ঘ বিলম্বের উপযুক্ত ব্যাখ্যা প্রয়োজন। তাছাড়া, চরকায় অঙ্গীভূত রয়েছে বেল্ট-ড্রাইভ, ফ্লাই-হুইল ও পৃথগীকৃত ঘূর্ণনবেগ-এর যন্ত্রনীতি ; এবং বিভিন্ন কলকজায় এ-যন্ত্রাংশগুলির ব্যবহারের ইতিহাস তুলনায় সাম্প্রতিক। এ-সমস্ত কারণে লিন্ হোয়াইট চরকার ইতিহাসকে পুনরনুসন্ধানসাপেক্ষ রেখেছেন এবং এই চমকপ্রদ আবিষ্কারটি করেছেন যে, প্রাচীন ভারতে চরকার প্রচলন ছিল এমন তথ্য কোথাও নথিভুক্ত নেই।[৫] তিনি তাই দাবি করেছেন যে যন্ত্রটির উৎপত্তি পশ্চিম ইয়োরোপেই হওয়া সম্ভব।

এরপর নীডহ্যাম-ও বিষয়টি অধ্যয়ন করেছেন, এবং চরকার ভারতে উৎপত্তির যে কোনো প্রমাণ নেই সে-কথা স্বীকার করলেও, তিনি বলেছেন যে ১২৭০ সাল থেকেই চরকার সরলতম রূপাবিশিষ্ট একটি যন্ত্রের প্রচলন ও সাধারণ্যে ব্যবহার দেখা গিয়েছিল চীনে ; তাছাড়া, বহু-তকলিবিশিষ্ট যে মেশিন ভারতে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল, সেটিরও নিদর্শন পাওয়া যায় চীনে ১৩১৩ সাল থেকেই। নীডহ্যাম তাই চরকার উৎপত্তি চীনেই সাব্যস্ত করার পক্ষে।[৬]

সুতাকাটা সম্পর্কে প্রাচীন ভারতের যে-সমস্ত প্রমাণাদি পাওয়া গেছে সেগুলিতে যে চরকার উল্লেখমাত্রও নেই, এ-কথা একরকম অনস্বীকার্য। কেবলমাত্র হাতে-ঘোরানো নাটাই ও তকলি হয়ত ব্যবহৃত হত। চরকার উল্লেখ যেখানে থাকার কথা বলে পাঠকের মনে হয়, ঠিক সেখানেই লিখন-গুলি নীরব।[৭] কোনো ভাস্কর্য বা চিত্রাঙ্কনেও এটির উপস্থিতি দেখা যায়নি, যদিও (এ-দেশে উদ্ভাবিত হলে) এটির একটি সাধারণ গৃহস্থালীসামগ্রী হয়ে ওঠার কথা। তাছাড়া, সংস্কৃতে এটির কোনো প্রতিশব্দ চোখে পড়ে না ;[৮] বর্তমানে উত্তরভারতীয় এবং নেপালি ভাষায় চালু শব্দটি এসেছে ফার্সি শব্দ 'চর্‌খহ্' থেকে।[৯] যন্ত্রটি যদি দেশজ হত, বা দীর্ঘকালযাবৎ ব্যবহৃত হয়ে আসত, নিশ্চয়ই তাহলে এটির একটি দেশজ প্রতিশব্দও পাওয়া যেত, যেমন—তকলি। ফার্সিতে তকলি-র প্রতিশব্দ হল—দুক।

আমাদের মধ্যযুগীয় সংগ্রহাদিতে যন্ত্রটির হদিশ পাওয়া যায় ১৭শ শতাব্দীর মুঘল চিত্রাঙ্কনে, সবচেয়ে পুরনোটি ১৬০৬ খ্রিষ্টাব্দের।[১০] সাহিত্যিক নজিরে অবশ্য আরো আগে এর উল্লেখ দেখা যায়। ছন্দে-লেখা সুবিখ্যাত ইতিহাস ইসামি-র 'ফ়ুতুহুস সালাতিন' (১৩৫০)-এ যন্ত্রটির প্রসঙ্গ এসেছে সুলতানা রাজিয়া (১২৩৬-৪০)-র বিরুদ্ধে তাঁর কার্যনির্বাহীদের ক্ষোভপ্রকাশের মধ্যে ; তাদের মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে :

"(একমাত্র) সেই রমণীই উত্তম যিনি সর্বদা চরখা-কর্মে রত থাকেন ;

তাঁকে একটি সম্মানীয় আসনের অধিষ্ঠাত্রী করা হলে তিনি যুক্তিসঙ্গতি হারিয়ে ফেলতে পারেন।

"রমণীর সখী হোক পানূবা (সূতা); ঘাম[১১] হোক তাঁর সুরাপাত্র ; এবং দুক (তকলি)-এর টংকার তাঁর বীণার কাজ করুক।"[১২]

প্রসঙ্গটি থেকে মনে হয় যে, চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (যদিও এ-দ্বারা সুলতানা রাজিয়া-র শাসনকালটুকুই বোঝায় না) ভারতে মহিলাদের ব্যবহৃত যন্ত্রাদির মধ্যে চরকা ছিল অতিপরিচিত একটি।

ইন্দো-ফার্সি রচনাদি নিয়ে এ-পর্যন্ত যত কাজ হয়েছে তাতে ঐ সময়ের আগেকার কোনো উল্লেখ দেখা যায়নি ; কিন্তু সা'দি-র 'বোস্তান' (১২৫৭)-এ দুটি কৌতুহলজনক পংক্তি এইরকম ঃ

"তুমি জানো (এটা) ঃ এমন একজন রাজা কখন প্রশংসনীয় হতে পারেন, যাঁকে প্রজারা প্রশংসা করে (কেবলমাত্র) রাজসভায় দাঁড়িয়ে ?

"প্রকাশ্য সমাবেশে তোষামোদে লাভ কী, যখন চরখার পেছনে স্ত্রী-পুরুষ তাঁকে অভিশাপ দিতে থাকে ?"[১৩]

১৩৫০-এর প্রাগুল্লিখিত ভারতীয় নজিরটির তুলনায় এটি কম স্পষ্ট এবং কম ভাবপ্রকাশক হলেও, এ-থেকে বেশ মনে হয় যে, পারস্যে চরকার ব্যাপক ব্যবহার ১২৫৭-র আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল।

তাহলে এটাই সম্ভব যে ইউরোপীয়, চৈনিক এবং ইসলামি এই তিন সভ্যতায়ই চরকার প্রথম আবির্ভাব—এখনো পর্যন্ত যা প্রমাণাদি পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে বলা চলে—১৩শ শতাব্দীর আগে হয়নি। আবির্ভাবের সময়-কালগুলি এত ঘেঁষাঘেঁষি হওয়ার ফলে যন্ত্রটির উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে সন্দেহাতীত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না, যদিও আলোচিত উল্লেখগুলি থেকে ইয়োরোপের দাবিটাই দুর্বলতম বলে মনে হয়। যদি চীনেই এটির উৎপত্তি হয়ে থাকে তবে ১৩শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সভ্য দুনিয়ার এক বৃহদংশ জুড়ে মঙ্গোল সাম্রাজ্য বিস্তারের মধ্য দিয়েই হয়ত যন্ত্রটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে।

ভারত সম্পর্কে এ-টুকু বলা যায় যে, উৎপত্তি এ-দেশে হোক বা না-হোক চরকার প্রচলন এখানে ১৩শ শতাব্দীর আগে হয়নি। চরকা যন্ত্রটিতে সুতো তাড়াতাড়ি কাটা যায়, কিন্তু সুতোর উৎকর্ষ বাড়ানো যায় না। সর্বোৎকৃষ্ট সুতো সর্বদাই তৈরি হত সুপ্রাচীন হাতে-ঘোরানো নাটাই ও তকলি-তে।[১৪] ঢাকাই মসলিন-এর সুতোও তৈরি হত এ-তে ; ফাঁপা খোলের উপর ঘূর্ণমান সূচাকৃতি বাঁশের তকলিগুলোয় কাটা হয়ে আসত ঐ সুতো। তুলো থেকে মোটা সুতো কাটতেই কেবলমাত্র চরকা ব্যবহৃত হত।[১৫] চরকার আসল উপযোগিতা ছিল উৎপাদন-প্রাচুর্যে। মোটামুটি হিসাবে দেখা গেছে, চরকা ব্যবহারের ফলে কাটনিপিছু উৎপাদন বেড়েছে ছয়গুণ।[১৬] কাজেই মেশিনহীন যুগের চির-

নবীন প্রতীক হিসাবে নয়, শ্রমসাশ্রয়কারী একটি বুনিয়াদি যন্ত্র হিসাবেই চরকা আপন স্বীকৃতি দাবি করতে পারে।

চরকার ইতিহাস নিয়ে আরো সতর্ক সমীক্ষা থেকে যে-প্রশ্নটি উঠে এসেছে তা হল: আরো যে-দুটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সুতো তৈরি হত সেগুলিরও উৎস মধ্যযুগীয় কিনা। প্রথমটিতে কাঠের তৈরি একধরনের ফাঁদ ব্যবহৃত হত, বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল এগুলি—চরকি, বেল্‌না, রেস্তা, নেওঠা ইত্যাদি। দুটো করে রোলার থাকত এবং সেগুলি দাঁতে দাঁতে এমনভাবে লাগানো যাতে একটি অন্যটির বিপরীতমুখে ঘুরতে পারে। হাতল ঘুরিয়ে চালানো হত এদের মধ্যে একটিকে। রোলারগুলির মধ্যে তুলো ঢুকিয়ে দিলে বীজ থেকে তুলো আলাদা হয়ে যেত। অপর প্রক্রিয়াটিতে মূলযন্ত্র ছিল একটি ধনুর্গুণ যার কম্পনের সাহায্যে তুলোর আঁশগুলিকে আল্‌গা এবং আলাদা করা হত।[১৭] এই প্রক্রিয়াগুলিতেও শ্রমের কিছুটা সাশ্রয় হত: দেখা গেছে যে, চরকি ব্যবহার করে একেকজন (খালি-হাতে যতটা পারত তার) চার থেকে পাঁচগুণ তুলো বেশি ধুনতে পারত।[১৮]

চরকিতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ যান্ত্রিক কৌশল অঙ্গীভূত ছিল—সমান্তরাল প্যাঁচ এবং আগুপিছু করার হাতল (ক্র্যাংক)। আশ্চর্যের বিষয় যে, প্যাঁচের ব্যবহার যদিও ইউরোপে প্রাচীনকাল থেকেই জানা ছিল, তৎসত্ত্বেও এই বিশেষ ধরনের প্যাঁচালো গিয়ারের কৌশল কখনো সেখানে ব্যবহৃত হয়নি।[১৯] ক্র্যাংক ব্যবহারের নজিরও ইউরোপে ৯ম শতাব্দীর আগে দেখা যায় না, যদিও চীনে এটা তার আগেই চালু ছিল।[২০] চরকির ব্যবহার অবশ্য চীনে ছিল না—চীনা প্রযুক্তিতে স্ক্রু ছিল বহিরাগত।[২১] সেক্ষেত্রে, আর যে-দুটি তুলা-উৎপাদক অঞ্চলে চরকির উৎপত্তি হওয়া সম্ভব, সেগুলি হল—ভারত এবং মধ্যপ্রাচ্য।

প্রাথমিকভাবে, ভারতে যন্ত্রটির বহুল প্রচলন এবং সেখানকার সংস্কৃতিতে প্রবল ভারতীয় প্রভাব পড়েছিল খ্রিস্টীয় যুগের প্রথম সহস্রবর্ষকালে সেই কম্বোডিয়ায়,[২২] এর বিদ্যমানতা থেকে মনে হয় যে, প্রাচীন ভারতেই এটির উৎপত্তি; এই সম্ভাবনাটির পক্ষে নীডহ্যাম-ও মতপ্রকাশ করেছেন।[২৩] কিন্তু স্থিরসিদ্ধান্তে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে দুটি বাধা চোখে পড়ে—প্রথমত, অপেক্ষাকৃত কম নিপুণ একটি পদ্ধতির (একটি লৌহদণ্ড বা রোলারকে পায়ের সাহায্যে একটি পাথরের উপর ঘুরিয়ে) টিকে থাকা, যেটি আপাতদৃষ্টিতে স্থানচ্যুত হয়েছিল চরকির দ্বারা;[২৪] দ্বিতীয়ত, চরকি-র (বা প্যাঁচ অথবা ক্র্যাংক) উল্লেখ প্রাচীন ভারতীয় নথিপত্রে নেই. একমাত্র যে-ধরনের স্ক্রু-র হদিস পাওয়া গেছে তা হল ভোজ (আনুমানিক ১০50)-এর জল উত্তোলনের স্ক্রু (পতসম-উচ্ছ্রায়) [patasama-uchhraya] যা স্পষ্টতই ছিল গ্রিকসভ্যতা থেকে আমদানিকৃত।[২৫]

ইসলামি সভ্যতায় চরকির উপস্থিতির পক্ষেও এ পর্যন্ত কোনো নথিভুক্ত নজির পাওয়া যায়নি। ক্র্যাংকের ব্যবহার—অন্তত এর সহজতম রূপটির ব্যবহার—জানতেন আল-জায়ারি (১২০৬)।[২৬] ১২শ শতাব্দীর প্রথমভাগে আল-জামিক্ষরি 'হল্লাজ' [halaja] এবং 'মিহ্লজ' [mihlaj] এই দুটি শব্দের সংজ্ঞার্থ দিয়েছিলেন, যা-থেকে জানা যায় তুলো-ঝাড়াইয়ের জন্য কাঠের রোলার ব্যবহারের কথা।[২৭] সম্ভবত এটি ছিল পাথরের উপর ঘোরানো লোহদণ্ডেরই একটি অন্যরূপ। ১৩১৩-এর একটি কাঠের তৈরি তুলো-ঝাড়াইকলের নিদর্শন পাওয়া গেছে চীনে এবং—যদিও সেটিতে গিয়ার-ব্যবস্থা নেই আর হাতল আছে দুটি, তবু—মনে হয় সেটি পরিকল্পিত হয়েছিল চরকির ধারণা থেকেই, যে-চরকি চীনে পৌঁছেছিল সম্ভবতঃ ১৩শ শতাব্দীতে (তুলোর সঙ্গেই) সিঙ্কিয়াং থেকে—সেখানে তখন চরকির ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে।[২৮] সে-সময়ে সিঙ্কিয়াং ছিল ইসলামি দুনিয়ার একটি বহিঃস্থ ঘাঁটির মতো। এ-নজিরটিকে তাহলে অনায়াসেই এই মতটির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া যায় যে আরো কিছু আগে ভারত থেকে চরকির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল ইসলামী দুনিয়ায়। অন্যদিকে, সামান্য আপত্তি এ-দিক থেকে উঠতে পারে না, উত্তর-পশ্চিম থেকে ঐ সময়েই চরকি এসে পৌঁছেছিল ভারতে। সুনির্দিষ্ট নজিরের অভাবে যন্ত্রটির উৎস সম্পর্কিত প্রশ্নটি তাহলে অমীমাংসিতই থেকে যাচ্ছে।

ধনুর্গুণবিশিষ্ট যন্ত্রটি সম্পর্কে বরং কিছুটা বেশি নিশ্চয়তা নিয়ে বলা যায় যে, প্রাচীন ইউরোপে এটির ব্যবহার অজানা ছিল।[২৯] সবচেয়ে পুরনো উল্লেখ পাওয়া গেছে ১৪০৯-এর, যখন তুলো-ঝাড়াইয়ের কাজে যন্ত্রটিকে লাগনোর বিরোধিতা করেছিল কন্সটান্স্-এর পশম-শ্রমিকরা।[৩০] এ-থেকে মনে হয় যন্ত্রটি তখন সদ্যপ্রবর্তিত। ইস্লামি সভ্যতার দিকে নজর দিলে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র, আরবি অভিধান-রচয়িতাদের কাছ থেকে পাই। আল জওয়াহারি (মৃত্যু: ১০০৭) এবং আল ফায়্যুমি (১৩৩৩-৩৪) 'নদাফা' [nadafa] ক্রিয়াপদটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন—'মিন্দাফ' দিয়ে তুলোয় বাড়ি দেওয়া—যেখানে 'মিন্দাফ [mindaf] বলতে সম্ভবত একটি ছড়ি-ই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু আল-ফিরুযাবাদি (মৃত্যু: ১৪১৩-১৪) তাঁর 'ক্যয়ামুস' [Qamus] (১৩৬৬-৬৭ নাগাদ লেখা)-এ বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন 'মিন্দাফ' শব্দটির; একটি কাঠের হাতিয়ার যা দিয়ে ধুনুরি তার গুণটিকে ঠোকে যাতে তুলো থেকে পাতলা আঁশ বেরিয়ে আসে।[৩১] এ-থেকে মনে হয় ১৪শ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই 'নদ্দাফ' [naddaf] বা তুলো-ধুনুরিরা নির্দিষ্টভাবে ধুনচি-হাতে-মানুষ হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে। যে-রূপাকৃতিতে তারা স্পষ্টতই চিত্রিত হয়েছিল পরবর্তী-কালের ইন্দো-ফারসি প্রয়োগে।[৩২] এটা লক্ষণীয় যে, যন্ত্রটির প্রথম আবির্ভাবের সময়কাল—ইউরোপীয় এবং ইসলামি—দুই সভ্যতায়ই খুব কাছাকাছি।[৩৩]

ভারতের ক্ষেত্রে এ-নজিরের তাৎপর্য এই যে, ধনুর্গুণবিশিষ্ট ঐ যন্ত্রটিকে

১৪শ শতাব্দীর আগেকার বলে ধরা যেতে পারে একমাত্র যদি প্রমাণ করা যায় যে, যন্ত্রটি উদ্ভাবিত হয়েছিল এ দেশে ; অন্যথায়, যদি এটি আমদানিকৃত হয়ে থাকে, তবে এটি ভারতে এসেছিল ঐ শতাব্দীতে বা তারও পরে। ভারতে বর্তমান যুগেও এটির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করে চীনা প্রযুক্তির ইতিহাসবিদ্ মতপ্রকাশ করেছেন যে, সম্ভবত এটি "মূলত ভারতীয় কৃৎকৌশল।"[৩৪] যদিও এ ধরনের একটি অনুমানের পক্ষে বাস্তব যুক্তিপ্রতিষ্ঠা তেমন কিছু করা হয়নি।[৩৫] বরং, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে-জাতের লোকেরা ঐ যন্ত্রনির্ভর পেশায় নিযুক্ত ছিল তাঁরা যে প্রধানত মুসলমান[৩৬] এই লক্ষণীয় ঘটনাটি এই আভাসই দেয় যে, মুসলমানরাই এটি ভারতে এনেছিল ; এবং এ-থেকে জোরদার হয়ে ওঠে আরেকটি সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত যে, ভারতে এটির প্রচলন ঘটেছিল—খুব আগে হলে —১৪শ শতাব্দীতে।[৩৭]

উপস্থাপিত প্রমাণাদি থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, চরকা—প্রায় নিশ্চিতভাবেই—এবং তুলো-ঝাড়াইয়ের ধুনচি—খুব সম্ভবত—বাইরে থেকে ভারতে এসেছিল ১৩শ ও ১৪শ শতাব্দীতে ; যদিও তুলো-ঝাড়াইয়ের কাঠের রোলার-এর উৎপত্তি হয়ত এ-দেশেই। আমদানিকৃত যন্ত্রদ্বয়ের প্রভূত শ্রমসাশ্রয়কারিতার কথা মনে রেখে বলা যায় যে, সুতো উৎপাদনের খরচ নিশ্চয়ই অনেকখানি কমে গিয়েছিল। সূক্ষ্ম সুতো উৎপাদনে হাতে-ঘোরানো তকলির জায়গা যে চরকা দখল করতে পারেনি সে-কথা মনে রেখে আরো বলা যায় যে, মোটা এবং মাঝারি গুণমানের সুতো তৈরির খরচটাই অনেক কমেছিল। ফলত, বোনা-কাপড়ের দাম পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে-চাহিদাবৃদ্ধি ঘটল তাতে তুলোচাষ এবং সুতা-উৎপাদন দুই-ই নিশ্চয় বেড়েছিল। অন্যভাবে আমরা বলতে পারি, ১৩শ ও ১৪শ শতাব্দীতে চরকা ও ধুনচি-র ব্যাপক প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে মোটা ও মাঝারি গুণমানের বস্ত্র-উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

এ-থেকে আমরা এবার সেই বিতর্কটি নিয়ে আলোচনা করতে পারব যেটি বারবার উঠেছে প্রাচীন ভারতে কী পরিমাণ বস্ত্র পরিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হত—এই প্রশ্নটিকে ঘিরে। একমাত্র উত্তর-পশ্চিম গান্ধার ঘরানা ছাড়া ভারতের প্রায় সমস্ত অঞ্চলের নব যুগের ভাস্কর্য ও চিত্রাঙ্কনেই দেখা গেছে—এবং তা-থেকে মনে হয় যে—পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই পোশাক ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। দুর্ভাগ্যবশত, শরীর—বিশেষত স্ত্রী-শরীর—আবৃত করার সঙ্গে শালীনতা এবং ঔচিত্যবোধের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকায় পোশাকের এই স্বল্পতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বহু কষ্টকল্পিত যুক্তি খাড়া করা হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে যত আলোচনা আমি দেখেছি তার মধ্যে স্বর্গত ডঃ এ. এস. আল্টেকর-এরটিই সর্বাধিক বিজ্ঞজনোচিত বলে মনে হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, শৈল্পিক প্রতিকৃতিগুলিতে যথার্থ বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়নি কারণ শিল্পীরা আসলে চেয়েছেন স্ত্রী-অবয়বের সৌন্দর্য দেখাতে।[৩৮] পৌরাণিক চরিত্র, দেব-দেবীর প্রতিকৃতি[৩৯] ইত্যাদির

ক্ষেত্রে ঐ যুক্তি প্রযোজ্য হতে পারে (না-ও হতে পারে), কিন্তু সে-যুক্তি নিশ্চিত-ভাবেই অচল যেখানে শিল্পী সাধারণ স্ত্রী-পুরুষকে আঁকতে চেয়েছেন জনসমাবেশের মধ্যে; এবং বহুক্ষেত্রেই শুধু অনাবৃত বক্ষই নয়, সর্বাঙ্গই অনাবৃত রাখা হয়েছে, কেবল সংক্ষিপ্ততম কটিবস্ত্র ছাড়া।[৪০] এই প্রতিকৃতিগুলিকে তুলনা করা যায় ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীর মুঘল ঘরানা বা তারও পরের ভারতীয় ঘরানায় আঁকা দরিদ্রতর জনসাধারণের প্রতিকৃতির সঙ্গে, যাদের গাত্রবস্ত্রের পরিমাণ স্পষ্টতই কিছু বেশি।[৪১] আবার, বর্তমান সময়ের সঙ্গে তুলনা করলে ১৭শ শতাব্দীর ঐ পরিমাণকে নিতান্তই কম বলে মনে হবে, যদিও এ-যুগের দরিদ্রতর জনসাধারণ নিশ্চিতই বস্ত্রাভাবে দিন কাটাচ্ছেন।[৪২]

আনুমানিক ১০০০ ও ১৫০০-র মধ্যে গাত্রবস্ত্রের পরিমাণে যে-পরিবর্তন এসেছিল বলে মনে হয়, তাতে—অন্তত আংশিকভাবে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিশ্চয়ই ছিল চরকা এবং ধুনচি-র। ১৮৫০ থেকে আবার যে পরিবর্তনটি এসেছিল, তাতেও নিশ্চয়ই একই ভূমিকা পালন করেছিল সূতাকাটা ও বস্ত্রবয়নশিল্প।

এ-ব্যাপারটি স্বতঃই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অন্যান্য কয়েকটি দিকও এ-প্রসঙ্গে বিবেচ্য: একটি অঞ্চলে তুলোচাষ সম্প্রসারণের অর্থ হল সেই অঞ্চলে একটি অভোজ্য, প্রধানত বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদনের—অর্থাৎ পণ্য উৎপাদনের—সম্প্রসারণ। অন্যান্য তথ্যভিত্তি থেকে যা জানা গেছে—যেমন, ১৩শ ও ১৪শ শতাব্দীতে পণ্য উৎপাদনের সম্প্রসারণ ঘটেছিল—তাতে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে ঐ দৃষ্টিভঙ্গিটিই সমর্থিত হয়।[৪৩]

অন্যদিকে, তাঁতগুলির রূপান্তর হয়নি ধরে নিলে,[৪৪] মোটা ও মাঝারি গুণ-মানের সুতো ব্যবহারকারী তাঁতীদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছিল—এটাও ধরে নিতে হয়। সূতা উৎপাদন বৃদ্ধি যদি সত্যিই দ্রুত ঘটে থাকে তবে তাঁতীদের স্বাভাবিক সংখ্যাবৃদ্ধি, বা অন্য জনগোষ্ঠী থেকে তাঁতীগোষ্ঠীতে ক্রমশ কিছু মানুষের অন্তর্ভুক্তি, হয়ত তা সামাল দিতে পারেনি; এবং সে-ক্ষেত্রে এটা খুবই সম্ভব যে, হঠাৎ ব্যাপক অনুপ্রবেশের ফলে তাঁতীশ্রেণীটিতে জাতপাতের বিন্যাস ঝটিতি বদলে গিয়েছিল। যিনি নিজেকে জোলা [julaha] ও কোরি [kori] উভয় জাতেরই লোক বলে মনে করতেন[৪৫] সেই কবীরের দৃষ্টিভঙ্গিতে কি তাহলে—অন্তত আংশিকভাবে—এই বিশাল সামাজিক, বা জাতপাতগাত সংমিশ্রণই প্রতিফলিত হয়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তর এখুনি দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু দুটি নতুন যন্ত্রের ব্যাপক প্রচলনের ফলে বস্ত্রশিল্পের পরিবর্তনগুলি নিয়ে আমাদের অনুসন্ধান এ-ধরনের প্রশ্নগুলির উত্থাপনকে অন্তত উপযুক্ততা প্রদান করে।

২. প্রাচীন ভারত প্রসঙ্গে এখনকার কাজগুলিতে 'পার্শিয়ান হুইল' (পার্শি চাকা)-কে প্রায়শই অনেক আগেকার বলে ধরে নেওয়া হয়, যদিও ব্যাশম

এই প্রসঙ্গে সরাসরি কোনো মন্তব্য করেননি।[৪৬] সাহিত্যিক রচনাদিতে প্রাসঙ্গিক উল্লেখগুলি অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। যেমন, এগুলি থেকে মোটামুটি নিঃসংশয় হওয়া যায় যে—খ্রিস্টের সময় থেকেই 'অরঘট্ট' বা 'ঘটিযন্ত্র' নামক জল-উত্তোলন যন্ত্রের প্রচলন ছিল, এবং এই ব্যবস্থায় চাকার ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে এক মৃৎপাত্রের জল তার পরেরটিতে এসে পড়ত—কিন্তু সেখানে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই যা-থেকে বোঝা যায় পাত্রগুলি শিকলে বাঁধা থাকত কিনা, কোনো গিয়ার-ব্যবস্থা ছিল কিনা, বা এগুলিকে কূপ থেকে জল তোলার কাজে লাগানো হত কিনা।[৪৭] গভীরতর পর্যবেক্ষণের পর নীডহ্যাম বলেছেন যে, যন্ত্রটির সাদৃশ্য 'সাক্যেয়া'-র [saqiya] (পার্শি চাকা) চেয়ে 'নোরিয়া-'র [noria] (বেড় বরাবর বালতি-লাগানো চাকা)-র সঙ্গেই বেশি।[৪৮] ঐ দুটি যন্ত্রের মধ্যে তফাৎ ছিল লক্ষণীয়, কিন্তু সেচপ্রযুক্তির ইতিহাস সম্পর্কিত অধিকাংশ সাহিত্যকর্মেই ঐ তফাৎ ধরা পড়েনি।[৪৯] ভারতে, বাস্তবিকই মনে হয়, ঐ তফাৎ কোনো করা হয়নি। কিন্তু 'অরহট'-এর (যেটি ইদানীং পার্শি চাকা-র চালু প্রতিশব্দ) যে-সংজ্ঞার্থ উইলসন-এর শব্দকোষে দেওয়া হয়েছে তাতে স্পষ্টতই এটি 'নোরিয়া' [noria] ছাড়া অন্য কিছু নয়ঃ "একটি ঘূর্ণমান চাকা যা-দিয়ে নদী, বা ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্তী জলতলবিশিষ্ট জলাশয় থেকে জল তোলা হত।"[৫০] এর পরিপ্রেক্ষিতে তাহলে আমরা এটা ভাবতে পারি যে, ব্যবহারিক ফলপ্রসূতার বিবেচনায় 'নোরিয়া' [noria] এবং পার্শি চাকা-র মধ্যে একটি প্রধান পার্থক্য এই যে, 'নোরিয়া' [noria] ব্যবহার করা যেত কেবলমাত্র (নদী বা জলাশয়ের) উন্মুক্ত জলতলে, আর পার্শি চাকা দিয়ে গভীর কূপ থেকেও জল তোলা যেত। যদিও ভারতে এখন আর 'নোরিয়া' [noria] দেখা যায় না, ফ্রায়ার (১৬৭৬) এক জায়গায় এটির বর্ণনা দিয়েছিলেন পশ্চিম উপকূলে ব্যবহৃত সেচযন্ত্রাদির অন্যতম হিসাবে। অবশ্য তাঁর গ্রন্থের সম্পাদক যে ওটিকে পার্শি চাকা-ই ধরেছেন সেটা অস্বাভাবিক নয়।[৫১]

পার্শি চাকা-য় শিকলটির সাহায্যে কিছুটা গভীরতা থেকেও জল তোলা যায়, এবং গিয়ার-ব্যবস্থা থাকার ফলে পশুশক্তির নিয়োগ ও শিকলের বেগ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়। এটা মোটামুটি বোঝা যায় যে, এই দুটি বৈশিষ্ট্য ভারতে এসেছিল বা বিকশিত হয়েছিল বিচ্ছিন্নভাবে। শিকলটি দিয়ে প্রথমদিকে 'নোরিয়া'র [noria] মতোই কাজ করানো হত, পায়ে মাড়িয়ে।[৫২] এই যন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ আসলে ঘটেছিল এটিতে গিয়ার-ব্যবস্থা যুক্ত করায় কারণ, তা না হলে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রে অবিরাম দ্রুতগতিতে সেচের জল পৌঁছে দেওয়া যেত না।

সমস্ত খুঁটিনাটিসহ ভারতে ব্যবহৃত পার্শি চাকা-র আদিতম বর্ণনা পাওয়া যায় বাবরের রচনায় (১৫২৬-৩০)।[৫৩] এছাড়া পাওয়া যায় আনুমানিক ১৬৯৫-এ সুজন রাই ভাণ্ডারি-র লেখাতেও।[৫৪] ১৭শ শতাব্দীর মুঘল চিত্রাঙ্কনেও এর নিদর্শন দেখা যায়; এগুলির মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্টচিত্রিত (প্রতিলিপিতে

যেমন দেখা গেছে) হয়েছে শাহজাহান-এর আমলেরটিই।[৫৫] এই বর্ণনা ও অঙ্কনগুলি থেকে দেখা যায় যে, শিকলগুলি জোড়া-কাছির হত এবং এতে জল ধরে-রাখা ও ছেড়ে-দেওয়ার জন্য মৃৎপাত্রসহ কাঠের টুকরো বাঁধা থাকত। গিয়ার-ব্যবস্থা ছিল পুরোপুরি কাঠের তৈরি, পশুশক্তি কাজে লাগিয়ে একটি পিন-ড্রাম ঘোরানো হত যেটি আবার যুক্ত ছিল কূপের উপরিস্থ শিকলবাহী চাকাটির সঙ্গে একই অক্ষদণ্ডে অবস্থিত একটি পিন-হুইলের সাথে।

১৯শ শতাব্দীর ইংরেজ পর্যবেক্ষকরা—যেমন বিম্‌স (১৮৬৯)—পার্শি চাকার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার সঙ্গে এই বিবরণটি পুরোপুরি মিলে যায়।[৫৬]

লাহোর, দিপলপুর ও সরহিন্দ অঞ্চলে যন্ত্রটির ব্যাপক প্রচলন ছিল বলে বাবর উল্লেখ করেছেন।[৫৭] সুজন রাই-ও যন্ত্রটিকে পাঞ্জাবের লক্ষণবৈশিষ্ট্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ১৬৩৪-এ লেখা একটি ফার্সি রচনায় সিন্ধ-এ যন্ত্রটির ব্যবহারের নজির—ততটা স্পষ্টব্যক্ত না হলেও—পাওয়া গেছে।[৫৮] ১৯শ শতাব্দীতেও এটির ব্যবহার আগের মতোই সীমাবদ্ধ ছিল। বিম্‌স-এর নথি অনুসারে, এটিই ছিল পাঞ্জাবের বলতে গেলে একমাত্র জল তোলার যন্ত্র।[৫৯] তিনি অবশ্য দোয়াব-এও এটির ব্যবহারের বিবরণী দিয়েছেন, কিন্তু তা ছিল গঙ্গার চেয়ে বেশি বরং যমুনার দিকে। বলা হয়েছে যে, অযোধ্যায় এটি ১৮৩৯-এও পুরোপুরি অনুপস্থিত ছিল।[৬০] পার্শি চাকা-র ব্যবহার এতটা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ার কারণ সম্ভবত অগভীর বা কম-গভীর জলাশয় থেকে জল তোলায় এটির তুলনামূলক অনুপযোগিতা। এই সমস্ত ক্ষেত্রে ‘চরস’ [charas] (কপিকল ও দড়ি দিয়ে তোলা চামড়ার বালতি) ছিল অধিক কার্যকর।[৬১] গাঙ্গেয় অববাহিকায় পার্শি চাকা-র বিলম্বিত প্রচলনের একটা বড় কারণ হতে পারে এই যে, যন্ত্রটি কাঠের তৈরি নয়, এটি ধাতুনির্মিত। তা-সত্ত্বেও পার্শি চাকা-র পূর্বভারতে অনুপ্রবেশ না-হওয়ার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা হিসেবে এটিকে মেনে নেওয়া চলে না কারণ, পাঞ্জাব ও সিন্ধু ছাড়া গভীর-কূপ সেচব্যবস্থার প্রয়োজন অন্য কোথাও ছিল না—এটা অস্বীকার্য।

পূর্বভারতে এটির বিলম্বিত প্রচলনের এও আরেকটি কারণ হতে পারে যে, প্রথাগত কৃষিতে পার্শি চাকা-র ব্যবহার ছড়িয়ে গিয়েছিল পশ্চিমে পারস্য[৬২] ও মিশর[৬৩] পেরিয়ে স্পেন[৬৪] পর্যন্ত। এ-থেকেই একটা সম্ভাবনা জোরদার হয়ে ওঠে যে, যন্ত্রটির প্রচলনের মূল উৎস ছিল ভারতের বাইরে—পশ্চিমে—কারণ, তাহলেই সিন্ধু অববাহিকায় এটির উপস্থিতির, এবং পূর্বাঞ্চলে অনুপস্থিতির একটা যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

ভারতের বাইরে যন্ত্রটির হদিস যেখানে যেখানে পাওয়া গেছে তার ইতিহাস থেকেও এই সিদ্ধান্তটিই বেরিয়ে আসে। বালতি-শিকলের আদিতম উল্লেখ পাওয়া যায় বাইজান্টিয়াম-এর ফিলো-র (৩য় বা ২য় খ্রিস্টপূর্ব শতাব্দী) রচনায়, এবং রোম সাম্রাজ্যে এটির তখন ব্যাপক প্রচলন।[৬৫] যদিও, পশু-

শক্তি নিয়োগের সুবিধার্থে গিয়ার-ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছিল অনেক পরে। বস্তুত, পেশী ক্ষমতা সংবহনের জন্য গিয়ার-ব্যবস্থা দেখা গিয়েছিল ভিট্রুভিয়ুস-বর্ণিত (আনুমানিক ২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) একটি কলে, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে এটির এতদুদ্দেশ্যে ব্যবহার আরো পরবর্তীকালের। গিয়ার-সহ রোমান কলটি গ্রিকদেরটিকে (যেটি গিয়ার ছাড়া চলত ৮ম শতাব্দী থেকেই) উচ্ছেদ করেছিল—এই প্রচলিত মতটি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, যদিও নিশ্চিতের সময়কাল হিসেবে ১২শ শতাব্দীকেই ধরা হয়ে থাকে।[৬৬] এটা তাহলে একেবারেই সম্ভব বলে মনে হয় না যে, রোম সাম্রাজ্যে অথবা বাইজান্টিয়াম-এই প্রথম বালতি-শিকলের সঙ্গে গিয়ার প্রযুক্ত হয়েছিল।[৬৭]

এই গুরুত্বপূর্ণ সংযোগটি সম্ভবত সাধারণ্যে ব্যাপ্ত হয়েছিল (যদি উদ্ভূত নাও হয়ে থাকে) ইসলামি প্রযুক্তিচর্চায়। জল তোলার উদ্দেশ্যে সারি সারি জলপাত্রকে দাঁতাল চাকায় করে ঘোরানোর রচনা ও চিত্রায়ন করেছেন আল-জাযারি (১২০৬)।[৬৮] ইউরোপে পার্শি চাকা-র স্পেনের মধ্য দিয়ে অনুপ্রবেশের ঘটনা থেকে দেখানো হয়েছে যে, আরবরাই ছিল এর উদ্ভাবক।[৬৯] ইসলামভূমি থেকে এটি চিনে পৌঁছয়, যেখানে এটির আবির্ভাব বর্ণিত হয়েছে ১৩১৩ সালে।[৭০]

এ-সবের প্রেক্ষিতে, তুর্কি বিজয় এবং তার অব্যবহিত পরের শতাব্দীতেই (১৩শ ও ১৪শ শতাব্দী) পার্শি চাকা ভারতে এসেছে বলে যে-মতটি প্রচলিত আছে, সেটিকে অনাক্রম্য বলেই মনে হয়। এবং তাহলেই, আমরাও, এটির অনুপ্রবেশ ও সাধারণ্যে ব্যাপনের ফলে সিন্ধু-অঞ্চলে অর্থনৈতিক ঘটনা-পরম্পরা আন্দাজ করতে পারি।

আনুমানিক ১৫৯৫-এ, আবুল ফজল লিখেছেন যে, কৃষিতে পাঞ্জাবের সমকক্ষ কেউ ছিল না, এবং এ-কৃষি অধিকাংশতই ছিল কূপসেচের উপর নির্ভরশীল।[৭১] এর একশো বছর পরে সুজন রাই ভাণ্ডারি-র লেখা থেকে পাই যে পাঞ্জাবের অধিকাংশ চাষবাসই ছিল কূপসেচ-নির্ভর, যদিও খরিফ শস্য এবং ফসলের দরের ওঠানামা নির্ভর করত বৃষ্টিপাতের উপর।[৭২] প্লাবন বা খালসেচ অতএব সেখানকার কৃষিতে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না, যদিও আজকের দিনে এর বিপরীতটাই স্বাভাবিক মনে হয়। এর অর্থ হল, কূপ থেকে জলতোলার যে কোনো উন্নত যান্ত্রিক ব্যবস্থার গুরুত্ব (যেমন পার্শি চাকা) পাঞ্জাবে কৃষির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে থাকতে বাধ্য। পার্শি চাকা যে এ-ধরনের একটি ভূমিকা পালন করেছিল তা মেনে নিলে, সুজন রাই যে-পরম্পরাটিকে ধরে রেখেছিলেন, সেটি বোধগম্য হয়ে ওঠে। তদনুসারে, পাঞ্জাব ছিল একটি জনবর্জিত অঞ্চল, কয়েকটি ফাঁক-ফোঁকরে অল্পস্বল্প বসতি ছিল, এবং সেগুলিও আবার যখন-তখন মঙ্গোল হানাদারদের কবলে পড়ে বিধ্বস্ত হত (১৩শ ও ১৪শ শতাব্দীতে)। কিন্তু ১৫শ শতাব্দীতে

এই অঞ্চলে একটি বিপুল পুনর্বসতি ঘটে। কেবল উচ্চ বারি দোয়াব-এ [Upper Bari Doab] এর অগ্রগতির কথাই বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে, এবং তার কারণ সম্ভবত এই যে, লেখক নিজে ছিলেন ঐ অঞ্চলবাসী।[৭৩] সুজন রাই অবশ্য ঐ বিকাশকে পার্শি চাকা-র অবদান হিসাবে স্বীকৃতি দেননি, কিন্তু এখন আমরা আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গতভাবেই দেখি যে, ঐ ঘটনার পিছনে যন্ত্রটির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার আগে আরেকটি লক্ষণীয় তথ্যের উল্লেখ প্রয়োজন যে, ভারতের সেই সেই জায়গাতেই যন্ত্রটির বহুল প্রচলন ছিল যেখানে জাঠরা ছিল প্রধান কৃষিজীবী সম্প্রদায়। এই তথ্যটিকে নিছক কাকতালীয় বলে সরিয়ে রাখা যেত যদি না জাঠ-ইতিহাস, অন্তত আনুমানিকভাবে হলেও, এমন একটি প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসত যার মীমাংসা সম্ভব শুধুমাত্র যদি এটিকে ঐ জল-উত্তোলন যন্ত্রটির সাধারণ্যে ব্যাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করা যায়।

৭ম শতাব্দীতে য়ুয়ান চোয়াঙ লিখেছেন যে, সিন-তু (সিন্ধু) রাজ্যে "সিন্ধু নদীর তীরে, কয়েক হাজার 'লি' (li) সমতল জুড়ে যে জলা ও নিচুজমি ছিল সেখানে শত সহস্র (অর্থাৎ বহুসংখ্যক) পরিবারের বসবাস ছিল।...তারা নিজেদের পুরোপুরি নিয়োজিত রাখত পশুপালনে এবং সেটাই ছিল তাদের জীবিকা।...তাদের কোনো মালিক ছিল না, এবং—পুরুষ বা স্ত্রী—কেউই ধনী বা দরিদ্র ছিল না।" তারা নিজেদের বৌদ্ধ বলত, কিন্তু এই চিনা পর্যটক বলেছেন যে, তারা ছিল 'নিষ্কোমল মেজাজের' ও 'অস্থিরচিত্ত' মানুষ।[৭৪] য়ুয়ান চোয়াঙ যদিও এদের নাম উল্লেখ করেননি, কিন্তু আরব কর্তৃক সিন্ধুবিজয়ের বিশদ বিবরণটি (পৃ. ৭১০-৪) থেকে স্পষ্টতই মনে হয় যে, জাঠদের কথাই তিনি বলেছেন। তারা থাকত বর্জিতভূমিতে (দস্তি [dashu]); তাদের মধ্যে ছোট-বড় ভেদ ছিল না; এবং দাম্পত্যবিধি বলতে কিছুই তাদের ছিল না। বৌদ্ধদের প্রতি তারা আনুগত্য পোষণ করত; এবং ব্রাহ্মণ রাজত্ব-কালে (আরবদের হাতে যে-রাজত্ব ধ্বংস হয়েছিল) তাদের উপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছিল (যা আরবরাও স্বীকার করে)। একমাত্র যে-পূজার্ঘ্য তারা দিতে পারত তা হল যজ্ঞের কাঠ[৭৫]। ১১শ শতাব্দীতে এই জাঠরা গজনির মামুদ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল—সিন্ধু নদীর উপর নৌকায়, এবং মুলতান অঞ্চলে।[৭৬] অবশ্য অলবেরুনি তা সত্ত্বেও তাদের বলেছেন 'পশুপালক, নিচ শূদ্রজাতি।'[৭৭]

এই তথ্যাদির প্রেক্ষিতে, পরবর্তীকালে (১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে) যা-কিছু জাঠদের সম্পর্কে জানা যায় তাতে এটাই মনে হয় যে, এ-জাতটার অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক চরিত্র ব্যাপকভাবে বদলে গিয়েছিল। আইন-ই-

আকবরীতে (আনুমানিক ১৫৯৫) জাঠদের উল্লেখ আছে লাহোর, মুলতান, দিল্লি ও আগ্রাপ্রদেশের বিভিন্ন পরগণার জমিদার হিসেবে। দবিস্তান-ই-মজাহিব [Dabistan-i Mazahib] (আনুমানিক ১৬৫০)-এর রচয়িতা তাদের সম্পর্কে যা লিখেছেন, এখনকার কেউ লিখলেও তাই-ই লিখতেন। তারা ছিল চাষী হিসেবে অত্যুৎকৃষ্ট। "পাঞ্জাবী ভাষায় জাঠ বলতে বোঝাত গ্রামবাসী, অভব্য।" তারা নিচুজাত ছিল, কিন্তু পরে আর কেউ তাদের শূদ্র মনে করত না কারণ, জাত হিসেবে তারা পেয়েছিল বৈশ্যদের মধ্যে সর্বনিম্ন স্থানটি।[৭৮]

অন্যভাবে বলতে গেলে, সিন্ধু অববাহিকায় মেষ-উট-গবাদি পশুপালক ঐ বিশাল সম্প্রদায়টি ১১শ থেকে ১৬শ শতাব্দীর মধ্যে কোনো সময়ে একটি কৃষিজীবী সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। এর সঙ্গেই সম্ভবত ঘটেছিল সম্প্রদায়টির কিয়দংশের অভিবাসন—মধ্য অববাহিকা থেকে উত্তরে, এবং তারপরে পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে। ঘটনাটি মোটামুটি মিলে যায়—১. পার্শি চাকা-র ব্যাপন-প্রক্রিয়ার সাথে, যা—বাবরের বিবৃতি থেকে বিচার করলে— ঐ অঞ্চলে সম্পূর্ণ হয়েছিল ১৬শ শতাব্দীর আরম্ভ নাগাদ ; এবং ২. সুজন রাই-এর মতানুসারে, ১৫শ শতাব্দীতে পাঞ্জাবে যে ব্যাপক পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল, তার সাথে। এ-দুটির একটি আরেকটির সঙ্গে জড়িত নয়—এটা হতে পারে। কোথাও এমন কোনো স্পষ্ট বিবৃতি পাওয়া যায় না যার ভিত্তিতে এ-দুইয়ের মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপন করা যায়। কিন্তু এহেন একটি যোগসূত্র থাকার সম্ভাবনা যথেষ্টই : এবং আপাতত আমরা এমন একটি প্রকল্প ধরে এগোতে পারি যে, পার্শি চাকা প্রবর্তনের ফলে সিন্ধু অববাহিকায় কৃষি-পরিস্থিতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটে গিয়েছিল যার ফলে পূর্বতন মেষপালক গোষ্ঠী থেকে ব্যাপকসংখ্যায় অনুপ্রবেশ হয়েছিল কৃষি-সম্প্রদায়ে।

৩. এখন আমি এমন তিনটি উদ্ভাবন নিয়ে আলোচনা করতে চাই যাদের মধ্যে সাধারণগুণ হল এই যে, এগুলির প্রত্যেকটিই কোনো-না-কোনোভাবে বুদ্ধিগত বিকাশের সঙ্গে যুক্ত; অন্যথায়, উদ্ভাবন ও প্রয়োগফলের দিক থেকে এগুলির আলোচনা পৃথকভাবে হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল।

ভারতে কাগজের প্রবর্তন সম্পর্কে বেশি কিছু বলার দরকার নেই। আমাদের শুধু এটাই মনে রাখতে হবে যে, কাগজ এবং তার প্রস্তুতি ও ব্যবহার সম্পর্কিত জ্ঞান ছড়িয়ে পড়েছে দুটি ভিন্ন তরঙ্গপথে। কাগজের প্রস্তুতি সম্পর্কে জ্ঞানের পাশ্চাত্যমুখী ব্যাপন ঘটেছে অত্যন্ত ধীরগতিতে। ১০০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ চিনে প্রথম কাগজ তৈরি হয়। ৮ম শতাব্দীতে এটি পৌঁছয় সমরখন্দ ও বাগদাদে, ৯ম শতাব্দীতে মিশরে, এবং ১২শ শতাব্দীতে (সম্ভবত উত্তর আফ্রিকা হয়ে) স্পেন ও ফ্রান্সে। জার্মানিতে এটির অনুপ্রবেশ ১৪শ শতাব্দীর আগে হয়নি।[৭৯] কাগজ সম্পর্কে জ্ঞান এর আগের শতাব্দীগুলিতেই

ভারতে পৌঁছে থাকলেও, এখানে এটির কার্যকর ব্যবহার তত আগে শুরু হয়নি।[৮০] অলবেরুনি-র রচনা থেকে স্পষ্টই জানা যায় যে, ১১শ শতাব্দীর প্রথমভাগে মুসলমানরা পুরোদমে কাগজের ব্যবহার শুরু করে দিলেও, ভারতীয়রা তা আদৌ করছিল না; তারা লিখছিল তালপাতা এবং গাছের ছালে।[৮১] কাগজ প্রস্তুতি ১৩শ শতাব্দীর আগে শুরু হয়নি কারণ, ঐ শতাব্দীর শেষ দিকে আমির খসরুর রচনায় এটির উল্লেখ দেখা যায়।[৮২] কিন্তু তখনও এর প্রচলন ব্যাপক হয়নি কারণ, যখন কোনো-এক রাজাজ্ঞা বলবন-কর্তৃক (১২৬৬-৮৬) নাকচ হয়েছিল, তখন যে-কাগজে সেটি লেখা হয়েছিল সেই কাগজ ছিঁড়ে ফেলা হয়নি, শুধু লেখাগুলি মুছে দেওয়া হয়েছিল।[৮৩] আদিতম যে-কাগজের দলিল পারস্য থেকে পাওয়া গেছে, সেটি ৭১৮ খ্রিষ্টাব্দের।[৮৪] আদিতম যে-পাণ্ডুলিপি নিশ্চিতভাবেই ভারতে লেখা হয়েছিল তার নকল হয়েছিল গুজরাতে ১২২৩-২৪ খ্রিষ্টাব্দে।[৮৫]

যেকোনো সভ্যতাতেই কাগজের প্রবর্তনকে একটি যুগান্তকারী ঘটনা বলে ধরা হয়। দামে সস্তা, অথচ হাল্কা ও টেঁকসই—লেখার এমন উপকরণটি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে জ্ঞান বিস্তার ও শিক্ষার প্রসার দ্রুততর হয়ে উঠেছিল। এছাড়া, অর্থনীতিতে এর সরাসরি অভিঘাতটিও কম ছিল না। শুধু যে যোগাযোগ এবং নথি সংরক্ষণ ও হিসাবরক্ষা অত্যন্ত সহজ হয়ে গিয়েছিল তাই নয়, বাণিজ্যিক পত্রাদি বা হুণ্ডি ইত্যাদির প্রেরণ ও সঞ্চালনের কাজও দ্রুততর হয়েছিল। মধ্যযুগের গতিময় বাণিজ্য এবং ব্যাপক হাওলাতি ব্যবসা সম্পর্কিত তথ্যাদি[৮৬] আমরা যখন বিবেচনা করব, আমাদের অবশ্যই কাগজের প্রবল উপস্থিতির কথা সবসময় মাথায় রাখতে হবে।

অন্য যে-দুটি উদ্ভাবন নিয়ে এখন আলোচনা করব, কাগজের তুলনায় সেগুলির প্রয়োগফল অনেকাংশে সীমিত হলেও, নথিভুক্ত হওয়ার যোগ্য অবশ্যই। প্রথমটি হল নৌ-চালনার সহায়ক হিসেবে চৌম্বক কম্পাস-এর (দিকনির্দেশক চুম্বক) আবির্ভাব। বিষয়টি বিশদভাবে অধ্যয়ন করেছেন নীডহ্যাম, এবং তাঁর সিদ্ধান্ত হল এই যে, নৌ-চালনায় এটির ব্যবহার চিন দেশে ছিল ১১শ শতাব্দীর শেষভাগে, এবং একই কাজে ইউরোপে ব্যবহৃত হতে শুরু করে ১১৯০ খ্রিষ্টাব্দের আগেই।[৮৭] ইসলাম দুনিয়া সম্পর্কে ইদ্রিসিতে (১১৫৪) একটি প্রসঙ্গোল্লেখ আছে বলে শোনা যায়।[৮৮] কিন্তু প্রথম নিশ্চিত উল্লেখ পাওয়া যায় মহম্মদ আওয়ফি-র জামি'উল হিকায়ৎ-এ (১২৩২)। আমরা জানি যে, আওয়ফি একসময় সাগর পেরিয়ে ক্যাম্বে-তে গিয়েছিলেন, এবং নিশ্চয়ই সেখানকার জাহাজগুলিকে আরব সাগরযাত্রার সময় কম্পাস ব্যবহার করতে দেখেছিলেন। বৈলাক কিবাজীক (মৃত্যু: ১২৮২) তাঁর 'কনযুল তৈজার' (Kanzul Tajiar]-এ কম্পাসের বিবরণ দিয়েছেন এবং স্পষ্টই বলেছেন যে, এটি 'ভারতীয় সাগরগুলি'তে ও 'ভূমধ্যসাগরে' ব্যবহৃত হত।[৮৯]

এ থেকে এটাই মনে হয় যে, ভারতীয় বন্দরে আগত জাহাজগুলিতে যন্ত্রটির (জলে ভাসমান একটি চুম্বকশলাকা) ব্যবহার ১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। ভারত মহাসাগরে নৌ-চালনার ক্ষেত্রে যন্ত্রটির তাৎপর্য ছিল প্রায় মৌসুমী বায়ু আবিষ্কারের (খ্রিষ্টীয় যুগের প্রারম্ভিক শতাব্দীগুলিতে) সমতুল; এর ফলে জাহাজগুলি নির্ভয়ে সমুদ্র পারাপার করতে পারত। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই উদ্ভাবনের নিশ্চয়ই একটা বড় প্রভাব ছিল।

দ্বিতীয়ত, সময়রক্ষক যন্ত্র সম্পর্কে কয়েকটি কথা। অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নিয়মনের জন্য সঠিক সময়রক্ষক যন্ত্রের গুরুত্ব বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। ইসলাম-দুনিয়ায় যা অত উৎকর্ষে পৌঁছেছিল জ্যোতির্গবেষণার সেই যন্ত্র-গুলির মধ্য দিয়ে সময়রক্ষণ কারিগরির যে-উন্নতি প্রতীয়মান হয়ে উঠেছিল সেটা আলোচনা করাই, অতএব, আকর্ষণীয় হবে। বিশেষত অ্যাস্ট্রোলেব যন্ত্রটি ছিল একটি যথার্থ বহুমুখী সূক্ষ্ম যন্ত্র যার জন্য মুসলমান গণিতজ্ঞ ও কারিগরেরা তাঁদের শিক্ষা ও শৈলীর অনেকখানিই ব্যয় করেছিলেন।[২০] ১৩শ শতাব্দীর তৃতীয় চতুর্থাংশে সুলতান ফিরোজ তুঘলক ফিরোজাবাদের (দিল্লি) একটি স্তম্ভশীর্ষে কয়েকটি অ্যাস্ট্রোলেব ও সূর্যঘড়ি, এবং সম্ভবত একটি ক্লেপসিড্রাও (কারণ, মেঘাচ্ছন্ন আকাশেও নির্ভুল সময় রাখা হত বলে জানা যায়) স্থাপন করেন। সময় ঘোষিত হত ঘণ্টাধ্বনি দিয়ে, যা রাজধানীর সর্বত্র শোনা যেত। দিল্লির নাগরিকদের কাছে এই 'শহর ঘড়ি' ছিল যে-যুগের এক আশ্চর্য বস্তু।[২১] দুর্ভাগ্যবশত, দিন ও রাত্রির দৈর্ঘ্য বদলের সঙ্গে তাল রেখে অদলবদল করতে গিয়ে ঐ যন্ত্রগুলি ঘণ্টার অসমান মাপ (অর্থাৎ দিনের এক ঘণ্টা ও রাত্রের এক ঘণ্টার মধ্যে সময়াবকাশের তফাৎ) সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাটিকে স্থায়িত্ব দান করেছিল। যাই হোক, অর্থনৈতিক ও নাগরিক জীবনে এদের উপযোগিতা মনে রেখে, নতুন নতুন সময়রক্ষক যন্ত্র সম্পর্কে নিবিড় অনুসন্ধান একান্তভাবেই শুরু হওয়া উচিত।

৪. এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে, তুর্কি বিজয়ের কারণ এবং প্রতিরোধ-যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে, কিন্তু উভয়পক্ষের সমর-প্রযুক্তি নিয়ে কোনো গুরুতর পর্যালোচনা আজও করা হয়নি। এটা জোর দিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না—যদিও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে কারণ, এ-দিকটা প্রায়শই স্পষ্টভাবে আলোচিত হয় না—যে, ঐ যুদ্ধগুলি মুখ্যত ছিল ঘোড়সওয়ার-বাহিনীর যুদ্ধ, পদাতিক এবং হাতির ভূমিকা ছিল গৌণ।[২২] ভারতীয় ঘোড়সওয়ারবাহিনীতে কোন্ সময় লোহার রেকাব এবং ঘোড়ার খুরের নালের প্রচলন হয়েছিল, সেই প্রশ্নটি তাই তাৎপর্যবহ।

এ-দুই উদ্ভাবন সম্পর্কে নির্দিষ্ট অধ্যয়নের নাজির পাওয়া যায় লিন্ হোয়াইট-এর বইয়ে। তিনি বলেছেন: প্রথম যন্ত্রটির ক্রমবিবর্তনে ভারতীয় কারিগরদের এই ভূমিকা রয়েছে যে, খ্রিষ্টজন্মের এক-দুই শতাব্দী আগে একটি আলগা জিনবন্ধনী

—যার পিছনে ঘোড়সওয়ারের পায়ের পাতা ঢোকানো থাকত, এবং বুড়ো আঙুলের জন্য একটি ছোট্ট রেকাব—এখানেই নির্মিত হয়েছিল। এ-দুটিই সম্ভবত ছিল দড়ির তৈরি। এর পরে, ১০০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ, উত্তর-পশ্চিম ভারতে জিন থেকে ঝোলানো আঁকশির প্রচলন হয়।[৯৩] এই তিনটি উদ্ভাবনের গুরুত্ব এখানেই যে, এগুলির মধ্য দিয়েই রেকাব নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছিল, কিন্তু নিজেরা এগুলি তেমন সন্তোষজনক ফল দিচ্ছিল না। এগুলিতে কেবলমাত্র আংশিকভাবে পা-রাখার কাজটি হচ্ছিল যাতে সওয়ারটি তার দেহের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে, কিন্তু এর উপর দাঁড়িয়ে উঠে যুদ্ধ করার উপায় তার ছিল না। ফলে, প্রথম যুগের এই রেকাবগুলি বেশিদিন টেঁকেনি; এবং শুধু যে পরবর্তীযুগের ঘোড়সওয়ারদের ঐ ধরনের রেকাবসহ দেখা যায়নি তা-ই নয়, প্রাচীন ভারতের রেকাব সম্পর্কে কোনো সাহিত্যোল্লেখই এ-পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।[৯৪]

জুতসই লোহার রেকাব দেখা যায় চিনে, ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে, এবং (৯ম শতাব্দীর আরব লেখকদের রচনা অনুযায়ী) তা ৭ম শতাব্দীর শেষদিকে পৌঁছয় পারস্য ও ইসলাম-দুনিয়ায়।[৯৫] এভাবেই ১১শ ও ১২শ শতাব্দীর তুর্কি হানাদারেরা লম্বা রেকাব ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিল। এর প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাওয়া যায় ইলতুৎমিস-এর রাজত্বকালে (১২১১-৩৬) ফক্র-ই মুদাব্বির [Fakhi-i Madabbir] কর্তৃক লিখিত যুদ্ধ-বিবরণীতে।[৯৬] ভারতীয় সেনাদলে যে ঠিক কোন্ লোহার রেকাবের ব্যবহার শুরু হয়েছিল তার কোনো আলোচনা এখনকার রচনাদিতে দেখা যায় না। ১৩শ শতাব্দীর শেষভাগের ভাস্কর্যাদিতে[৯৭] এগুলির অস্পবিস্তর নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু ততদিনে তুর্কি বিজয় ঘটে গেছে।

ঘোড়ার নালের উদ্ভাবন সম্ভবত রেকাবের অনেক পরেই হয়েছিল। সাইবেরিয়ায় ৯ম-১০ম শতাব্দীর কয়েকটি সমাধিখনন করে এর কিছু নমুনা পাওয়া গেছে; এবং বাইজান্টিয়াম-এ এটির প্রথম লিপিবদ্ধ আবির্ভাবের সময়টা হল ৯ম শতাব্দী। ১১শ শতাব্দীতে এটি পশ্চিম ইউরোপে বহুলপ্রচলিত হয়ে ওঠে।[৯৮] ইসলাম-দুনিয়ায় এটির আবির্ভাব সম্পর্কে তেমন কোনো আলোচনা হয়নি। 'নাল' শব্দটির উল্লেখ থেকে বিশেষ কিছু ধরে নেওয়া যায় না কারণ, এ-শব্দটির দ্বারা মুখ্যত বোঝায় জুতো, বা উটের পা-ঢাকনি,[৯৯] এবং সেক্ষেত্রে বোঝায় ঘোড়ার খুর সুরক্ষার জন্য একটি চর্মাবরণ যা সম্ভবত গ্রিকো-রোমান যুগেও ব্যবহৃত হত।[১০০] কিন্তু ফক্র-ই মুদাব্বির (Fakhr-i Mudabbir)-এর বিবরণী পড়লে আমাদের কোনো সংশয় থাকে না যে, ১৩শ শতাব্দীর প্রথম দিকে, ভারতে আগত তুর্কিরা তাদের ঘোড়ার খুরে লোহার পাত পরাত। এ-থেকে আমরা আরো জানতে পারি যে, বুখারা-র শাসকের জন্য একটি উপযুক্ত ঘোড়া বাছাইয়ের পর বিশেষজ্ঞ ঘোড়াটিকে প্রথমে বিশ্রাম দেন, তারপর এটিকে জুতো (নাল) পরান, এবং শাসকটিকে গিয়ে বলেন যে, পরেরদিন তাঁকে ঘোড়াটি দেখানো হবে।[১০১] এই জুতো একমাত্র লোহার

নাল-ই হতে পারে। ঐ লেখকই জোর দিয়ে বলেছেন যে, অবরুদ্ধ হয়ে থাকা সেনাদলে নিশ্চিতভাবেই একজন নাল বন্দ্ [na'l band], বা ঘোড়ার-খুরে-নাল-পরানো কামার অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার।[১০২] ভারতে তুর্কিদের প্রতিপক্ষরা যে ঠিক কোন্ সময় থেকে এই রীতিতে নাল ব্যবহার শুরু করেছিল তার কোনো প্রামাণ্য নিদর্শন পাওয়া যায়নি।

পরবর্তী সময়ে ভারতীয়দের মধ্যে রেকাব ও ঘোড়ার নাল চালু হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু প্রথমদিকে (১১শ শতাব্দীর প্রথম দিকে বা ১২শ শতাব্দীর শেষাশেষি, বা এ-দুই সময়েই) বহিঃশত্রুরাই ঐ দুটি প্রকৌশল ব্যবহারের প্রাথমিক সুবিধা নিতে পেরেছিল, যা তাদের ঘোড়সওয়ারবাহিনীর ভেদশক্তি ও সহনক্ষমতা প্রচণ্ড-ভাবে বাড়িয়ে তুলেছিল। বিষয়টি আরো বেশি তথ্যসমৃদ্ধ হওয়া নিশ্চয়ই দরকার, এবং পরিমার্জিত হওয়া দরকার আরো বেশি প্রমাণাদির আলোকে। এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি হল, বিশেষত ১২০০ খ্রিষ্টাব্দের তিন-চার শতাব্দী আগেকার লিখন ও শিল্পকর্মাদি থেকে প্রমাণসংগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়া।[১০৩]

আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে, ১৩শ ও ১৪শ শতাব্দীতে গুরুতর যে-সমস্ত প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এসেছে তার সম্ভাব্য সবকটির ব্যাপক অনুসন্ধান নয়, বরং দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে তাদের কয়েকটির পরিচিতি দেওয়ারই চেষ্টা করব আমি। বাস্তুনির্মাণ শিল্প, চুন-বালির প্রলেপ, বা গম্বুজাকৃতির ছাদ সম্পর্কে আমি কিছুই বলিনি। কাটা ও ছিদ্র করার যন্ত্রাদি, উত্তোলক, বা ধাতুবিদ্যা—এই ক্ষেত্রগুলিতে যে-প্রযুক্তি আমদানি হয়েছিল তার সম্পর্কেও অধ্যয়ন নেই আমার। তবু, আগের ঐ অনুসন্ধানটুকু যতই সীমিত হোক না কেন, তা থেকে আমার এ-কথা মনে হয়েছে যে, ১৩শ ও ১৪শ শতাব্দীতে প্রযুক্তিগত যে-পরিবর্তনগুলি এসেছিল, তুলনামূলক বিবেচনায় তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। একেকটি আমদানি বা উদ্ভাবনের প্রয়োগফল নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি, কিন্তু তাদের সর্বমোট বা সাধারণ ফলাফলের প্রশ্নটি তুলিনি। তবে, এ-সিদ্ধান্ত করাই যায় যে, এর ফলে কারিগরি ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল, এবং বাণিজ্যিক সক্রিয়তাও প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল; এবং সম্ভবত এ-সবেরই সুবাদে ঘোড়সওয়ারবাহিনীর ভূমিকা তার সমস্ত রাজনৈতিক কার্যকারণসহ আরো গুরুত্ব লাভ করেছে।

এই সমস্ত ঘটনার ফলে শ্রেণী-সম্পর্কেরও কিছু-না-কিছু রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী ছিল। উদাহরণস্বরূপ, এটা খুবই সম্ভবপর বলে মনে হয় যে, নতুন কৃৎকৌশলে দক্ষ কারিগর সংগ্রহের জন্যই দাসপ্রথা বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ ও ব্যক্তিগত বশ্যতার চেহারা নিয়ে পুনরায় হাজির হয়েছিল। ১৩শ ও ১৪শ শতাব্দীর অর্থনৈতিক জীবনের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল এটি;[১০৪] যদিও পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে তা ক্রমশ কমজোর হয়ে গিয়েছিল।[১০৫] এ-ঘটনা আমাদের আরো একবার মনে করিয়ে দেয় যে, প্রযুক্তিগত বিকাশ নিজে থেকেই সমাজমুক্তি নিয়ে আসে না, যার একটি অমোঘ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তুলো-ঝাড়াইকল ও আমেরিকার নিগ্রো দাসপ্রথায়।

অনুরূপে আমরা আরো দেখি পণ্য উৎপাদনের বিপুল বৃদ্ধি কীভাবে পুঁজির বন্ধন-এর সৃষ্টি হয়েছিল, কীভাবে কাগজ ও তার পাশাপাশি বাণিজ্যের বাড়-বাড়ন্ত সুসংহত আমলাতন্ত্র (যা সর্বভারতীয় স্তরে সক্রিয় ছিল) গড়ে তুলেছিল, এবং কীভাবে ঘোড়সওয়ারবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি বাছাই ঘোড়সওয়ারসেনার ছোট্ট একটি দলের হাতে সামরিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেছিল। এ-থেকে আমরা সহজেই রাজস্বচুক্তির[১০৬] উপর প্রতিষ্ঠিত শাসকশ্রেণীর নতুন সংগঠনকে প্রযুক্তির পরিমণ্ডলে ও অর্থনৈতিক জীবনে ঘটমান পরিবর্তনগুলির সঙ্গে যুক্ত করে দেখতে পারি।

এই ধরনের সাধারণীকরণ মেনে নেওয়ার আগে এই সব এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রশ্নগুলিকে নিশ্চয়ই আরো নিবিড় ও গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। আমার প্রাথমিক উদ্দেশ্য শুধু এইটুকু যে, প্রযুক্তিগত বিকাশের অধ্যয়ন যেহেতু ইতিহাসের অন্য সমস্ত দৃষ্টিকোণগুলিকে প্রভাবিত করে, অতএব, অনতি-বিলম্বেই এ-কাজ আমাদের হাতে নেওয়া উচিত।

টীকা

১. এম. পি. খারেগত : 'অ্যাস্ট্রোলেব', ডি. ডি. কাপাড়িয়া সম্পাদিত, বোম্বাই, ১৯৫০; এম. এ. আলভি ও এ. রহমান : 'ফাতুল্লা শিরাজি, এ সিক্সটিন্থ-সেঞ্চুরি ইণ্ডিয়ান সায়ন্টিস্ট', নিউ দিল্লি, ১৯৬৮।

২. আর. জে. ফোর্বস্ : 'স্টাডিজ্ ইন এন্‌সেন্ট টেক্‌নোলজি', IV, লেডেন, ১৯৫৬, পৃ. ১৫৫, ভারত প্রসঙ্গে বিবৃতিগুলির কোনো সূত্রোল্লেখ করেন নি।

৩. সি. সিঙ্গার (সম্পাদিত) : 'হিস্ট্রি অফ টেক্‌নোলজি' II, পৃ. ২০২; রুশার : 'হিস্ট্রি অফ মেকানিকাল ইনভেন্‌শনস্', ১৯৫৯, পৃ. ২৬৮, এ-দুটি রচনাতেই আলোচ্য বছরটিকে ১২৯৮ ধরা হয়েছে, কিন্তু লিন্ হোয়াইট : 'মিডিয়েভ্যল টেক্‌নোলজি অ্যাণ্ড সোসাল চেঞ্জ', পৃ. ১১৯-এ বলেছেন ঐ সময়টি হল আনুমানিক ১২৮০, অসামঞ্জস্যটির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।

৪. এল. হোয়াইট, প্রাগুক্ত।

৫. 'টিবেট, ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড মালয় অ্যাজ সোর্সেস্ অফ ওয়েস্টার্ন মিডিয়েভ্যল টেক্‌নোলজি', আমেরিকান হিস্টরিকাল রিভিউ, LXV, সংখ্যা ৩, এপ্রিল ১৯৬০, পৃ. ৫১৭।

৬. জে. নীডহ্যাম : 'সায়ন্স অ্যাণ্ড সিভিলাইজেশন ইন চায়না' IV, ২, পৃ. ১০২-১০৫.

৭. উদাহরণস্বরূপ, উদ্ধৃতিসহ উল্লেখ দেখুন—এ. এস. আল্টেকর : 'পজিশন অফ উইমেন ইন হিন্দু সিভিলাইজেশন', বারাণসী, ১৯৫৬, পৃ. ২৩ ও পাদটীকা; এবং 'কামসূত্র' V, ৫.৫.

৮. মনিয়ের-উইলিয়মস্ : ইংরাজি-সংস্কৃত অভিধান (লণ্ডন, ১৯৫০)-এ 'স্পিনিং হুইল'-এর তিনটি সংস্কৃত প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেগুলি

স্পষ্টতই সুতাকাটা সম্পর্কিত সংস্কৃত শব্দাবলীর 'উপযুক্ত' যৌগ—এবং সম্ভবত অভিধান-রচয়িতা নিজেই শব্দগুলি তৈরি করেছেন ইংরাজি মূল শব্দের অর্থটি আক্ষরিকভাবে ব্যাখ্যা করতে—সংস্কৃত অভিধানে এগুলির একটিও পাওয়া যায় না। আমার সহকর্মী ডঃ আর, এস. শর্মাও (আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, সংস্কৃত বিভাগ) একই মত প্রকাশ করেছেন।

৯. রঘু বীর : 'কম্প্রিহেন্সিভ ইংলিশ-হিন্দি ডিক্শনারি'-তে 'স্পিনিং হুইল'-এর অর্থ দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র 'চরকা'।' আর. এইচ. টার্নার : 'ডিক্শনারি অফ নেপালি ল্যাঙ্গুয়েজ', লণ্ডন, ১৯৩১, পৃ. ১৬৮-তে ঐ অর্থ দেওয়া হয়েছে চরকা, এবং বলা হয়েছে এটি ফার্সি থেকে এসেছে, কথ্য হিন্দির মাধ্যমে। আমি এটির তেলেগু ও তামিল প্রতিশব্দ পেয়েছি, যথাক্রমে, 'রত্নমু' [ratnamu] এবং 'রোট্টেই' [rottai] ; কিন্তু এগুলির ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতে পারিনি।

১০. এগুলি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে ই. কুহ্নেল ও এইচ. গোয়েট্জ : 'ইণ্ডিয়ান বুক পেইন্টিং, ফ্রম জাহাঙ্গিরস্ অ্যালবাম এট্সেট্রা', লণ্ডন, ১৯২৬, প্লেট I-এ ; যদিও লেখকরা চিত্রাঙ্কনটির সময়নির্দেশে ভুল করে বলেছেন যে, এটি ১৬১৮-র (পৃ. ৯-১০)। দৃশ্যপট-টি মধ্য এশিয়ার, এবং চরকাগুলি ভারতে ব্যবহৃত চরকা-র তুলনায় ছোট ও সাদাসিধে। ভারতীয় ঐ চরকাগুলি চিত্রিত করেছেন যশস্বী চিত্রকর বিচিত্র [Bichitr] (১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে) (আই. শুকিন : La Peinture Indienne a'l Epoque des Grands Moghols, প্যারিস, ১৯২৯, প্লেট XLIV), এবং অওরঙজেব-এর শাসনকালে একটি চিত্রাঙ্কনে (এফ. আর. মার্টিন : মিনিয়েচার পেইন্টিং অ্যাণ্ড পেইন্টারস্ অফ পার্শিয়া, ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড টার্কি, প্লেট ২০৭এ)। উভয়-ক্ষেত্রেই ক্র্যাংক-হাতল লাগানো দেখা যায়।

১১. 'ঘাম' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হোল শোক, বা দুর্দশা, কিন্তু আমার মনে হয় এখানে একটি কারিগরি শব্দই উদ্দিষ্ট হয়েছে—চরকা যন্ত্রটির অংশবিশেষ বোঝাতে। যদিও, যে-সমস্ত অভিধান আমি ঘেঁটে দেখতে পেরেছি, তার মধ্যে উদ্দিষ্ট শব্দার্থটি পাইনি।

১২. ইসামি : 'ফুতুহস সালাতিন', উষা সম্পাদিত, পৃ. ১৩৪।

১৩. 'বোস্তান', হিকায়ত-এ এইভাবে শুরু করেছেন—বজুর্জ্ জাফাপেশাদার্ হাদ্-ই ঘাউর।

১৪. 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা', ১৯১১ সংস্করণ, XXV, পৃ. ৬৮৫-৬। এই রচনাটির প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য ডঃ আর. এস. শর্মা-র কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

১৫. এন. কে. সিন্হা : 'ইকনমিক হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল', কলকাতা, ১৯৫৬, I, পৃ. ১৭২-৩। এছাড়া তুলনীয় 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা', প্রাগুক্ত।

১৬. ফোর্বস, IV, পৃ. ১৫৬।

১৭. ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উভয় প্রক্রিয়ারই ব্যবহার সম্পর্কে জানার জন্য ওয়াট : 'ইকনমিক প্রোডাক্টস অফ ইণ্ডিয়া', IV, ১৮৯০, পৃ. ৯৪-৫, ১০৫-৬, ১১৫, ১২৩, ১৪৫, ১৪৭-৮, ১৫২-৩ দেখুন।

১৮. ওখানেই বলা হয়েছে যে, চরকিতে যে-সময়ে ৬ থেকে ৮ পাউণ্ড ধোনা যেত, খালি হাতে যেত মাত্র ১½ পাউণ্ড।

১৯. নীডহ্যাম, IV, ২, পৃ. ১১৯-২০।
২০. এল. হোয়াইট, 'মিডিয়েভ্ল টেক্নোলজি অ্যাণ্ড সোসাল চেঞ্জ', পৃ. ১০২, ১১০।
২১. নীডহ্যাম, IV, ২, পৃ. ১২২-৪।
২২. তত্রত্য, পৃ. ১২২।
২৩. তত্রত্য, পৃ. ১২২, ২০৪।
২৪. ওয়াট, IV, পৃ. ১৫২-৩। ১৮৮৯-এ মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি-র বণিকপক্ষ থেকে দাবি উঠেছিল যে, এই "শ্রমসাধ্য ও অদক্ষ পদ্ধতিটি অন্ততপক্ষে 'চুরকা' (চরকি) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হওয়া উচিত।" (তত্রত্য, পৃ. ১০৬)
২৫. নীডহ্যাম, IV, ২, পৃ. ১২০।
২৬. এল. হোয়াইট, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১, ১৭০।
২৭. লেইন : 'অ্যারাবিক-ইংলিশ লেক্সিকেন', বুক I, পার্ট ২, পৃ. ৬২৬।
২৮. নীডহ্যাম, IV, ২, পৃ. ১২২-৪, ২০৪।
২৯. আর. জে. ফোর্বস : 'স্টাডিজ্ ইন এন্শেন্ট টেক্নোলজি', লেডেন, ১৯৫৬, IV, পৃ. ২১।
৩০. আর. প্যাটারসন, সি. সিঙ্গার সম্পাদিত 'হিস্ট্রি অফ টেকনোলজি' II, পৃ. ১৯৫-এ। এছাড়া, তুলনীয় ফোর্বস : প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।
৩১. লেইন : প্রাগুক্ত, বুক I, পার্ট ৮, সংযোজনী, পৃ. ৩০৩০ (দ্র: 'নদাফা') অভিধান-রচয়িতাদের সময়কালের জন্য তত্রত্য, বুক I, পার্ট ১, পৃ. xiv-vi দ্রষ্টব্য। সর্বপ্রাচীন (আমার জ্ঞাতসারে) যে-ফার্সি অভিধানটিতে যন্ত্রটির উল্লেখ আছে তা-হল 'বুরহান-ই ক্বায়াতি' [Burhan-i Qati] (১৬৬১-৬২), দ্র 'কমাঞ্চা' [Kamancha]।
৩২. জে. স্কিনার : 'তশ্রিহুল অকওয়ম' (১৮২৫), [Tashrihul Aqwam (A. D. 1825), Br. Mus. Add.] ২৭, ২৫৫, পৃ. ২৩০ (আলেখ্য), এবং উল্টোদিকের পৃষ্ঠায় একজন কর্মরত নদ্দাফ [naddaf]-এর ছবি।
৩৩. এটির চিনে অনুপ্রবেশের কোনো সময়কাল দেননি নীডহ্যাম, কিন্তু মন্তব্য করেছেন যে, এটি "চিনে এসেছিল তুলোর সঙ্গেই" (IV, ২, পৃ. ১২৭)। যেহেতু তুলোর প্রচলন চিনে ১৩শ শতাব্দীতেই ব্যাপক হতে শুরু করেছিল, তাই এটা ধরা যেতে পারে যে, এই দেশে যন্ত্রটি ব্যবহারের প্রাচীনতর কোনো তথ্য (সুতো যদি না-ও হয়, পশমের ক্ষেত্রেও) আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।
৩৪. তত্রত্য, IV, ২, পৃ. ১২৭।
৩৫. জে. অ্যাবোয়ার : 'ডেইলি লাইফ ইন এন্সেন্ট ইণ্ডিয়া', ১৯৬৫, পৃ. ৯৫-এ আমি এই বিবৃতিটি পেয়েছি : "ধুনচি দিয়ে তুলো আঁচড়ানো হত, স্ত্রীলোকেরাই কাজটি করতেন, প্রথমে তুলোর বীজকোষ থেকে বীজগুলি বের করে নেওয়ার পর" ; কিন্তু এখানে কোনও সূত্রোল্লেখ করা হয়নি।
ধুনচি-র হিন্দি প্রতিশব্দ 'ধনুকি' (ফার্সিতে 'কমাঞ্চা' [kamancha]) এসেছে সংস্কৃত 'ধনুষ্' থেকে। কিন্তু প্রক্রিয়াটির প্রতিশব্দ 'ধুনক্না' বা 'ধুন্না' এসেছে অন্য একটি সংস্কৃত মূলশব্দ 'ধু' (ধাতু) থেকে, যার অর্থ হলো 'আছড়ানো, বাড়ি মারা (যেমন—মাথায় বাড়ি মারা)।' শব্দটি নিঃসন্দেহে সেই যুগের স্মৃতি বহন করে এখনও টিঁকে আছে, যে-যুগে একটি লাঠির সাহায্যে তুলো ঝাড়াই করা হত। (প্ল্যাট : 'ডিক্শনারি অফ উর্দু, ক্লাসিকাল হিন্দি অ্যাণ্ড ইংলিশ ডিক্শনারি', পৃ. ৫৪৮-৯ দেখুন)।

৩৬. শুধু উত্তরভারতেই নয়, মহীশূরেও ধুনচি দিয়ে তুলো ধোনার কাজটা "মুসলমানদের 'পিঁজরি' নামক গোষ্ঠীরই বিশেষ পেশা" ছিল (ওয়াট, IV, পৃ. ১৪৮)। তামিলনাড়ুতেও একই ব্যাপার, সেখানে তাদের 'পঞ্জারি' [Panjari] বা 'পঞ্জুকোট্টি' [Panjukotti] বলা হত; এবং অন্ধ্রে তাদের নাম ছিল 'ডুডেকুলা' [Dudekula] (থার্সটন অ্যাণ্ড রঙ্গাচারী : 'কাস্টম্ অ্যাণ্ড ট্রাইব্‌স্ অফ সাদার্ন ইণ্ডিয়া' II, মাদ্রাজ ১৯০৯, পৃ. ১৯৫ ও তারপরে)।

৩৭. আমির হাসান : 'ফৌয়াইদুল ফৌয়াদ' [Fowaidul Fawad], লতিফ মল্লিক সম্পাদিত, লাহোর, ১৯৬৬, পৃ. ৩৩৪-৫-এ ১০ই অক্টোবর ১৩১৮-র একটি বৈঠকের বিবরণী আছে যাতে শেখ নিজামুদ্দিন বলেছেন যে, সুলতানা রাজিয়ার (১২৩৬-৪০) সমসাময়িক এক মৌলানা নুর তুর্ক-এর ভরণপোষণ চলত তাঁরই এক ক্রীতদাস তুলো ধুনে যে উপার্জন করত, সেই অর্থের দ্বারা। কিন্তু যেহেতু আরবী শব্দ 'নদাফা' সম্ভবত এর অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল, লাঠি দিয়ে তুলো ঝাড়াই বোঝাতে, তাই উপরোক্ত সূত্রোল্লেখটি ভারতে ধুনচি-র প্রথম আবির্ভাবের কালনির্ণয়ে খুব বেশি কাজের হবে না।

৩৮. এ. এস. আল্টেকর : 'পজিশন অফ উইমেন ইন হিন্দু সিভিলাইজেশন', বারাণসী, ১৯৫৬, পৃ. ২৮২ ও তারপরে, বিশেষত পৃ. ২৮৭-৯)।

৩৯. তুলনীয় ব্যাশাম : 'দি ওয়াণ্ডার দ্যাট ওয়জ ইণ্ডিয়া', তৃতীয় সংস্করণ, লণ্ডন, ১৯৬৭, পৃ. ২১৩।

৪০. পূর্ণাঙ্গ সূত্রোল্লেখ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে জে. অ্যাবোয়ার : 'ডেইলী লাইফ ইন এন্‌শেন্ট ইণ্ডিয়া'-তে ভাস্কর্য ও চিত্রাঙ্কনগুলি, বিশেষত প্লেট ১, ২, ৪, ৭, ১০-১৩; এবং ব্যাশমে : প্রাগুক্ত-তে প্রচ্ছদপট ও প্লেট XXIII c-d, XXVIII, XXXIV, XXXV a-c প্রভৃতি দেখুন।

৪১. উদাহরণস্বরূপ, ফতেহ্‌পুর সিক্রি-র নির্মাণকার্যের চিত্রাঙ্কনে যে-সমস্ত পুরুষ ও নারীশ্রমিক আর পাথর-মাজিয়ে ও স্থপতিদের চিত্রিত করা হয়েছে 'আকবরনামা'য়, এবং পুনর্মুদ্রিত হয়েছে গেভিন হ্যাম্বলি : 'সিটিজ্ অফ মুঘল ইণ্ডিয়া', ১৯৬৮, প্লেট ২২, পৃ. ৪৬-এ; আই শুকিন্ : La Peinture, Indienne a'l Epoque des Grands Moghols, প্যারিস, ১৯২৯, প্লেট XLV-তে বিচিত্র-র আঁকা একটি গ্রামবাসীর ছবি—পথের ধারে বসে আছে; বা এফ. আর. মার্টিন : প্রাগুক্ত, II, প্লেট ২০৭(এ)-তে একটি পরিচারিকার ছবি—সুতো কাটছে। দুর্ভাগ্যবশত, দৈনন্দিন জীবনের ওপর মুঘল চিত্রাঙ্কনের তেমন ভালো সংগ্রহ এখনও প্রকাশিত হয়নি।

৪২. তুলনীয় মৎপ্রণীত 'অ্যাগ্রেরিয়ান সিস্টেম ইন মুঘল ইণ্ডিয়া', বোম্বাই, ১৯৬৩, পৃ. ৯৪-৬।

৪৩. মৎপ্রণীত 'ডিস্ট্রিবিউশন অফ ল্যাণ্ডেড প্রপার্টি ইন প্রি-ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া', 'এন্‌কোয়ারি', II, ৩ (১৯৬৫), দিল্লি, পৃ. ৫২ দেখুন।

৪৪. এ-সম্পর্কে কোনও তথ্য আমি পাইনি।

৪৫. তুলনীয় হজারিপ্রসাদ দ্বিবেদী : 'কবীর', বোম্বাই, পৃ. ৫-৬ ও পাদটীকা।

৪৬. "বলদ দিয়ে টানা 'পার্শি চাকা' কোনও নথিতেই স্পষ্টোল্লিখিত নেই, যদিও এর ব্যবহার থাকাটা অসম্ভব নয়।" (এ. এল. ব্যাশাম : 'দি ওয়াণ্ডার দ্যাট ওয়জ ইণ্ডিয়া', তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, লণ্ডন, ১৯৬৭, পৃ. ১৯৪)। এ-প্রসঙ্গে স্পষ্ট দাবি করেছেন দশরথ শর্মা : 'প্রসিডিংস্ অফ দি ইণ্ডিয়ান

হিস্ট্রি কংগ্রেস', ২৯তম অধিবেশন (পাতিয়ালা, ১৯৬৭), পাটনা, ১৯৬৮, পৃ. ৪১—"তথাকথিত পার্শি চাকা-র পার্শি বৈশিষ্ট্য কিছুই নেই। ভারতে এটির কথা সম্ভবত খ্রিস্টপূর্বযুগ থেকেই জানা ছিল।"

৪৭. দশরথ শর্মা : প্রাগুক্ত-য় অষ্টম ও দশম শতাব্দীর জৈন রচনাগুলির উল্লেখ করেছেন। আগেকার বৌদ্ধ সাহিত্য—যেগুলির উল্লেখ করেছেন জে. নীডহ্যাম : 'সায়েন্স অ্যাণ্ড সিভিলাইযেশন ইন চায়না', IV (২), পৃ. ৩৬১-২ ও পাদটীকায়—সেগুলির মতো এই জৈন রচনাগুলিতেও এটিকে ব্যবহার করা হয়েছে জন্ম-কর্ম-মৃত্যু চক্রটির রূপক হিসেবে। আরো দুটি রচনায় আমি এ-উল্লেখ দেখেছি যেগুলি কমবেশি 'নোরিয়া'-র [noria] সঙ্গেই খাপ খায়। পি. ভি. কেইন সম্পাদিত বাণ (৭ম শতাব্দী)-এর 'হর্ষচরিত', উচ্ছ্বাসজ [Uchchvasas] I-III, পৃ. ৪২-এ এক সমৃদ্ধ দেশের কথা আছে যেখানে জিরা-বীজের কেয়ারিতে চাকায়-বাঁধা পাত্র (উদ্ধতঘটি প্রভৃতি) দ্বারা জল দেওয়া হত। লক্ষণীয় এই যে, ইংরেজ অনুবাদকেরা এটিকে 'পার্শি চাকা-র পাত্র' করেছেন [কওয়েল অ্যাণ্ড টমাস (অনূদিত) : 'হর্ষচরিত', দিল্লি, ১৯৬১, পৃ. ৭৯]। এম. এ. স্টাইন সম্পাদিত কলহন (১১৪৯-৫০)-এর 'রজতরঙ্গিণী', বুক IV, ১৯১, অনু. I, পৃ. ১৪০-১ ও পাদটীকায় বলা হয়েছে যে, কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য (৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভ) "বিতস্তা নদীর জল-সঞ্চালনের, এবং ঐ জল বিভিন্ন গ্রামে বন্টনের জন্য সারি সারি জলচক্র (অরঘট্ট) নির্মাণের ব্যবস্থা" করেছিলেন। এল. গোপাল মারওয়াড় থেকে ১২শ শতাব্দীর যে-শিলালিপি পাওয়া গেছে, সেগুলিতে 'পার্শি চাকা' বা 'যন্ত্র-কূপে'র উল্লেখ পেয়েছেন, কিন্তু সেখানে প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই ব্যবহৃত মূলশব্দটি হল 'অরঘট্ট' বা 'অরহট্ট' (*JESHO*, IV, i, ১৯৬১, ৮৯, VI, iii; ১৯৬১, পৃ. ২৯৭)।

'অরঘট্ট'-এর আরো দুটি সূত্রোল্লেখ দেখি, যার প্রথমটিতে সিদ্ধান্তসূচক সমর্থন রয়েছে যন্ত্রটি যে আদতে নোরিয়া-ই [noria] এবং পার্শি চাকা নয়—এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি। 'বিনয়-পিটক' নিয়ে লেখা একটি পালি টীকাভাষ্যে বলা হয়েছে, এটি (অরঘট্ট)-তে ছিল গোশকটের চাকার বেড় বরাবর মৃৎভাণ্ড বাঁধা, যেগুলিতে জল উঠত যখন চাকাটি ঘোরানো হত এক বা দুজন লোক দ্বারা। [শ্লোকটি আছে ট্রেঙ্কনার প্রমুখ কর্তৃক সংকলিত 'ক্রিটিকাল পালি ডিক্শনারি', কোপেনহ্যাগেন, ১৯৪৮, I, পৃ. ৪২৩-এ; শ্লোকটির অনুবাদের জন্য আমি ডঃ এস. পি. সিং-এর (সংস্কৃত বিভাগ, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়)] কাছে তাঁর সহৃদয়তার জন্য ঋণী। নীডহ্যাম-ও পরিচ্ছেদটি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন (প্রাগুক্ত, IV, ২, পৃ. ৩৬১ ও পাদটীকা), কিন্তু মনে হয় ততটা গুরুত্ব দেননি।

অন্য সূত্রোল্লেখটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন শ্রীযুক্ত আর. সি. গৌর। এটি আছে বাণ : 'কাদম্বরী', কাশী সংস্কৃত গ্রন্থমালা, বারানসী, ১৯৫০, পৃ. ১৫২-তে। এতে বলা হয়েছে উজ্জয়িনী নগরের পরিপার্শ্বস্থ তরুবীথি ও রসাল ফলের বাগানে সেচের জন্য অবিরাম ঘূর্ণমান জল-ঘটি-যন্ত্রের কথা। অবশ্য আমরা যে বিশেষ দিক্‌টা সম্পর্কে জানতে চাই, সে-প্রসঙ্গে কোনও তথ্য এখানে মেলে না।

৪৮. নীডহ্যাম, IV, ২, পৃ. ৩৬১-২।

৪৯. তুলনীয় এ. পি. য়ুশার : 'এ হিস্ট্রি অফ মেকানিকাল ইন্‌ভেন্‌শনস্‌', বোস্টন, ১৯৫৯, পৃ. ১২৯। তাঁর বিবেচনায় এই বিভ্রান্তি অমার্জনীয়। অবশ্য বিভ্রান্তিটি এসেছে দীর্ঘকালীন বহুল প্রচলন থেকে। আরবিতে না উরা [na 'ura] (নোরিয়া [noria]), সাকিয়া [saqiya] ও দৌলাব [doulab]) শব্দগুলি সমার্থক (লেইন : 'অ্যারাবিক ইংলিশ লেক্সিকন', লণ্ডন, ১৮৬৭, পৃ. ৯০২, দ্রঃ দৌলাব [doulab], দলব [dalab]-এর অন্তর্গত)। এভাবেই বালতি-চাকা, নোরিয়া ও পার্শি চাকা সমার্থক হয়ে গেছে ইংরাজিতে (অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিক্‌শনারি)।

৫০. উইলসন : 'গ্লসারি অফ জুডিশিয়াল অ্যাণ্ড রেভিনিউ টার্মস এট্‌সেট্রা', লণ্ডন ১৮৭৫, পৃ. ৩২। অবশ্য, উইলসন-ও নোরিয়া এবং পার্শি চাকা-র মধ্যে বিভ্রান্তি এড়িয়ে যেতে পারেননি (তৎপ্রদত্ত 'রহট'-এর সংজ্ঞার্থ দেখুন, পৃ. ৪৩২)।

৫১. জন ফ্রায়ার : 'এ নিউ অ্যাকাউন্ট অফ ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড পার্শিয়া, এট্‌সেট্রা', ডব্‌ল্যু, ক্রুক সম্পাদিত, লণ্ডন, ১৯১২, II, পৃষ্ঠা ৯৪ ও পাদটীকা।

৫২. তুলনীয় 'রহট' (মারাঠি)—"একটি পদচালিত জলচক্র" (উইলসন : প্রাগুক্ত দ্র)। এন. জি. মুখার্জি : 'হ্যাণ্ডবুক অফ ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচার', কলকাতা, ১৯০১, পৃ. ১১৭-এ একটি "পার্শি চাকা (রত্নগিরি ধরণের)" ছবি ও বর্ণনা আছে, যাতে দেখানো হয়েছে হস্তচালিত একটি ড্রামে সংলগ্ন একসারি জলপাত্র।

৫৩. এ. এস. বেভারিজ (অনূদিত) : 'বাবরনামা', II, ৪৮৬। এই অনুবাদটিকে আমি আবদুর রহিম-এর ফার্সি অনুবাদ (ব্রিটিশ মুাজিয়ম, পাণ্ডুলিপি ৩৭১৪ [Br. Mus. Ms. Or. 3714] পৃ. ৩৭৬)-এর সাথে মিলিয়ে দেখেছি।

৫৪. জাফর হাসান (সম্পাদিত) : 'খুলাসাৎ-উৎ তওয়ারিখ' [Khulasatu-t Tawarikh], পৃ. ৭৯।

৫৫. জে. ভি. এস. উইলকিন্সন : 'মুঘল পেইন্টিং', ফেবার গ্যালারি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট, প্লেট ৯।

৫৬. এইচ. এম. ইলিয়ট : 'মেমোয়ার্স অফ দি রেসেস্‌ এট্‌সেট্রা অফ ওয়েস্টার্ন প্রভিন্সেস্‌ অফ ইণ্ডিয়া', জন বিম্‌স সম্পাদিত, লণ্ডন, ১৮৬৯, II, পৃ. ২১৯-২০।

৫৭. শ্রীমতী বেভারিজ ভ্রমবশত 'ও সরহিন্দ' শব্দদুটিকে ছেড়ে গেছেন।

৫৮. ইউসুফ মীরক : 'মজহর-ই শাহ্‌জাহানী' [Mazhar-i Shahjahani], মীর হুসমউদ্দীন রশিদী সম্পাদিত, করাচি, ১৯৬১, খণ্ড II, পৃ. ৬৪।

৫৯. ভিন (Vigne) : 'পার্সোনাল ন্যারেটিভ অফ এ ভিজিট টু গজনী, কাবুল অ্যাণ্ড আফগানিস্তান', ১৮৪০, পৃ. ১৩, ১৪-ও দেখুন, পাক পট্টন ও মুলতানের মধ্যবর্তী অঞ্চলে 'পার্শি কূপে'র ব্যাপক প্রচলনের জন্য। লেখক ঐ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন ১৮৩৬-এ।

৬০. ডোনাল্ড বাটার : 'টোপোগ্রাফি অ্যাণ্ড স্ট্যাটিস্টিক্স অফ সাদার্ন ডিস্ট্রিক্ট্‌স অফ অওয়ধ', কলকাতা, ১৮৩৯, পৃ. ৬৭।

৬১. বিম্‌স : প্রাগুক্ত গ্রন্থে বিস্ময়করভাবে বিপরীত মতপ্রকাশ করেছেন, অর্থাৎ তিনি বলেছেন যে গভীরতর কূপগুলিতে ব্যবহারের পক্ষে পার্শি চাকা ছিল অচল। কিন্তু বস্তুতঃ, এ-ধরণের কূপে অকার্যদক্ষ ছিল 'চরস' (charas)-ই ;

কূপের গভীরতা যত বেশি হত, জল ঢালার মধ্যে বিরতিও তত বেশি হত। অন্যদিকে, পার্শি চাকায় কাজ চলত অবিরাম, যদিও দীর্ঘতর শিকলের বাড়তি ওজনের জন্য অধিক পশুশক্তি নিয়োগের প্রয়োজন হত। তুলনীয় সুজন রাই : প্রাগুক্ত, তিনি বলেছেন এমন বেল্ট-এর কথা যেগুলির প্রত্যেকটিতে একশোটি করে পাত্র লাগানো থাকত, এবং প্রতিক্ষেপে কয়েক শো 'মণ'ই জল ঢালতে পারত। এই মণ সম্ভবতঃ ছিল মণ-ই শাহ্‌জাহানী, যা প্রায় ৭৩-৭৬ পাউণ্ড ওজনের।

৬২. অধুনা পারস্যে এটির উপস্থিতির জন্য এ. কে. এস. ল্যাম্বটন : 'ল্যাণ্ডলর্ড অ্যাণ্ড পেয়্যান্ট ইন পার্শিয়া', লণ্ডন, ১৯৫৩, পৃ. ২২৮ দেখুন। সেখানে বলা হয়েছে যে, গুস্তার অঞ্চলে এটি পরিচিত ছিল 'চরখিদুল' [charkhidul] নামে।

৬৩. এন. জি. মুখার্জি : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮-এ উদ্ধৃত। লেইন : 'মডার্ন ঈজিপ্শিয়ানস্' দেখুন। এছাড়াও তুলনীয় লেইন : 'অ্যারাবিক-ইংলিশ লেক্সিকন', বুক I, পার্ট ৩, পৃ. ৯০২ (দ্র দৌলাব [doulab])।

৬৪. সেখানে এটি 'নোরিয়া' বলে (অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিক্শনারি দেখুন) পরিচিত—আরবি না উরা [na 'ura] থেকে শব্দটি আগত। স্পষ্টতই, স্পেনীয়রা যন্ত্রটি পেয়েছিল মুরদের কাছ থেকে।

৬৫. য়ুশার : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১। নীডহ্যাম, IV, ২, পৃ. ৩৫১।

৬৬. য়ুশার, ১৬৮, ১৭৭-৮. দুর্ভাগ্যবশত, জল-উত্তোলন যন্ত্রাদি সম্পর্কে তাঁর চমৎকার আলোচনাটিতে নীডহ্যাম, মনে হয়, ঐ যন্ত্রগুলিতে গিয়ার সংযুক্তির কালনির্ণয়ের চেষ্টাই করেননি।

৬৭. একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্রোল্লেখ নীডহ্যাম (IV, ২, পৃ. ৩৬৯) পেয়েছিলেন ব্লক-এর কাছ থেকে। বাইজান্টাইন ও আমেরিকান নথিপত্র অনুযায়ী, মেট্রডরাস নামে এক পার্শি ইহুদি ৪র্থ শতাব্দীতে ভারতে এসেছিলেন, এবং লক্ষ্য করেছিলেন যে, জলচক্রগুলি এ-দেশে নতুন উদ্ভাবন হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে। পার্শি কলগুলি যেহেতু ছিল অনুভূমিক ধরনের, তাই মেট্রডরাস-ই ভারতে গিয়ার ব্যবস্থা চালু করেছিলেন এমন ধরে নেওয়া যায় না।

৬৮. নীডহ্যাম, IV, ২, চিত্র ৫৮৭ (পৃ. ৩৫৩) এবং লিখন পৃ. ৩৫২-৩ দেখুন।

৬৯. ওখানেই, পৃ. ৩৫৩ ; আর. জে. ফোর্বস : 'স্টাডিজ্ ইন এন্শেন্ট টেক্নোলজি' II, লেডেন, ১৯৫৫, পৃ. ৪৭।

৭০. নীডহ্যাম, IV, ২, পৃ. ৩৫৪, ৩৬২।

৭১. 'আইন-ই-আকবরী', ব্লকম্যান সম্পাদিত, পৃ. ৫৩৮।

৭২. 'খুলাসাৎ-উৎ তওয়ারিখ' [Khulasatu-t Tawarikh], জাফর হাসান সম্পাদিত, পৃ. ৭৯।

৭৩. তত্রত্য, পৃ. ৬৬-৭, ৮৮।

৭৪. এস. বীল : 'বুদ্ধিস্ট রেকর্ডস্ অফ দি ওয়েস্টার্ন ওয়র্ল্ড', ii, পৃ. ২৭৩। তুলনীয় ওয়াটার্স : 'য়ুয়ান চোয়াঙস্ ট্রাভ্‌ল্স ইন ইণ্ডিয়া', ii, পৃ. ২৫২।

৭৫. দাউদপোতা (সম্পাদিত) : 'চচ্‌নামা', পৃ. ৪৭-৮, ৬১, ২১৪-৫।

৭৬. গর্দেজি : 'জৈনুল অখ্‌বার', এম. নাজিম সম্পাদিত, পৃ. ৮৭-৮।

৭৭. শকাও (অনূদিত) : 'অলবেরুনিজ্ ইণ্ডিয়া' I, পৃ. ৪০১। মথুরার কথা বলতে বলতে জাঠদের কথা এসে পড়েছে ; কিন্তু তাঁর স্বীয় পর্যবেক্ষণ লাহোরেই সীমাবদ্ধ ছিল।

৭৮. নজর আশ্‌রফ : 'দাবিস্তান-ই মজাহিব' [Dabistan-i Mazahib], কলকাতা, ১৮০৯, পৃ. ২১৪, ২৭৪, ২৮৬।
৭৯. য়ুশার : 'হিস্ট্রি অফ মেকানিকাল ইন্‌ভেনশনস', পৃ. ২৩৯।
৮০. এরকম ধারণার পক্ষে সূত্রোল্লেখ আছে ডি. সি. সরকার : 'ইণ্ডিয়ান এপিগ্রাফি', দিল্লি, ১৯৬৫, পৃ. ৬৭ ও পাদটীকায়। সরকার কর্তৃক উদ্ধৃত পি. কে. গোড়ে-র গবেষণাপত্র 'মাইগ্রেশন অফ পেপার ফ্রম চায়না টু ইণ্ডিয়া' পড়ে দেখতে না-পারার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।
৮১. শকাও (অনূদিত) : 'অলবেরুনিজ্‌ ইণ্ডিয়া', I, পৃ. ১৭০-১।
৮২. মহম্মদ ইসমাইল (সম্পাদিত) : কুররান-উস্‌ সা'দৈন' [Qiranu-s Sa' dain], আলিগড়, ১৯১৮, পৃ. ১৭৭, ২২৮-৩০.
৮৩. বরানি : 'তারিখ-ই ফিরোজ-শাহী' [Ta'rikh-i Firuz-shahi], পৃ. ৬৪। তুলনীয় কে. এম. আশ্‌রফ : 'লাইফ অ্যাণ্ড কণ্ডিশনস্‌ অফ দি পিপ্‌ল অফ হিন্দুস্তান', দিল্লি, ১৯৫৯, পৃ. ১০৩।
৮৪. একটি চিঠি, যা একজন খোটান অফিসারের কাছে লেখা হয়েছিল জুদেও-ফার্সিতে। এটির বর্ণনা আছে এ. স্টাইন : 'এন্‌শেন্ট খোটান', ১৯০৭, পৃ. ৩০৭-৮-এ (ওয়াট : 'কমার্শিয়াল প্রডাক্টস্‌ অফ ইণ্ডিয়া', লণ্ডন, ১৯০৮, পৃ. ৮৬০-এ উদ্ধৃত)।
৮৫. ডি. সি. সরকার : প্রাগুক্ত। তাঁর মতে ১১শ শতাব্দীতে লেখা বলে বর্ণিত কাশ্মীরের একটি পাণ্ডুলিপি সম্ভবতঃ ভারতের বাইরে কোথাও লেখা হয়েছিল।
৮৬. এজন্য মৎপ্রণীত : 'ইউজুরি ইন মিডিয়েভ্‌ল ইণ্ডিয়া', 'কম্পারেটিভ্‌ স্টাডিজ্‌ ইন সোসাইটি অ্যাণ্ড হিস্ট্রি' VI, ৪, জুলাই ১৯৬৪, পৃ. ৩৯৩ ও তৎপরবর্তী।
৮৭. নীডহ্যাম, IV, ১, পৃ. ২৪৫-৫০।
৮৮. সঈদ সুলেইমান নদ্‌ভী : 'আরবোঁ কী জাহাজরাণী', আজমগড়, ১৯৩৫, পৃ. ১৪৮-৯। ইদ্রিসি উদ্ধৃত করলেও স্বীকার করেছেন যে, পরিচ্ছেদটি তিনি নিজে পড়ে দেখেননি।
৮৯. নদ্‌ভী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯-৫২। তুলনীয় নীডহ্যাম, IJ, ১, ২৪৭।
৯০. অ্যাস্ট্রোলেব সম্পর্কে অনেক কিছুই লেখা হয়েছে। তুলনীয় 'এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ইস্লাম', নতুন সংস্করণ। পরবর্তী যুগের ভারতীয় আস্ট্রোলেব-এর বর্ণনার জন্য এম. পি. খারেগত : 'অ্যাস্ট্রোলেব', ডি. ডি. কাপাডিয়া সম্পাদিত, বোম্বাই, ১৯৫০ দেখুন। অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যও পাওয়া যাবে ওখানে। ইস্লামী ক্লেপসাইড্রা সম্পর্কে জানতে হলে নীডহ্যাম, III, পৃ. ৩১৮ পাদটীকা দেখুন।
৯১. সুলতান ফিরোজ-এর নক্ষত্রঘড়ি (তাস ঘড়িয়ালা [Tas Ghariala]) এবং এর যন্ত্রাংশ সম্পর্কিত তথ্যাদি আছে 'সিরাৎ-ই ফিরোজ শাহী' [Sirat-i Firuz Shahi], বাঁকিপুর পাণ্ডুলিপি, পৃ. ১৫৩-৪ ও তারপরে, এবং আফিফ : 'তারিখ-ই ফিরোজ শাহী' [Tarikh-i Firuz Shahi], পৃ. ২৫৪-৬০।
৯২. সিন্ধুর শাসক দহর যখন যুদ্ধের শেষদিনে আরব সৈন্যদের সম্মুখীন হন (৭৩২ খ্রিস্টাব্দ), প্রায় ১০,০০০ ঘোড়সওয়ার তাঁকে ঘিরে ফেলে ('চচ্‌নামা', দাউদপোতা সম্পাদিত, পৃ. ১৭৩)। প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে পাওয়া যুদ্ধের বিশদ বিবরণ আছে 'চচ্‌নামা'য়, কিন্তু এমন কোনও তথ্য নেই যা-থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, ভারতীয়রা পদাতিক বা গজবাহিনীর উপর চূড়ান্ত

নির্ভরশীল ছিল। যদিও এ-কথা সত্যি যে, ঐ সময় তাদের কাছে ন্যাপ্‌থা (গ্রিক বিস্ফোরক) ছিল না, যা তাদের প্রতিপক্ষ ব্যবহার করেছিল।

৯৩. এল. হোয়াইট : 'মিডিয়েভ্‌ল টেক্‌নোলজি অ্যাণ্ড সোসাল চেঞ্জ', পৃ. ১৪-৫।

৯৪. ভি. আর. আর. দীক্ষিতর : 'ওয়র ইন এন্‌শেন্ট ইণ্ডিয়া', মাদ্রাজ, ১৯৪৪, পৃ. ১৭৪-৭৯ (ঘোড়সওয়ার-এর পরিচ্ছেদ) দেখুন।

৯৫. এল. হোয়াইট : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-৯।

৯৬. আহ্‌মদ সুহৈলি (সম্পাদিত) : 'আদাব-উল হর্‌ব-উশ্‌ সুজা'য়ৎ [Adabu-l Harbu-sh Suja'at], তেহরান, ১৩৪৬, পৃ. ১৯১। রেকাব না-পরানো ছিল ঘোড়ার সম্ভাব্য খুঁতগুলির মধ্যে অন্যতম। (অধ্যাপক কে. এ. নিযামি-র কাছে আমি ঋণী, এই চমৎকার রচনাটি আমায় পড়তে দেওয়ার জন্য)। আরবীতে 'রিকাব' শব্দটি মূলতঃ ব্যবহৃত হত যাত্রীবাহী উট বোঝাতে; ঘোড়সওয়ারের রেকাব-অর্থে প্রযুক্ত হয় পরবর্তীকালে, আদিতম আভিধানিক স্বীকৃতি পাওয়া গেছে ১১শ শতাব্দীতে (লেইন : 'অ্যারাবিক-ইংলিশ লেক্সিকন', I, ৩, পৃ. ১১৪৩-৪৪)।

৯৭. ব্যাশাম : 'দি ওয়াণ্ডার দ্যাট ওয়জ্‌ ইণ্ডিয়া', প্লেট LIIb (দামাদ, বরোদা, ১২৯৮) এবং LVIII (কোনারক, ১৩শ শতাব্দী) দেখুন।

৯৮ এল. হোয়াইট : প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮-৯।

৯৯. লেইন ঃ প্রাগুক্ত, I. ৮ (সংযোজনী), পৃ. ৩০৩৫।

১০০. তুলনীয় এল. হোয়াইট : প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

১০১. 'আদাব-উল হর্ব-উশ সুজাৎ', পৃ. ১৯১।

১০২. তত্রত্য, পৃ. ৪২৩।

১০৩. পাশাপাশি এটাও বলা যায় যে, লোহার নাল প্রবর্তনের কিছু প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক ফলাফলও ছিল। বলদের খুরে নাল পরানো চালু হওয়ার পরে পাথুরে রাস্তায় পরিবহণ যথেষ্ট উন্নত হয়েছিল (তুলনীয় থেভ্‌নট : 'ইণ্ডিয়ান ট্রাভ্‌লস্‌ অফ থেভ্‌নট অ্যাণ্ড ক্যারেরি', এস. এন. সেন সম্পাদিত, নিউ দিল্লি, ১৯৪৯, পৃ. ৭২-৩, রাজস্থান সম্পর্কে ৩৬৬৬-তে লেখা)।

১০৪. তুলনীয় দিল্লির বিরাট দাসবাজার সম্পর্কে বরানি-র বর্ণনা, যেখানে 'প্রশিক্ষিত দাস' এবং 'অপ্রশিক্ষিত বালক' কেনাবেচা হত ('তারিখ-ই ফিরোজ শাহী' [Ta'rikh-i Firuz-shahi], *Bib. Ind.*, পৃ. ৩১৪-৫). কথিত আছে যে, সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি (১২৯৬-১৩১৬)-র ৫০,০০০ দাস ছিল; ফিরোজ তুঘলকের ছিল ১৮০,০০০ দাস, এবং এর মধ্যে ১২,০০০ নিযুক্ত ছিল রাজকর্মশালার কারিগর হিসাবে (আফিফ : 'তারিখ-ই ফিরোজ শাহী' [Ta'rikh-i Firuz shahi], পৃ. ২৬৭-৭৩).

১০৫. "সব ধরনের কাজের উপযুক্ত অসংখ্য ও অফুরান শ্রমিকের" দেশ হিসাবে ভারতকে বাবর-এর প্রশংসা ('বাবরনামা', এ. এস. বেভারিজ্‌ অনূদিত, II, পৃ. ৫২০) থেকে মনে হয়, কারিগরের অভাব তখন এ-দেশে ছিল না। মুঘল যুগে শহরের দাস-বাজার, বা দাস-কারিগরের উল্লেখ খুবই বিরল; এবং দাসেরা তখন বস্তুতঃ নিযুক্ত হত পুরোপুরিই গৃহকর্মাদিতে। (তুলনীয় এম. আত্‌হার আলি : 'মুঘল নোবিলিটি আণ্ডার অওরঙজেব', বোম্বাই, ১৯৬৬, পৃ. ১৬৮)।

১০৬. তুলনীয় আমার গবেষণাপত্র : 'ডিস্ট্রিবিউশন অফ ল্যাণ্ডেড প্রপার্টি ইন প্রি-ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া', 'এন্‌কোয়ারি', *N.S.*, II, ৩, ১৯৬৫, পৃ. ৪৪-৫৩।

৩

মুঘল সাম্রাজ্যে জমিন্দারের অবস্থান

এস. নুরুল হাসান

মধ্যযুগীয় ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে জমিন্দার শ্রেণী একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মুঘল আমলে এই শ্রেণীটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর সামাজিক অবস্থানও জটিলতর হয়ে ওঠে। কৃষকদের কাছ থেকে কৃষিজ উৎপাদনের উদ্বৃত্ত নিয়ে নেওয়া হত, এবং তা ভাগাভাগি হত সম্রাট, তাঁর আমিরবর্গ ও জমিন্দারদের মধ্যে ; দেশের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রায় অর্থাৎ কৃষিজ উৎপাদনে, হস্তশিল্প ও ব্যবসায়,-জমিন্দারদের বিরাট প্রভাব ছিল। শাহী সরকার ও জমিন্দারদের মধ্যে উৎপাদনের বৃহত্তর অংশ আত্মসাৎ করার লড়াই অনবরত চলতে থাকলেও, অর্থনৈতিক শোষণ প্রক্রিয়াটিতে উভয়েই ছিল একে অপরের সহযোগী। রাজনীতিগতভাবে, মুঘল সরকার ও জমিন্দারদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ছিল, এবং তা সত্ত্বেও জমিন্দাররা শ্রেণী হিসাবে সাম্রাজ্যের মূলস্তম্ভ হয়ে উঠেছিল। মুঘল সম্রাটকে যত প্রশাসনিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হত তার অধিকাংশই ছিল জমিন্দারদের কার্যকলাপের ফল ; কিন্তু একই সঙ্গে, তাদের সমর্থনের উপর প্রশাসনকে খুব বেশি নির্ভর করতে হত। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, শাহী দরবারের সঙ্গে জমিন্দারদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলেই বিভিন্ন সম্প্রদায় ও অঞ্চলের স্বতন্ত্র নাগরিক ও গ্রামীণ ঐতিহ্যগুলির সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন সম্ভব হয়েছিল। তবে এ-কথা ঠিক যে, বিচ্ছিন্নতাবাদী. আঞ্চলিকতাবাদী ও সংকীর্ণতাবাদী ঝোঁকগুলি বরাবরই জমিন্দার শ্রেণীর জোরালো পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে এসেছে। আবার, ঐ শ্রেণীটির সহযোগিতা পেয়েছিল বলেই মুঘল সাম্রাজ্য ক্ষমতা, যশ ও ঐশ্বর্যে দীপ্যমান হয়ে উঠেছিল। কিন্তু, জমিন্দারি-ধরনের সামাজিক কাঠামোর মধ্যে জমিন্দার শ্রেণী ও কেন্দ্রশাসিত সাম্রাজ্যের অন্তর্বিরোধগুলির মীমাংসা সম্ভব ছিল না। এই অন্তর্বিরোধই মুঘল সাম্রাজ্যের ইস্পাততন্তুকে ধ্বংস করেছিল এবং পশ্চিমি শক্তি এ-দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই তার পতন ডেকে এনেছিল।

'জমিন্দার' শব্দটি চালু হয় মুঘল আমলেই। ক্ষমতাশালী, স্বাধীন ও স্বরাট সর্দার থেকে শুরু করে গ্রামান্তরে ক্ষুদ্র মধ্যস্বত্বভোগী পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের উত্তরাধিকার-স্বার্থ বোঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত হত। মুঘল আমলের আগে, ঐ সর্দারদের পরিচিতি ছিল রাজা, রায়, ঠাকুর ইত্যাদি নামে এবং ক্ষুদ্র মধ্যস্বত্ব-

ভোগীদের বলা হত চৌধুরী, খোট, মুকদ্দম ইত্যাদি। বিভিন্ন ধরনের ভূমি-স্বার্থের জন্য একই বর্গনাম ব্যবহার করার মুঘল রীতিটির উদ্দেশ্যে ছিল সর্দারদের মধ্যস্বত্বভোগীর স্তরে নামিয়ে আনা ; তাদের এই ক্ষতি অবশ্য অন্যভাবে পুষিয়ে দেওয়া হত।

কয়েক শতাব্দীব্যাপী এক সুদীর্ঘ বিবর্তন প্রক্রিয়ারই ফল ছিল ভূমিস্বার্থের এই বিভিন্ন ধরণগুলি। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্বেই কৃষি-সম্পর্কের পিরামিড-ধাঁচ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক পার্থক্য থাকলেও জমি-মালিকানার স্বরূপটা দেশের অধিকাংশে একইরকম ছিল। সুলতানি যুগে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রদবদল করা হয়েছিল, কিন্তু মূল বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ-গুলি কমবেশি একইরকম ছিল। মুঘল আমলে এই পরিবর্তন-প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়।

মুঘল আমলের জমিন্দারিকে তিনটি প্রধান বর্গে ভাগ করা যেতে পারে : (ক) স্বরাট সর্দার ; (খ) মধ্যস্বত্বভোগী জমিন্দার এবং (গ) প্রাথমিক জমিন্দার। এই বর্গগুলি আদৌ পারস্পরিক সম্বন্ধবর্জিত ছিল না। স্বরাট সর্দারের অধিকৃত এলাকায় অধীনস্থ আধা-স্বরাট সর্দাররাই শুধু নয়, মধ্যস্বত্বভোগী এবং প্রাথমিক জমিন্দাররাও থাকত। তেমনই, মধ্যস্বত্বভোগী জমিন্দাররা তাদের অধিকারে রাখত উপক্রমী জমিন্দারদের। একজন সর্দার তার অধিকৃত এলাকায় 'সার্বভৌম' বা 'রাষ্ট্রীয়' ক্ষমতা, এবং একই সঙ্গে, কিছু জমির প্রাথমিক স্বত্ব ও অন্যকিছু জমির মধ্যস্বত্ব ভোগ করত। মধ্যস্বত্বভোগী জমিন্দারদের অনেকেই উপক্রমী জমিন্দারের অধিকারও ভোগ করত। জমিন্দারদের অধিকৃত এলাকাগুলি 'খালিস' [khalisa] বা 'জাগির' জমির থেকে আলাদা ছিল না। 'জাগির' ও 'খালিস' [khalis] জমির মধ্যে তফাত ছিল শুধু আদায়কৃত রাজস্বের বণ্টনব্যবস্থায়। যে-জমির রাজস্ব সরাসরি শাহী কোষাগারে জমা পড়ত, তাকে বলা হত 'খালিস' [khalisa] ; অন্যদিকে কোনো রাজকর্মচারীকে বেতনের পরিবর্তে কোনো জমি ভোগ করতে দেওয়া হলে সেই জমিকে 'জাগির' বলা হত। এভাবে 'খালিস' [khalisa] ও 'জাগি'র উভয় প্রকার জমিতেই বিভিন্ন ধরনের জমিন্দারি বহাল ছিল। এগুলিকে নিয়ে সতর্ক চর্চা করে দেখা গেছে যে মুঘল সাম্রাজ্যে এমন একটি পরগনাও ছিল না যেখানে জমিন্দার ছিল না।[১]

সর্দার

সর্দাররা ছিল তাদের অধিকৃত এলাকার স্বরাট শাসনকর্তা। তারা কার্যত সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করত, এবং এ-ক্ষমতা তারা পেত উত্তরাধিকার সূত্রে। সুলতানি আমল থেকেই সুলতানরা সর্দারদের আনুগত্য আদায় করতে সচেষ্ট হয়েছিল, এবং তাদের উপর নিয়মিত খাজনা দিতে ও প্রয়োজনে সামরিক

সাহায্য দিতে বাধ্য করত। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে প্রতিরোধ হয়েছিল, এমন-কী বিদ্রোহও; এবং সর্দারদের উপর শাহী সরকারের নিয়ন্ত্রণ নির্ভর করত কতটা সামরিক চাপের মধ্যে তাদের রাখা যেত, তার ওপর। অনেক ক্ষেত্রেই, বিদ্রোহী সর্দারদের সবংশে উৎখাত করা হয়েছে, বা তাদের এলাকা ছেঁটে ছোট করে দেওয়া হয়েছে। অপরপক্ষে, শাহী সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সর্দাররা কখনো কখনো স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে, এবং/বা সুযোগমতো তাদের এলাকার পরিসীমা বাড়িয়ে নিয়েছে। অবশ্য কোনো ক্ষেত্রেই, সর্দারের পোষ্যদের, বা মধ্যস্বত্বভোগী অথবা উপক্রমী জমিন্দারদের অধিকার তেমন কিছু কমে-বাড়েনি। আকবরের সিংহাসনারোহণকালে এই স্বরাট সর্দাররাই কার্যত মুঘল সাম্রাজ্যের ব্যাপক অঞ্চলের শাসক ছিল। আর যারা আগে শূরদের আধিপত্য স্বীকার করেছিল, তারা ইতিমধ্যে স্বাধীন শাসক হয়ে গিয়েছিল।

আকবর ও তাঁর উত্তরসূরীরা পূর্বতন সুলতানদের কর্মনীতি অর্থাৎ সর্দারদের আনুগত্য আদায় এবং তাদের নিয়মিত খাজনা ও প্রয়োজনে সামরিক সহায়তা দিতে বাধ্য করার কর্মনীতি চালু রাখার পাশাপাশি সর্দারদের সম্পর্কে নতুন কিছু ব্যবস্থাও নিয়েছিলেন, যেমনঃ

(ক) সম্রাটদের মধ্যে আকবরই প্রথম বুঝেছিলেন সাম্রাজ্য ও সর্দারদের মধ্যে মজবুত যোগসূত্র স্থাপনের গুরুত্ব, এবং তাদের অনেককেই শাহী পদমর্যাদাক্রম ও প্রশাসনিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এমন-কী সবচেয়ে উঁচু 'মনসব'-বা গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসকপদ, এবং সৈনাপত্যও তাদের দেওয়া হচ্ছিল। এই কর্মনীতি তাঁর উত্তরসূরীরাও মেনে চলেছিলেন; এবং অওরঙজেব-এর শাসনকালের শেষার্ধে সর্দারবংশের হাজারী (বা তদধিক) মনসবদার ছিল আনুমানিক আশি জন। এই সংখ্যাটি ছিল তখনকার হাজারী (বা তদধিক) মনসবদারদের মোট সংখ্যার ১৫ শতাংশ।[২] কোনো সর্দারকে যখন উঁচু মনসব অথবা গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হত, সেইসঙ্গে ব্যয়নির্বাহের জন্য উপযুক্ত জাগির-ও দেওয়া হত; এবং এই জাগিরগুলির আয় তাদের পৈতৃক এলাকার রাজস্বের চেয়ে বহুগুণ বেশি ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ৫০০০ জাঠ [zat] ও ৫০০০ সওয়ার [sawar] সম্বলিত একটি জাগির থেকে ৮·৩ লাখ টাকার বার্ষিক[৩] আয় প্রত্যাশিত ছিল, যে-অঙ্কটি ছিল প্রধান কয়েকটি রাজপুত রাজ্যের মোট রাজস্বের বেশ কয়েকগুণ। শাহী দরবারে উঁচু মনসব পাওয়ার ফলে সর্দারদের অতঃপর এমনই আয় হত, যা ছিল তাদের স্বীয় এলাকার চেয়ে বহুগুণ বড়ো একটি অঞ্চলের রাজস্বের তুল্য। এই কর্মনীতি শাহী সরকার ও সর্দারদের মধ্যেকার মূল বিরোধকে অনেকটা অপনয়ন করতে পেরেছিল, এবং শাহী অধীনতা থেকে বেরিয়ে আসার ও শাহী কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে আপন রাজ্যসীমা বাড়ানোর চেষ্টা করার চেয়ে শাহী দরবারে পদোন্নতি করাটাই তাদের কাছে অধিকতর ফলপ্রসূ হয়ে উঠেছিল। সর্দারের পোষ্য ও জ্ঞাতিদের দেওয়া লোভনীয় চাকরি, এবং তাছাড়া সম্রাটের

হয়ে কোনো অভিযানে অংশগ্রহণ করলে লুণ্ঠিত সামগ্রীর হিস্যা। আর্থিক সুবিধা ছাড়াও শাহী দরবারের পদাধিকার ছিল সর্দারদের বাড়তি ক্ষমতার উৎস, এবং এই মওকায় বড় সেনাদল গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পেরে তারা নিজেদের সামাজিক অবস্থা দৃঢ়তর করে নিয়েছিল।

(খ) মুঘলরা একটি নতুন নীতির উপর জোর দিচ্ছিল, যা পরে সর্বোচ্চ ক্ষমতার (paramountcy) নীতি নামে সুবিদিত হয়ে উঠেছিল। এর ফলে, একজন সর্দারকে তার ক্ষমতা ও অধিকারের জন্য সহজাত অধিকারের চেয়ে সম্রাটের সদিচ্ছার উপরই নির্ভর করতে হত। কেবলমাত্র সেই সর্দারদেরই 'রাজা' বলা হত ; যারা সম্রাটের কাছ থেকে ঐ উপাধি পেয়েছিল। বংশগত উত্তরাধিকার এবং জ্যেষ্ঠের অগ্রাধিকার বিধিটিকে সাধারণভাবে মেনে চললেও, মৃত 'রাজা'র উত্তরাধিকারী হিসাবে কনিষ্ঠ পুত্র বা এমন-কী দূরসম্পর্কের কোনো আত্মীয়কে 'স্বীকৃতি' দেওয়ার অধিকারও অর্জন করেছিল।

আবার, বিকানীর-এর রায় রায়সিংহের কনিষ্ঠপুত্রের মনোনয়ন বাতিল করে জাহাঙ্গির বিশেষ অধিকারবলে জ্যেষ্ঠপুত্রকে মনোনীত করেছিলেন। অনুরূপভাবে, অম্বর-এর-রাজা মানসিংহের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের পুত্র মহাসিংহের দাবি নাকচ করে, কনিষ্ঠপুত্র ভাওসিংহকে "মির্জা-রাজা-র অত্যুচ্চ উপাধিসহ অম্বর রাজ্য দেওয়া হয়েছিল।" খড়্গপুরের সর্দার রাজা সংগ্রাম যখন সম্রাটের বিরাগভাজন হলেন, তাঁকে হত্যা করা হল এবং তাঁর জাগির বাজেয়াপ্ত করা হল ; অবশ্য কিছুদিন বাদে তা আবার তাঁর পুত্র রাজা রোজফ্‌জান-কে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। শাহ্‌জাহানের আমলে, মারওয়াড়-এর যশ্‌ওয়ন্ত সিংহের দাবিই গ্রাহ্য হল—এবং তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা বঞ্চিত হলেন—এই যুক্তিতে যে, যশ্‌ওয়ন্ত ছিলেন মৃত রাজার প্রিয়তমা পত্নীর পুত্র। বিকানির-এর ক্ষেত্রে জাহাঙ্গির যে-সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এটি ছিল তার বিপরীত। একটি রাজ্যের শাসক কে হবেন সেই সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার যখন সম্রাটের হল, তারপর থেকে সর্দারদের উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণই যে শুধু বাড়ল তাই নয়, সম্রাটের প্রতি সর্দাররা ব্যক্তিগত বাধ্যতার সম্পর্কে আবদ্ধ হল। প্রভাবশালী সর্দারবংশের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের সুবিদিত কর্মনীতি সর্দারদের মধ্যে সম্রাটের প্রতি আত্মীয়তাবোধ জোরদার করে তুলছিল। সর্দারকে সম্রাটের বা সুবেদারের দরবারে হাজির থাকতে হবে, এবং কর্মব্যপদেশে সে অন্যত্র থাকলে, তার কোনো নিকটাত্মীয়কে দরবারে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করতে হবে—মুঘল সম্রাটের এই অটল নির্দেশের ফলে সর্দারদের উপর শাহী নিয়ন্ত্রণ আরো মজবুত হয়েছিল।

(গ) যদিও পূর্বতন সুলতানরা অধীনস্থ সর্দারদের কাছ থেকে প্রয়োজন-মাফিক সামরিক সাহায্য আদায় করতেন, কিন্তু 'মনসবদার' নয় এমন সর্দারদের কাছ থেকেও সামরিক সাহায্য আদায়ের সুব্যবস্থা কেবল মুঘলরাই গড়ে তুলতে পেরেছিল। কার্যত সবকটি বড় অভিযানেই মুঘল সম্রাটের

প্রধান সহায় ছিল অধীনস্থ সর্দারদের বাহিনীগুলি। উদাহরণস্বরূপ স্মরণ করা যায়, রাজা মানসিংহের নেতৃত্বে উড়িষ্যা অভিযানের সময় দক্ষিণ বিহারের প্রায় সমস্ত প্রভাবশালী সর্দারই তাঁর অধীনে যুদ্ধ করেছিলেন। গুজরাতে অধীনস্থ সর্দারকে সুবেদারের প্রয়োজনমাফিক নির্দিষ্ট-সংখ্যক সওয়ার যোগাতে হত। মুঘল সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তিবৃদ্ধিতে এই সর্দারদের বাহিনীগুলির উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। সামরিক বাধ্যতার এই বিষয়টিকে যে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হত তা বোঝা যায় জাহাঙ্গিরের একটি বিবৃতি থেকে, যেখানে তিনি বাংলার গুরুত্বের উল্লেখ করেছেন। এবং সে গুরুত্ব সেখান থেকে বিপুল রাজস্ব আসত বলে নয়, সেখানকার সর্দাররা ৫০,০০০ সেনা যোগাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল বলে।

(ঘ) মুঘল সম্রাটরা প্রভাবশালী সর্দারদের পোষ্যদের সঙ্গেও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধস্থাপনের কর্মনীতি অবলম্বন করেছিলেন। এর ফলে ঐ সর্দারদের প্রভাব কমছিল, এবং অন্যদিকে, এক নতুন মিত্রপক্ষ তৈরি হচ্ছিল। এর একটি সুবিদিত উদাহরণ হল গড় কটঙ্গ্, যেখানে গড়ের সর্দারের পোষ্যদের সঙ্গে সম্রাটের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল। ক্ষমতাসীন সর্দারের পোষ্যদের কখনো কখনো শাহী 'মনসব'ও মঞ্জুর করা হত, যেমন হয়েছিল যশ্ওয়ন্ত সিংহের মৃত্যুর পর, মারওয়াড়ে।

(ঙ) স্বরাট সর্দারদের পৈতৃক এলাকাকে 'ওয়তন [watan] জাগির' হিসাবে বিবেচনা করার মুঘল প্রয়াসটি ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এর অর্থ হল, তত্ত্বগতভাবে তাদের পদমর্যাদা ছিল জাগিরদারের সমান; এবং সেই সূত্রে তারা শাহী রাজস্ববিধির অধীন ছিল। কিন্তু নিজ নিজ এলাকায় ঐ জাগিরদারি বংশপরম্পরায় ভোগ করে যেতে পারলেও, তারা ঐ অধিকার হস্তান্তর করতে পারত না। তত্ত্বটি মূলত মনসবদারদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হলেও শাহী সরকারের উদ্দেশ্য ছিল সর্দারদের প্রদেয় খাজনার ধরনটাকে আসল উৎপাদনের ভিত্তিতে নির্ধারিত ভূমি-রাজস্বে পরিণত করা। উদ্দেশ্যটি কতটা সফল হয়েছিল তা ঠিকঠিক জানা যায় না কারণ, বহুসংখ্যক সর্দারকেই দেখা যায় তদর্থক ভিত্তিতে খাজনা দিয়ে যেতে, যাকে তখন 'পেশ্কশ্' [Peshkash] বলা হত। অবশ্য, এই পেশ্কশ্ নির্ধারণের ক্ষেত্রেও, মুঘল প্রশাসকরা চেষ্টা করতেন কর্ষিত জমির ক্ষেত্রফল, ফসল উৎপাদনের প্যাটার্ন বা ধাঁচ এবং অধীনস্থ জমিন্দার ও পোষ্যদের থেকে সর্দার কর্তৃক রাজস্ব আদায় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে। এই ধরনের প্রচেষ্টার উল্লেখযোগ্য নজির পাওয়া যায় 'আইন-ই আকবরী'তে সর্দারদের অবস্থা সম্পর্কে উল্লিখিত তথ্যাদিতে, এবং গুজরাতের রাজস্ব-ব্যবস্থা সম্পর্কে টোডরমলের বিবরণীতে।[৪] এই কর্মনীতিটি যদিও কেবল আংশিকভাবে সফল হয়েছিল, এর মধ্য দিয়ে সর্দারদের উপর শাহী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কোথাও

আইনগত অধিকারবলে, কোথাও বা অন্য কোনো ব্যবহারিক উপায়ে। এর ফলে, সর্দারদের অর্থ-সংগ্রহের উপায়গুলিও চাপের মুখে পড়ে এবং তাদের অনেকেই মনসবদারের পদগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। প্রশাসনিক দিক থেকে এর উদ্দেশ্য ছিল সর্দারদের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থাকে মুঘল রীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ও মুঘল রীতির অনুসারী করে তোলা।

(চ) শাহী নিয়মকানুন মেনে চলতে স্বরাট সর্দারদের বাধ্য করার ব্যাপারে—বিশেষত শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও গতিবিধির স্বাধীনতার ব্যাপারে দরবারি আইন মেনে চলতে সর্দারদের বাধ্য করার ব্যাপারে মুঘল সম্রাটরা তাঁদের পূর্বসূরীদের চেয়ে বেশি সফল হয়েছিলেন। সম্রাটরা সর্দার-দের বাধ্য করতেন তাদের এলাকায় অনুপ্রবিষ্ট বিদ্রোহী, দুষ্কৃতি ও ফেরারিদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে, এবং শুধু তা-ই নয়, সর্দারের বিরুদ্ধে যারা শাহী দরবারে সুবিচারের আবেদন করত তাদের সেই সুবিচার পাইয়ে দেওয়ার অধিকারও সম্রাটের ছিল। উদাহরণস্বরূপ, বিকানির-এর রাজা সুরয সিংহ যখন তাঁর ভ্রাতা দলপত-এর পোষ্যবর্গকে আটক করে রেখেছিলেন, তখন জাহাঙ্গির তাদের মুক্তির আদেশ দেন।[৫] বেশ কয়েকটি ফরমান পাওয়া গেছে যেগুলিতে সর্দারদের নির্দেশ দেওয়া আছে, তাদের এলাকা দিয়ে যাতায়াতকারী বণিকদের ঝামেলায় না-ফেলার, এবং তাদের কাছ থেকে শুল্ক আদায় না-করার জন্য। অনেক সর্দার এই শাহী নির্দেশ অমান্য করতেন, এমন নজির যদিও আছে, তবু সাধারণভাবে, এই ধরনের নির্দেশ-গুলিকে যে সমীহ করা হত তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

দেশে অসংখ্য স্বতন্ত্র রাজ্যের অস্তিত্ব ও সমগ্র দেশের রাজনৈতিক বিভাজনের ফলে দেশের প্রগতি নিশ্চিতভাবে ব্যাহত হচ্ছিল। এরই স্বাভাবিক পরিণতি-স্বরূপ পরস্পরধ্বংসী যুদ্ধবিগ্রহ দেশের বৈষয়িক প্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের তুলনায় স্বরাট রাজাদের অধীনস্থ কৃষকরা ছিল অপেক্ষাকৃত সচ্ছল—বের্নিয়ে-র এই বিবৃতি মেনে নেওয়া মুশ্‌কিল কারণ, সামন্ততান্ত্রিক অধিকারগুলির প্রতি এই ফরাসি চিকিৎসকের পক্ষপাত তাঁর যুক্তিকে আচ্ছন্ন করেছিল, এবং উপরন্তু মূল নথি থেকে জানা যায় যে, ভূমি-রাজস্ব ও অন্যান্য করের হার স্বরাট সর্দারদের এলাকায় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের চেয়ে কম ছিল না।[৬] তাছাড়া, সর্দারদের খাজনা (যা শেষপর্যন্ত দিতে হত কৃষকদেরই) দিতে বাধ্য করতে পারে এমন একটি কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্যশক্তি না থাকলে অন্য আরেক পরাক্রান্ত সর্দার হয়ত তার অধিরাজত্ব প্রতিষ্ঠা করত, এবং যে-খাজনা সে ধার্য করত তা ধরনে বা পরিমাণে খুব একটা অন্যরকম হত না। একটি কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্যশক্তি অধিকতর শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে, ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ করে, ভোক্তাশ্রেণীর ক্রয়ক্ষমতা বর্ধিত ও বহুমুখী করে, এবং তার দরুন শিল্প-বিকাশের জোয়ার

সূচিত করেছিল এবং এর ফলে মুদ্রা অর্থনীতির শ্রীবৃদ্ধির অনুকূল অবস্থা তৈরি হয়েছিল। মুদ্রা অর্থনীতির আবির্ভাব কৃষিজ উৎপাদনকে ভালোরকমই প্রভাবিত করেছিল, এবং এটি আরো বেশি করে হয়েছিল রাজস্ব ক্রমশ নগদ অর্থে আদায় হতে থাকার জন্য। এর ফলে পণ্যশস্যের চাষ ও কর্ষিত জমির ক্ষেত্রফল—দুই-ই বেড়েছিল, অবশ্য এর জন্য বর্ধিত রাজস্বের দাবিও অংশতঃ দায়ী।[৭] বহুসংখ্যক সর্দারকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে মুঘল সাম্রাজ্যশক্তি যতটা সফল হয়েছিল, এবং দেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ঐক্যসাধনে যতটা সফল হয়েছিল, তাতে বলা যায়, ভারতীয় সমাজের বিকাশপ্রক্রিয়ায় মুঘল সাম্রাজ্য একটি প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছিল।

নিঃসন্দেহে তাদের যেকোনো পূর্বসূরীর চেয়ে সফলভাবে মুঘলরা বহু-সংখ্যক সর্দারকে তাদের সাম্রাজ্যের অধীনে নিয়ে আসতে পেরেছিল। নিবিড় সামরিক তত্ত্বাবধানের মধ্য দিয়ে তারা কার্যত দেশের সমস্ত সর্দারকেই বাধ্য করেছিল সম্রাটের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব মেনে নিতে। তাদের উপরোক্ত কর্মনীতির সুবাদে তারা পেরেছিল সর্দারদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠাংশের আনুগত্য ও সাগ্রহ সহযোগিতা আদায় করতে, এবং তাদের প্রশাসনিক বিধিনিষেধ মেনে চলতে সর্দারদের বাধ্য করতে। এ-দিক থেকে বলা যায়, তারা সর্দারদের ক্ষমতার মুখে লাগাম পরাতে পেরেছিল।

অবশ্য, একহাতে কঠোর শাসন এবং অন্যহাতে মৈত্রী স্থাপনের কর্মনীতিটিও শাহী সরকার ও সর্দারদের মধ্যেকার অন্তর্বিরোধকে অনেকখানি অপনোদন করতে পেরেছিল। সর্দারদের সবাইকে উঁচু মনসব বা লোভনীয় জাগির দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাছাড়া, জমিন্দার নন এমন আমিরদের অনেকেই সাম্রাজ্যশক্তির সেবায় নিযুক্ত সর্দারদের নিরাপত্তায় ঈর্ষান্বিত ছিলেন, এবং তাঁরা সম্রাটের উপর চাপসৃষ্টি করতেন যাতে ঐ শ্রেণীটিকে উদার-হস্তে মনসব অথবা জাগির বিতরণ না করা হয়। জাগিরে যত টান পড়তে থাকল, তত সম্রাটের পক্ষে সর্দারদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সামলানো অসম্ভব হয়ে উঠল। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে শাহী দরবারে উচ্চ পদাসীন সর্দারদের কেউ কেউ সম্রাটপ্রদত্ত জাগিরকে তাদের পৈতৃক রাজ্যসীমার অন্তর্ভুক্ত করে ফেলার চেষ্টায় রত হল—যেমন, অম্বর-এর বীরসিং-দেও বুন্দেলা অথবা জয়সিং সওয়াই। বিদ্রোহ তাই অনিবার্য ছিল। সাম্রাজ্যের সামান্যতম সংকটেরও সুযোগ নিতে সর্দাররা ভুল করত না। উদাহরণস্বরূপ, পিতৃদ্রোহী শাহ্‌জাহানকে উড়িষ্যা ও বাংলার সর্দাররা সমর্থন করেছিল, কিন্তু সম্রাটের বাহিনীর হাতে তিনি পরাজিত হওয়ামাত্র ঐ সর্দাররা তাঁকে বর্জন করে। আরেকদিকে, নানান সমস্যার জন্য শাহী সরকারের পক্ষে জমিন্দারদের অবিচ্ছিন্ন সামরিক চাপের মধ্যে রাখা যখনই সম্ভব হয়ে উঠত না, তখনই বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ দেখা দিত। এই ধরনের পরিস্থিতিতেই মহারাষ্ট্র, বুন্দেলখণ্ড,

মেওয়ার এবং রাজপুতানার সর্দাররা মুঘল সম্রাট আওরঙজেব-এর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল, আর এই যুদ্ধে নিম্নস্তরের জমিন্দার এবং কৃষকদের (বিশেষত যেখানে তারা ছিল সর্দারদের জাত বা বংশের অন্তর্গত) সমর্থনও তারা পেয়েছিল। শাহী সরকারের বিরুদ্ধে সর্দারদের ব্যাপক অসন্তোষ মুঘল সাম্রাজ্যের সামরিক ক্ষমতাকে দুর্বল করে দিয়েছিল। সর্দারদের ক্ষমতাকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সাম্রাজ্যশক্তি অতিরিক্ত নির্ভরশীল ছিল ঐ সর্দার-দেরই উপর।

সর্দারদের বারংবার বিদ্রোহের ফলে দীর্ঘস্থায়ী সেনাভিযান, এবং তাদের আপন রাজ্যসীমাবিস্তার থেকে নিবৃত্ত রাখায় শাহী সরকারের অক্ষমতার ফলে অর্থভাণ্ডার নিঃশেষিত হয়ে আসছিল, কৃষিজ উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল, এবং প্রশাসনিক ঐক্য ভেঙে পড়ছিল। পরিণামস্বরূপ, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ একটি ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সুবিধাগুলি ক্রমশ লোপ পেয়ে যাচ্ছিল।

মধ্যস্বত্বভোগী জমিন্দার

এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল সেই সমস্ত জমিন্দার যারা উপক্রমী জমিন্দারদের থেকে রাজস্ব আদায় করত এবং তা শাহী কোষাগারে, বা জাগিরদার কিম্বা সর্দারের কাছে জমা দিত, অথবা কোনো-কোনো ক্ষেত্রে, নিজেদের কাছেই রাখত। এই জমিন্দাররা ছিল ভূমি-রাজস্ব প্রশাসনের মেরুদণ্ডস্বরূপ, এবং শুধু তা-ই নয়, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ভারও ছিল এদের হাতে। এই ধরনের পরিষেবার বদলে তারা বিভিন্ন রকমের দস্তুরি পাবার অধিকারী ছিল—যেমন, দালালি, রেয়াত, করমুক্ত জমি (ননকার [nankar] বা বন্থ্ [banth]), উপকর ইত্যাদি। রাজস্বে তাদের বখরা ছিল ২·৫ থেকে ১০ শতাংশ। অধিকাংশ জমিন্দারই ছিল উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য স্বল্পমেয়াদি চুক্তিতেও জমিন্দারি পাওয়া যেত।[৮] মধ্যস্বত্বভোগী বর্গটির অন্তর্ভুক্ত ছিল চৌধুরি, দেশমুখ, দেশাই, দেশপাণ্ডে, কয়েক ধরনের মুকদ্দম, কানুনগো ও ইজারাদারেরা, আর সেই শ্রেণীর জমিন্দার যাদের সঙ্গে রাষ্ট্রের চুক্তি ছিল একেকটি নির্দিষ্ট এলাকার রাজস্ব আদায়ের, এবং যারা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে 'তালুকদার' বর্গনামে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। কার্যত দেশের সবকটি অঞ্চলই ছিল কোনো-না-কোনো ধরনের মধ্যস্বত্বভোগীর অধিকারে। পরগনায় বিভিন্ন জাতের জমিন্দার সম্পর্কে 'আইন-ই-আকবরী'তে যে-উল্লেখ আছে, সেখানে সর্দারের অধীনস্থ নয় এমন জমিন্দার বলতে সম্ভবত মধ্যস্বত্বভোগীদেরই বোঝানো হয়েছে। অধিকাংশ পরগনাতেই জমিন্দাররা ছিল জাতভুক্ত, এবং একই জাতভুক্ত লোকেরাই অনেক ক্ষেত্রে সংলগ্ন

পরগনাগুলির জমিন্দার হত—এই রেওয়াজ থেকে তাই মনে হয়, কয়েকটি বিশিষ্ট পরিবার বা বংশ বিশাল ভূভাগের জমিন্দারি অধিকার কুক্ষিগত করে রেখেছিল।

মধ্যস্বত্বভোগী জমিন্দারের অধিকার বংশপরম্পরায় বর্তালেও উত্তরাধিকার নির্ণয়ে এবং ভ্রাতা বা আত্মীয়দের মধ্যে অধিকারক্ষেত্রের ভাগবণ্টনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করার অধিকার ছিল। মুঘল দরবারের অসন্তোষভাজন মধ্যস্বত্বভোগীদের পদচ্যুত বা বদলি করা হত। আকবরের একটি আদেশে উল্লেখ রয়েছে যে, পবিত্র স্নানোপলক্ষ্যে ত্রিবেণীযাত্রীদের হয়রানি করার জন্য এলাহাবাদের এক 'চৌধুরি'-কে পদচ্যুত করা হয়েছিল।[৯] মুরাদ বখ্শ-এর একটি নিশান-এ উল্লেখ আছে তেলেঙ্গানা সুবা-র একটি পরগনার দেশমুখী কোনো-এক রাম রেড্ডিকে দেওয়ার এবং তারই মৃত জ্যেষ্ঠভ্রাতার দত্তক পুত্রের অর্ধেক দেশমুখী পাওয়ার আবেদন খারিজ করার।[১০] অওরঙ্গজেব এই মর্মে এক আদেশ জারি করেছিলেন যে, একটি পরগনায় দুজনের বেশি চৌধুরি থাকবে না; যদি থাকে, তবে তাদের পদচ্যুত করতে হবে।[১১] মুঘল সম্রাটরা কোনো-কোনো ক্ষেত্রে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, বা ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ ও সংগ্রহে নিযুক্ত ব্যক্তিদেরও জমিন্দারি দিয়েছিলেন।[১২] আকবর-এর ফরমানবলে গোপালদাস 'সরকার' তিরহুত-এ চৌধুরি এবং কানুনগো-র অধিকার পেয়েছিলেন, আর এটিই পরবর্তীকালে দ্বারভাঙা রাজের উত্থানের ভিত গড়েছিল।[১৩] জমিন্দার নন এমন উঁচু মনসবদার ও আমিরদের বংশগতভাবে রাজ্যাধিকার লাভ করার মনোবাঞ্ছা পূরণার্থে মুঘল সম্রাটরা 'ওয়তন' [watan] এবং 'আল-তংঘ' [al-tamgha] জাগির প্রদানের রীতি চালু করেছিলেন। এ-সমস্ত ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা স্থায়ী জাগিরদারি অধিকারপ্রাপ্ত হত। সাধারণত এ-ধরণের জাগিরগুলি আকারে ছোট হত এবং এর অধীনে থাকত একটি বা অল্প কয়েকটি গ্রাম, যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বড়ো জাগির-ও দেওয়া হত। এই জাগিরের অধিকারীরা মালিকানা পাওয়ার চেষ্টা করত এবং যথাসময়ে তাদের ভূমি-রাজস্ব জমা দিতে বলা হত। উদাহরণস্বরূপ, অনিরায় সিংহদলন-কে দেওয়া 'ওয়তন' [watan] জাগিরগুলিই একসময় বুলন্দ্শহর জেলার অনুপশহর-এ বিশাল ও প্রতিপত্তিশালী জমিন্দারি গড়ে তুলেছিল। একই ধরনের ব্যাপার ঘটেছিল জাহাঙ্গির-এর আমলে পিহাম-এ, মিরন সদ্‌রজাহান-কে দেওয়া 'ওয়তন' জাগিরের ক্ষেত্রে।

মধ্যস্বত্বভোগীদের অধিকাংশকেই রাষ্ট্রের নিরীক্ষার জন্য রাজস্ব নির্ধারণের তফ্শিল তৈরি করতে হত, ভূমি-রাজস্ব আদায়ে সাহায্য করতে হত, কৃষির সম্প্রসারণে উৎসাহ দিতে হত, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় শাহী কার্যাধিকারীদের সাহায্য করতে হত, এবং নির্দিষ্টসংখ্যক সৈন্য যোগান দিতে হত। যদিও, কার্যত,

তাদের অবিরাম চেষ্টা ছিল কী করে নিজের অধিকারসীমা বাড়ানো যায়, এবং রাজস্বের—পুরোটা না হলেও—অধিকাংশটাই আত্মসাৎ করা যায়। অদ্যাপি প্রাপ্তব্য নথিগুলিতে 'জমিন্দার-ই-জোর-তলব' [zamindaran-i-zor-talab], অর্থাৎ যারা কেবলমাত্র বলপ্রযুক্ত হলে তবেই রাজস্ব দিত, তাদের কথা অনেকবার বলা হয়েছে। যে-সমস্ত মধ্যস্বত্বভোগী রাজস্ব আদায়ে নিযুক্ত ছিল ইজারাদার বা তালুকদার হিসাবে, তারা রাজস্ব নির্ধারণের বিশদ বিবরণ দিতে চাইত না, শুধু কড়ারমাফিক মোট পরিমাণটি জমা দিত। বারংবার জাগির হস্তান্তরের মুঘল রীতিটি রাজস্ব ইজারার প্রবৃত্তিতে উৎসাহিত করেছিল। একদিকে, এই মধ্যস্বত্বভোগীরা রাষ্ট্রের ক্ষতিসাধন করে আপন অধিকার দৃঢ়তর করতে সচেষ্ট ছিল, যেমন, প্রায়শই তারা আকর্ষিত জমি বিলিবন্দেজ বা বিক্রি করত, যে-অধিকার ছিল একমাত্র রাষ্ট্রেরই। আর অন্যদিকে, তারা গ্রামীণ জনগণের উপর শোষণ তীব্রতর করেছিল, এবং তাদের অধিকারক্ষেত্রের প্রাথমিক জমিন্দারদের মর্যাদাহানি করতে সদাচেষ্টিত ছিল। শাহী কোষাগারে রাজস্ব জমা দেওয়ার দায় যেহেতু তাদেরই ছিল—প্রাথমিক জমিন্দাররা দিক বা না-দিক —তাই মাঝে মাঝেই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হত যে, মধ্যস্বত্বভোগীরা সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করত। এ-সমস্ত ক্ষেত্রে আদায়কৃত রাজস্বের একটি ন্যায্য অংশ (মালিকানা) প্রাথমিক জমিন্দারদের প্রাপ্য হলেও, মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের পক্ষে প্রাথমিক জমিন্দারের অধিকারে ভাগ বসানো, বা স্বয়ং মালিকানা ভোগ করার প্রলোভন সংবরণ করা সহজ ছিল না।[১৪] একই সঙ্গে, বংশগত রাজ্যাধিকার-লাভের আকাঙ্খাও ছিল তাদের প্রবল, এবং সুযোগ পেলেই চেষ্টা করত সর্দার হয়ে বসতে। মুঘল সাম্রাজ্য যত দুর্বল হচ্ছিল এবং জাগিরদারি ব্যবস্থার সংকট যত তীব্রতর হয়ে উঠছিল, এই মধ্যস্বত্বভোগীরা ততই নিজেদের ক্ষমতা বাড়িয়ে নিচ্ছিল আর মাঝে মাঝেই বিদ্রোহে লিপ্ত হচ্ছিল, হয় অন্যান্য স্ববংশীয় জমিন্দারের সঙ্গে বা কোনো-কোনো সর্দারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ; যারা আগেই শাহী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। জমিন্দার ও রাষ্ট্রের মধ্যে এই বিরোধের ফলস্বরূপ, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অস্থিরতা ছাড়াও কৃষিজ উৎপাদন এবং কৃষকশ্রেণীর জীবনযাত্রা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল।

শাহী কর্তৃপক্ষ এই অবাধ্য জমিন্দারদের বশে আনার, এবং তাদের শাহী ভূমি-রাজস্ববিধি মেনে চলতে বাধ্য করার আপ্রাণ চেষ্টা করে গেলেও, এই শ্রেণীটিকে কখনোই পুরোপুরি দমন করা যায়নি। শক্ত প্রশাসক যেখানে ছিলেন, এই মধ্যস্বত্বভোগীদের দেখা যেত শাহী বিধিনিষেধ মান্য করে কর্তব্য-পালন করতে এবং নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে। কিন্তু প্রশাসক অশক্ত হলে, পরিস্থিতি প্রায়শই তাঁর আয়ত্তের বাইরে চলে যেত। এই জমিন্দারদের ব্যাপক বিদ্রোহের ফলে শাহী কার্যাধিকারীরা তাঁদের আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন এবং পরিণামে, তাঁদের সামরিক ক্ষমতা কমছিল। তাঁরা

তখন উপদ্রুত এলাকা থেকে বদলির, এবং জাগিরের পরিবর্তে নগদ বেতনের দাবি তুললেন।[১৫]

প্রাথমিক জমিন্দার

প্রাথমিক জমিন্দাররা ছিল—সমস্ত ব্যবহারিক অর্থে—কৃষি ও বাস্তু জমির মালিকানাভোগী। এই বর্গের অন্তর্গত ছিল মালিক-কৃষক যারা নিজেরাই চাষ করত বা ভাড়াটে শ্রমিক দিয়ে করাত, আর ছিল একটি বা কয়েকটি গ্রামের অ-কৃষক মালিকরাও। দেশের সমস্ত কৃষিজমিগুলিই ছিল কোনো-না-কোনো ধরনের প্রাথমিক জমিন্দারের হাতে। এদের অধিকার ছিল বংশগত এবং হস্তান্তর-যোগ্য। এই ধরনের জমিন্দারি বিক্রির অনেক পুরনো দলিল, বলতে গেলে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত পুরনো দলিল, এখনো বর্তমান।[১৬] এই জমিন্দারদের অধিকার সুরক্ষিত করাটাকে মুঘল রাষ্ট্র তার কর্তব্য বলে মনে করত, এবং হস্তান্তর-দলিলগুলি কাজির দরবারে নিবন্ধভুক্ত করানোয় উৎসাহ দিত যাতে সঠিক দাবির নথি রাখা সম্ভব হয়।

এই অধিকার যারা বংশ পরম্পরায় ভোগ করত, বা যারা এ-অধিকার ক্রয় করেছিল, তারা ছাড়া আরো বহু লোককে মুঘলরা এই অধিকার প্রদান করেছিল। কৃষিজমির পরিমাণ বাড়ানোর যে-কর্মনীতি মুঘলরা অনুসরণ করেছিল, সেই ধারাতেই সম্রাটরা সেইসব লোককে উদারহস্তে জমি বিলি করছিলেন যারা জঙ্গল ও পতিত জমিগুলিকে কৃষির আওতায় নিয়ে আসবে। আর এও একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা যে বেশিরভাগ 'মদদ্-ই মাশ' [madad-i ma'ash] অনুদানই (পরহিতার্থে মঞ্জুর করমুক্ত অনুদান) দেওয়া হত অনাবাদী জমিতে। এই 'মদদ্-ই মাশ' অনুদানগুলি প্রত্যেক সম্রাটের সিংহাসনারোহণের সময় সন্নিযুক্ত করিয়ে নিতে হত, কিন্তু বংশগত উত্তরাধিকারে সাধারণত হস্তক্ষেপ করা হত না। পরে, এই 'মদদ্-ই মাশ' অনুদানগুলিও জমিন্দারির বর্গভুক্ত হয়ে গিয়েছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর 'মদদ্-ই মাশ' [madad-i ma'ash] জমিগুলির বিক্রি-দলিল দেখে তা-ই মনে হয়।

মালিক-কৃষক ছাড়া অন্য জমিন্দাররা তাদের জমি সাধারণত প্রজাদের বংশানুক্রমিক ইজারায় চাষ করতে দিত। নিয়মিত ভূমি-রাজস্ব প্রদানের শর্তে এই চাষীদের 'পাট্টা' মঞ্জুর করা হত। যা ছিল তাদের প্রজাস্বত্বের প্রমাণপত্র। রাজস্ব সময়মতো দিতে না পারলেও প্রজাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা হত না, তবে অন্যভাবে বকেয়া উসুল করা হত। জমির উপর চাপ খুব বেশি ছিল না, এবং জমিতে প্রজাদের এই দখলিস্বত্বকে সাধারণত মর্যাদা দেওয়া হত। আবার একই সঙ্গে, প্রয়োজনের তুলনায় চাষের লোক কম থাকায়, চাষীদের জমি ছেড়ে যেতে না-দেবার এবং ইজারা-নেওয়া কৃষিজমির সবটুকুতে চাষ করতে

তাদের বাধ্য করবার অধিকার ভোগ করত জমিন্দাররা।[১৭] এমন নজির আছে যে, প্রাথমিক জমিন্দাররা সময়মতো ভূমি-রাজস্ব জমা না দিলে, সরাসরি চাষীদের কাছ থেকে তা আদায় করা হত—দশ শতাংশ জমিন্দারের প্রাপ্য (মালিকানা)[১৮] হিসাবে বাদ দিয়ে। এবং এ-থেকে মনে হয়, শতকরা ঐ হারেই জমিন্দাররা বখরা পেত। ভূমি-রাজস্ব ছাড়াও অন্যান্য অনেক উপকর আদায়ের দায়িত্ব ছিল জমিন্দারদের উপর, যদিও এই আয়ের একটি বড়ো অংশই জমা দিয়ে দিতে হত ভূমি-রাজস্বের সঙ্গে।

জমিন্দারদের 'মালগুজার' বা ভূমি-রাজস্ব নির্ধারক বলে গণ্য করা হত। তাদের উপর ভার ছিল চাষীদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করার, এবং রাষ্ট্রের প্রাপ্যাংশ উধ্ব'তন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়ার। এ ছাড়া তাদের কর্তব্য ছিল শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশাসনকে সাহায্য করা, এবং উধ্ব'তনের আদেশ-মাফিক সৈন্য যোগান দেওয়া।

একদিকে উধ্ব'তন জমিন্দার শ্রেণী ও রাষ্ট্র, আর অন্যদিকে কৃষকশ্রেণীর চাপে পড়ে এই প্রাথমিক জমিন্দাররা তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটানোর জন্য সচেষ্ট থাকত এবং তাঁরই ফলে—এই দুই পক্ষের সঙ্গেই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে। উধ্ব'তন কর্তৃপক্ষের চাপ সহ্য করতে না পেরে তারা সেই বোঝা চাপিয়ে দিত চাষীদের ঘাড়ে, এবং এইভাবে, অর্থনৈতিক শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধিতে তারা প্রকারান্তরে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। কিন্তু অন্য অনেক ক্ষেত্রে, এই জমিন্দাররাই চাষীদের নেতৃত্ব দিত রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান চাহিদার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে, এবং চাষীদের সমর্থন পাবার জন্য—দরকার হলে—জাতপাত বা বংশকৌলীন্যের জিগিরও তুলত। বিদ্রোহ যেখানে সম্ভবপর হত না, এই জমিন্দারদের অনেকেই সে-সব ক্ষেত্রে রাজস্ব জমা দিতে অস্বীকার করত, বলপ্রযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত। আগেই বলা হয়েছে যে, মধ্যস্বত্বভোগীরা প্রায়শই চেষ্টা করত প্রাথমিক জমিন্দারদের অধিকার খর্ব করতে, এবং যখন তাদের এ-চেষ্টা সফল হত, তখন এক নতুন বর্গে'র উপ-মালিকানার উদ্ভব হত। কখনো কখনো মধ্যস্বত্বভোগীরা গ্রামাঞ্চলে নিজেদের অবস্থান মজবুত করার উদ্দেশ্যে একেকটি উপ-মালিকানা সৃষ্টি করত, যেমন—'বর্ত্য' [birtya]।

উপসংহার

এইভাবে, সব মিলিয়ে, বিভিন্ন ধরনের জমিস্বত্বের উদ্ভবই শুধু হয়নি, কৃষি-সম্পর্কে এক রকম পিরামিড-ধাঁচও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল, যাতে বিভিন্ন ধরনের জমিস্বত্বের পারস্পরিক উপরিপাত ঘটেছিল। শাহী রাজস্ব এবং বিভিন্ন বর্গে'র জমিন্দারদের চাহিদা মেটানোর সমস্ত বোঝাটা পড়েছিল কৃষকদের

উপর এবং এর ফলে কৃষি-অর্থনীতি এতই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি সম্ভব ছিল না। শাহী সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল যাতে উৎপন্ন দ্রব্যের ৫০ শতাংশের বেশি রাজকর কৃষককে দিতে না হয়; কিন্তু শাহী কর্তৃত্বের অধোনমন ও জাগিরগুলির উপর ক্রমবর্ধমান চাপের ফলে—কৃষি-অর্থনীতি সংকটের মুখে পড়ে অষ্টাদশ শতাব্দী নাগাদ এই সংকট তীব্র হয়ে ওঠে।

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে, জমিন্দার শ্রেণী সামগ্রিকভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের অনুগত সহযোগী ও সহকারী ছিল। তা সত্ত্বেও জমিন্দার ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ, এবং জমিন্দারদের বিভিন্ন বর্গের মধ্যে অন্তর্বিরোধ দূর করা যায়নি। এই বিরোধের ফলে বারংবার সংঘর্ষ হয়েছে, শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়েছে, এবং রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ও সামরিক ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়েছে। মুঘল সরকার অনেকবারই এই বিরোধ মীমাংসা করতে চেয়েছেন, কোনো-কোনো পদক্ষেপ বেশ ভালো ফল দিয়েছে, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই খিঁচগুলি প্রকট হয়ে উঠেছিল, এবং অওরঙ্গজেব-এর মৃত্যুর পরে কেন্দ্রীয় সরকার এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, পরস্পরবিরোধী স্বার্থগুলির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। বস্তুতপক্ষে, রাজস্ব আদায় ও প্রশাসনের জন্য মুঘল সাম্রাজ্যশক্তি জমিন্দারদের উপর এত বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ছিল যে, উল্লিখিত স্বার্থগুলির বিরোধ মীমাংসা করার কোনো প্রচেষ্টাই সফল হচ্ছিল না। জমিন্দারদের উপর নির্ভশীল নয় এমন একটি শ্রেণীর পক্ষেই হয়ত সম্ভব ছিল কৃষি-সম্পর্কের ধাঁচবদল করা। তেমন একটি শ্রেণীর আবির্ভাব অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত হয়নি।

টীকা

এই লেখাটি আলোচনামূলক, এবং মুঘল আমলে জমিন্দারি-ব্যবস্থার কার্যধারা সম্পর্কে বিশদ অধ্যয়নের আশু গুরুত্বের প্রতি ইতিহাসবিদ্‌দের মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত। লেখকের সিদ্ধান্ত পরীক্ষামূলক, এবং প্রাপ্তিসাধ্য প্রমাণাদির কেবলমাত্র অল্প কয়েকটির উপর ভিত্তি করেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

১. তুলনীয় ইরফান হবিব; 'দ্য জমিন্দারস্ ইন দি আইন,' প্রসিডিংস্ অফ ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস, ১৯৫৮।

২. তুলনীয় এম্ আত্‌হার আলিঃ 'দ্য মুঘল নোবিলিটি আণ্ডার অওরঙ্গজেব', আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির পক্ষে এশিয়া পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত।

৩. এ-হিসাব ৮ মাসের মাপে কষা হয়েছে।

৪. অল-হিজরি ১১০৪-১৭ (১৬৯২-১৭০৬ খ্রিস্টাব্দ) পর্যায়ে ত্রিচিনোপল্লি-র জমিন্দারকৃত 'পেশ্‌কশ' নির্ধারণের বিশদ বিবরণ আছে সেন্ট্রাল রেকর্ডস্ অফিস, হায়দরাবাদ, অওরঙ্গজেব-এর শাসনকালীন ৮৩ নং নিবন্ধে।

৫. ফরমান নং ২৯, তাং ৯ অক্টোবর, ১৬১৪। তুলনীয় 'ডেস্ক্রিপ্টিভ লিস্ট অফ ফরমানস্, মনশুরস্ অ্যাণ্ড নিশানস্ এট্‌সেটেরা' ডাইরেক্টরেট অফ আর্কাইভস্, গভর্ণমেন্ট অফ রাজস্থান, বিকানীর, ১৯৬২।

৬. অম্বর ও সওয়াই জয়পুর পরগণার 'অর্সত্তাস' [Arsattahs] (প্রাপ্তি ও পরিশোধের মাসিক হিসাবনিকাশ) চত্‌সু ও হিন্দৌন পরগনার সঙ্গে তুলনা করলে রাজস্ব নির্ধারণ-হারে একটি সাধারণ সাদৃশ্য চোখে পড়ে (রাজস্থান স্টেট আর্কাইভস্)।

৭. কৃষি-উৎপাদনের উপরে মুদ্রা অর্থনীতির প্রভাব, এবং মুঘল সাম্রাজ্যে বিরাজমান কৃষি-সম্পর্কগুলির স্বরূপ নিয়ে চমৎকার আলোচনার জন্য ইরফান হবিব: 'অ্যাগ্রেরিয়ান সিস্টেম অফ মুঘল ইণ্ডিয়া, বোম্বাই, ১৯৬৩ দ্রষ্টব্য।

৮. বিভিন্ন ধরণের জমিস্বত্বের উপর আলোচনার জন্য বি. আর. গ্রোভার-এর প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিক অ্যাণ্ড সোসাল হিস্ট্রি রিভিউ', খণ্ড ১, সংখ্যা ১।

৯. এই প্রসঙ্গে আকবর ও জাহাঙ্গির-এর কয়েকটি ফরমান-এর নকল পড়ে দেখতে লেখককে সাহায্য করেছেন এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি-র ডঃ এম. এ. আন্‌সারি।

১০. নিশান তাং ১৫ রমজান, শাহজাহানের ২৩-তম শাসনবর্ষ, সেন্ট্রাল রেকর্ডস অফিস, হায়দরাবাদ, শাহ্ জাহানি রেজিস্টার ৪০/৬০৮।

১১. তুলনীয় ইরফান হবিব: 'অ্যাগ্রেরিয়ান সিস্টেম অফ মুঘল ইণ্ডিয়া', ২৯২ ও পাদটীকা।

১২. তুলনীয় শাহ্‌জাহানের একটি ফরমান (৫ম শাসনবর্ষে) যাতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এমন এক ব্যক্তিকে জমিন্দারি অর্পণ করার যিনি পারবেন কন্ত্ ও গোলা পরগনার উপদ্রবী জমিন্দারদের আয়ত্তে আনতে, এবং যিনি ঐ অঞ্চলে সম্রাটের নামে একটি শহর স্থাপন করবেন। এছাড়া তুলনীয় গ্রোভার: পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২।

১৩. তুলনীয় 'প্রসিডিংস অফ ইণ্ডিয়ান হিস্টরিকাল রেকর্ডস্ কমিশন', XXXVI, পৃ. ৮৯-৯৮।

১৪. উদাহরণস্বরূপ, ১৭০৩-এ মহম্মদী রাজা ইবদুল্লা খান চুক্তি করেছিলেন অযোধ্যা সুবা, খৈরাবাদ সরকার-এর অন্তর্গত বরওয়র-অঞ্জানা এবং ভুরওয়র-এর সমস্ত পরগনাধিকারের, এবং কিছু সময় পরে ঐ বিশাল ভূসম্পত্তির অধিকারপ্রাপ্ত হয়েওছিলেন।

১৫. তুলনীয় 'দরুরুল-উলম' [Durrul-Ulum], 'গোয়ালিয়র-নামা', রমথাম্বর [Ramthambhar]-এর 'ওয়াকাই সরকার আজমীর' ইত্যাদিতে উল্লিখিত নানান্ এজাহার।

১৬. তুলনীয় সেন্ট্রাল রেকর্ডস অফিস, এলাহাবাদ-এ সংরক্ষিত নানান্ হস্তান্তর-দলিল।

১৭. 'দস্তুরুল আমল-ই বেকস' [Dasturul Amal-i Bekas], তুলনীয় এন, এ, সিদ্দিকি, প্রসিডিংস অফ ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস, আলিগড়, ১৯৬০।

১৮. বি. আর. গ্রোভার: পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।

৪

বৈরম খানের তদারকি-রাজত্বকালে মুঘল দরবারের রাজনীতি

ইক্‌তিদার আলম খান

মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে বৈরম খানের 'ওয়াকিলৎ' [wakilat] বা তদারকি-রাজত্ব (১৫৫৬-৬০) অন্তত এই দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে, সাম্রাজ্য উচ্ছেদের দুর্দম প্রচেষ্টা ঐ সময়ে ব্যর্থ হয়েছিল, এবং মুঘল শক্তি সংহত ও সংগঠিত হয়ে উঠেছিল। এটিই সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ বিস্তারের ভিত্তি রচনা করেছিল। ঐ সময়ে বৈরম খানের ক্ষমতার স্বরূপ কী ছিল, কীভাবে তা প্রযুক্ত হত, এবং তাঁর উত্থান ও পতনের কারণগুলি সম্পর্কে ইতিহাসবিদ্‌রা অনেকেই আগ্রহী। প্রচলিত ব্যাখ্যাটি এইরকম যে, ১৫৫৬-র জানুয়ারিতে নিয়োগের দিনটি থেকেই বৈরম খান—মুঘল সাম্রাজ্যের সংকট ও আকবরের অপ্রাপ্তবয়স্কতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে—নিজের ক্ষমতা ক্রমশ বাড়িয়ে নিচ্ছিলেন, প্রতিদ্বন্দ্বীদের সরিয়ে দিচ্ছিলেন, রাজার অভিমত গ্রাহ্য করছিলেন না, ও যথেচ্ছ ঔদ্ধত্য দেখাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত নবীন রাজা ও তাঁর আমির-বর্গের একটি বৃহদংশ আর এ-অবস্থা সহ্য করলেন না, এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রজাপীড়ক শাসকটিকে উচ্ছেদ করলেন।[১] এই সরল ব্যাখ্যাটিকে ঠেকা দেওয়ার জন্য বৈরম খানের আরো কয়েকটি কাজের উল্লেখ করা হয় যেমন, তরদি বেগ-এর ফাঁসি। কাজটির নৈতিক সমর্থন যোগ্যতা নিয়ে বিতর্ক[২] বহুদিন ধরে হয়ে আসছে, এবং বলা হয়ে থাকে যে, এর ফলে অন্যান্য আমিররা শত্রু-ভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন, আর পরবর্তী চার বছর ধরে (প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণার আগে) যে তাঁরা বৈরম খানকে বরদাস্ত করে চলেন, তা শুধু উপযুক্ত সময় ও সুযোগের জন্য। আরেকটি ব্যাখ্যা—যা প্রচলিত হয়েছে অনেক পরে এবং আধুনিক গবেষকদের মধ্যে যার ব্যাপক সমাদর—তা হল এই যে, শিয়াদের প্রতি বেপরোয়া পক্ষপাতের ফলে বৈরম খান সুন্নিদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। ডঃ আর. পি. ত্রিপাঠি আরেকটি কারণ দেখিয়েছেন: বৈরম খান, সম্ভবত ইরানি হওয়ার জন্য, দরবারের তুর্কী আমির মণ্ডলীর বিদ্বেষ ও হিংসা উৎপাদন করেছিলেন।[৩]

এখনকার রচনাগুলিতে বৈরম খানের তদারকি-রাজত্ব প্রসঙ্গে যা বলা আছে তাতে খুব বেশি বিতর্কের অবকাশ না থাকলেও, এ-কথা মনে হয় যে, মূল

ব্যাখ্যাটির সংযোজনী হিসাবে ঐ তিনটি উপপত্তির সপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণাদি নেই। মূল ব্যাখ্যাটিরও কিছু কিছু বক্তব্যের বিশদীকরণ বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ, বৈরম খানের ক্ষমতা কি নিরবচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, নাকি তাতে কোনো ছেদ ছিল, অথবা বৈরম খান অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়ে পড়ছিলেন বলেই কি তাঁকে উৎখাত করা হল, কিম্বা বিদ্রোহের আগেই কি তাঁর ক্ষমতাবৃদ্ধিতে বাধা দেওয়া হচ্ছিল যাতে তিনি প্রত্যাঘাত না করতে পারেন —এই সব প্রশ্নের উত্তর প্রয়োজন। আরো একটি বিষয়ের অধ্যয়ন প্রয়োজন যে, দলদলিরত মুঘল আমিরদের বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং রাজার ব্যক্তিগত সম্বন্ধীবর্গের বাইরেকার রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনাবলি বৈরম খানের ভাগ্যবদলকে প্রভাবিত করেছিল কিনা।

অর্থাৎ, বৈরম খানের তদারকি-রাজত্ব সম্পর্কিত বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রশ্নের মীমাংসার জন্য, সমসাময়িক প্রমাণাদির যথাযথ অনুসরণ ও ঘটনাবলির কালানুক্রমিক সন্ধানমূলক এক বিশদ গবেষণার প্রয়োজন। বর্তমান লেখাটির উদ্দেশ্যই হল বিভিন্ন ঘটনার আন্তঃসম্পর্ক উদ্ধার ও প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে প্রাপ্ত তথ্যাদির আধারে যাচাইয়ের মাধ্যমে এই ধরনের গবেষণার প্রয়াস এবং এর ভিত্তিতে একটি নতুন মূল্যায়ন হাজির করা।

বৈরম খানের তদারকি-রাজত্বকালকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়, এবং প্রতিটি পর্যায়ের পৃথক অধ্যয়ন করা হয়েছে এখানে। প্রথম পর্যায়টি হল আকবর-এর সিংহাসনারোহণ থেকে পানিপথ-এর যুদ্ধের ঠিক আগে পর্যন্ত (জানুয়ারি-অক্টোবর ১৫৫৬), যখন সমস্ত আমির-ই তাঁদের সাধারণ স্বার্থের গুরুতর বিপদাশঙ্কায় বৈরম খানের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় পর্যায়টিতেই পানিপথ-এর দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়, এবং কাবুল থেকে দরবারের সম্ভ্রান্ত মহিলারা এসে পৌঁছনোর পর পর্যায়টি শেষ হয় (এপ্রিল, ১৫৫৭); বৈরম খানের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ততদিনে প্রায় সম্পূর্ণ, এবং তিনি তখন ব্যক্তিগত অনুগামী-গোষ্ঠী তৈরিতে ব্যস্ত। তৃতীয় পর্যায়ে (১৫৫৯-র মাঝামাঝি পর্যন্ত) বৈরম খানের ক্ষমতা ও প্রভাব কমতে থাকে। রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধারের জন্য তদারকি-রাজার শেষ চেষ্টার মধ্য দিয়ে চতুর্থ পর্যায়টির শুরু, এবং দরবারে আমিরদের দলাদলির তীব্রতাবৃদ্ধি ও তদারকি-রাজত্ব অবসানের মধ্য দিয়ে শেষ।

(১)

প্রথম পর্যায়টির শুরু ১৫৫৬র জানুয়ারীতে, হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যুর পরই। তখন ভারতে মুঘলদের অবস্থান সুদৃঢ় তো দূরের কথা, স্বস্তিকরও ছিল না। ঐ সময়ে মুবারিজ্ খান শূর (আদিল শাহ) এবং তাঁর

সুবখ্যাত সেনাপতি হেমু পূর্বভারতের আফগানদের একত্র করে মুঘলদের সঙ্গে চূড়ান্ত শক্তিপরীক্ষার জন্য প্রচণ্ড প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। হেমুর অধীনস্থ সৈন্যশক্তি ইতোমধ্যে দুর্দম হয়ে উঠেছিল। আবুল ফজল-এর উল্লেখমতো, হুমায়ুনের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পরই আফগানরা যে আর একটুও দেরি না করে এক প্রচণ্ড আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়, যাতে পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ তারা নিতে পারে।[৪] অন্যদিকে. আকবরের অপ্রাপ্তবয়স্কতার জন্য মুঘলরা বিপাকে পড়েছিল। রাজার প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্যশাসন করবে—এমন কাউকে খুঁজে বের না করলে চলছিল না, এবং বৈরম খান-ই সর্বসম্মতি-ক্রমে ঐ পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু একজন আমির-এর সার্বভৌম কর্তৃত্বে অধিষ্ঠান আমিরদের পারস্পরিক সম্পর্ককে জটিল করে তুলতে বাধ্য, এবং তাই, প্রশাসনের স্থায়িত্বনাশক বীজটি প্রশাসন-ব্যবস্থার মধ্যেই রোপিত হয়ে গিয়েছিল।

অথচ পরিস্থিতি তখন এমনই যে, উল্লিখিত আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও বৈরম খানের 'ওয়কিল' [wakil] হিসাবে নিয়োগের বিরোধিতা করেননি প্রধান ও প্রতিপত্তিশালী আমিরদের কেউই। তরদি বেগ, মুনিম বেগ, খিজর খওয়াজা খান, খওয়াজা জলাল উদ্দিন মহমুদ এবং খওয়াজা মুয়জ্জম—এঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের দীর্ঘ কর্মজীবন, অথবা আকবরের সাথে রক্তসম্পর্ক বা অতীত মৈত্রীর দৌলতে অনায়াসেই 'ওয়কিলৎ' পেতে পারতেন, কিন্তু এঁরা সবাই বৈরম খানের নিয়োগকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছিলেন। এমনকী বদমেজাজি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী বলে পরিচিত শাহ আবুল মালি পর্যন্ত কোনো আপত্তি তোলেননি।[৬] মুঘল আমিরদের সর্বস্তরেই নিয়োগটি মৌনস্বীকৃত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে হুমায়ুনের মৃত্যুর পরে, দিল্লির সেনাধ্যক্ষ তরদি বেগ খান স্বেচ্ছায় বৈরম খানের হাতে মির্জা কামরান-এর পুত্র মির্জা আবুল কাসিম-এর জিম্মাদারি তুলে দিয়েছিলেন।[৭] যদি বৈরম খানের নিয়োগ সম্পর্কে তাঁর কোনো আপত্তিই থাকত, নিশ্চয়ই তাহলে তিনি মির্জা আবুল কাসিম-কে কলানৌর-এ পাঠিয়ে শাহীবংশের একজন রাজপুত্রকে আপন অধিকারে রাখার সুযোগ ছাড়তেন না, যাকে তিনি দরকার হলে—ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য দাবার বোড়ের মতো ব্যবহার করতে পারতেন। একইভাবে, শাহ আবুল মালির ভাই শাহ হাশিম-কে কাবুলে—বৈরম খানের নির্দেশমাফিক—গ্রেপ্তার করার ক্ষেত্রে মুনিম বেগ যে-তৎপরতা দেখিয়েছিলেন[৮], তা-থেকেও এটাই মনে হয় যে, বৈরম খানের 'ওয়কিলৎ' পাওয়া নিয়ে তাঁর অন্তত প্রথম দিকে কোনো অসন্তোষ ছিল না।

তবে, উঁচু পদ বা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নিযুক্ত ঊর্ধ্বতন আমিররা, সম্ভবত, চেয়েছিলেন বৈরম খানের সঙ্গে ক্ষমতা ও প্রভাব ভাগাভাগি করে নিতে ;

তাঁর সম্ভবত তাঁরা বৈরমের একচ্ছত্র প্রতিপত্তি মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। অন্যদিকে, বৈরম খান প্রথম থেকেই কঠিন হাতে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে কৃতসংকল্প ছিলেন। এর ফলে যে তাঁকে—আগেই হোক বা পরে—নেতৃস্থানীয় আমিরদের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়তে হবে, মনে হয় সে-সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন। পরবর্তী ঘটনাবলির নমুনা দেখে মনে হয় যে, 'ওয়াকিল-উস-সল্‌তনত' [wakil-us-saltanat] হওয়ার পরে বৈরম খান এমন সবাইকেই গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে সরিয়ে দিতে থাকলেন, যাঁদের তিনি তাঁর কর্তৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতেন। আকবরের সিংহাসনারোহণের সময় শাহ আবুল মালিকে পদচ্যুত করে গ্রেপ্তার করা হয়। এর প্রতিক্রিয়া তেমন কিছু হয়নি কারণ, বদমেজাজ ও ধৃষ্টতার জন্য কেউই তাঁকে পছন্দ করত না।[৯] এর কিছুদিন পরে, লাহোর-এর ফৌজদার বাপুস বেগকে পদচ্যুত করা হয়, এবং মুনিম বেগ-এর শক্তিবৃদ্ধি করার অজুহাত দেখিয়ে তাঁকে একটি ছোট্ট সৈন্যদলসহ কাবুলে পাঠানো হয়।[১০] আরেকজন অগ্রগণ্য আমির তুলক খান ক্যুচিনকেও বাধ্য করা হয় হিন্দুস্থান ত্যাগ করে মুনিম খান-এর কাছে চাকরি নিতে।[১১] একইভাবে, বৈরম খান 'ওয়কিলৎ' পাওয়ায় খওয়াজা সুলতান আলিকে 'ওয়জির'-এর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। যদিও খওয়াজা সুলতান আলি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বরখাস্ত হননি, কিন্তু 'ওয়জির'-এর পদমর্যাদা তাঁর আর ছিল না। এর পরে, 'দিওয়ানী' ['diwani] (অর্থ দপ্তর)-র কাজকর্মও 'ওয়কিল' স্বয়ং দেখতে থাকেন। হুমায়ুনের গত দশ বছরের রাজত্বে কেন্দ্রীয় সরকার যে-ধাঁচে চলছিল, ঐ পদক্ষেপটি ছিল তার বিপরীতধর্মী।[১২] শেষে, আরেকটি ঘটনাও উল্লেখ করতে হয় যে, আকবর-এর সিংহাসনারোহণের কয়েকদিনের মধ্যেই শমস্‌-উদ্দিন মুহম্মদ অত্‌কা, খওয়াজা জলাল-উদ্দিন মহমুদ, মুহম্মদ ক্যুলি খান বরলাস, মির্জা খিজর খান হজারা—সংক্ষেপে, শিবিরে যাঁদের উপস্থিতি বৈরম খানের দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারত এমন প্রায় সমস্ত নেতৃস্থানীয় আমিরকে কাবুল পাঠানো হয়েছিল "বেনামদের নিয়ে আসার জন্য।"[১৩]

কাবুলের সুবেদার মুনিম খান, এবং অযোধ্যায় মুঘল সেনাধ্যক্ষ আলি ক্যুলি খান উজ্‌বেক—এই দুজনের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে বৈরম খান তাঁদের প্রতি আচরণে নম্রতা ও পক্ষপাত প্রদর্শন করতে থাকেন যাতে, অন্যান্য আমিরদের সঙ্গে যদি তাঁকে শক্তিপরীক্ষায় নামতেই হয় তবে, ঐ দু-জনকে অন্তত নিরপেক্ষ রাখা যায়।[১৪] বৈরম খানের এ-চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। আলি ক্যুলি খান-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মৈত্রী গড়ে ওঠে, এবং মুনিম খান ততটা ঘনিষ্ঠ না-হয়েও সহযোগিতা করতে থাকেন। তবুও, বৈরম খান সম্ভবত মুনিম খান-এর আনুগত্য সম্পর্কে আশ্বস্ত ছিলেন না। বাস্তবিকই, এমন কোনো নিশ্চয়তা ছিল না যে, বিক্ষুব্ধ আমিররা (যাঁরা বৈরম খান-

কর্তৃক পদচ্যুত হওয়ার পর কাবুলে গিয়ে একত্রিত হয়েছিলেন) বৈরম খান ও মুনিম খানের সমঝোতাটাকে গোপনে গোপনে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইবেন না। এই পরিস্থিতিতে বৈরম খানের উদ্দেশ্যসিদ্ধির যুৎসই পদক্ষেপটি হল মুনিম খানকে এমনভাবে কাবুলে আটকে ফেলা যাতে তিনি দরবারে নিজের প্রভাব খাটাতে না পারেন। তাই, মির্জা সুলেমান-এর কাবুল আক্রমণ (মে, ১৫৫৬) বৈরম খানের কাছে ঈশ্বরপ্রেরিত ঘটনা বলে মনে হয়েছিল। পরবর্তী চার মাস মুনিম খান-এর পক্ষে দরবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হল না,[১৫] এবং ঐ সময়ের মধ্যে বৈরম খান প্রশাসনকে নিজের কুক্ষিগত করে ফেললেন। মির্জা সুলেমান-এর আক্রমণ-কে মোকাবিলা করার জন্য মুনিম খানকে সামরিক সাহায্য পাঠানোয় বৈরম খানের কালক্ষেপণের কারণ আর যাই হোক, হিন্দুস্থানে মুঘলদের বিপন্নতা কোনো কারণ নয়।[১৬]

মুঘল আমিরদের মধ্যে রেষারেষির ফলে প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হচ্ছিল, এবং তা প্রকট হয়ে উঠল আফগান আক্রমণের সময় (অক্টোবর, ১৫৫৬)। বৈরম খানের পদক্ষেপগুলির ফলে যে-অনিশ্চিতির উদ্ভব হয়েছিল তার দরুনই মুঘল সামরিক অফিসারদের প্রতিরোধ চেষ্টাগুলি দানা বাঁধতে পারল না, এবং আফগানরা দিল্লির দিকে এগিয়ে গেল। আবুল ফজল-এর বিবরণী থেকে জানা যায়, তুঘলকাবাদ-এর যুদ্ধের ঠিক আগে মুঘল অফিসারদের মধ্যে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের ঐক্য বলতে কিছু ছিল না। অধিকাংশই ছিলেন পাঞ্জাব ও সম্বল থেকে সৈন্যসাহায্য এসে না পৌঁছনো পর্যন্ত সংঘর্ষ এড়িয়ে চলার পক্ষে, কিন্তু তরদি বেগ খান চাইছিলেন তখনি যুদ্ধ শুরু করতে।[১৭] হয়ত তাঁর আশঙ্কা ছিল যে, বৈরম খান এসে পৌঁছনোমাত্র তিনি পদচ্যুত হবেন, এবং আরো অনেকের মতো তাঁকেও অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হবে নিকৃষ্ট কোনো কাজের ভার দিয়ে। ঐ বাহিনীতেই ছিলেন পীর মুহম্মদ খান যাঁকে বৈরম খান পাঠিয়েছিলেন, সম্ভবত, এই গোপন নির্দেশ দিয়ে যে, তিনি স্বয়ং এসে পৌঁছনোর আগে তরদি বেগ যেন আফগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয় না করে ফেলতে পারেন।[১৮] এই সবকিছু মিলিয়েই মুঘলরা তুঘলকাবাদ-এর যুদ্ধে পরাস্ত হয়েছিল।

এই পরাজয়ের ফলে আমিরবর্গের ক্ষমতার ভারসাম্য টলে যায়, এবং তরদি বেগ খান কোণঠাসা হয়ে পড়েন। তুঘলকাবাদ-এর যুদ্ধের পরে তরদি বেগ খান ও তাঁর অনুগামীরা দোয়াব ও মেওয়াত্-এর জাগির হারিয়ে (আফগানদের কাছে) পাঞ্জাবের শাহী শিবিরে পৌঁছন আপাত-শরণার্থীর মতো।[১৯] এতে ক্ষমতার ভারসাম্য ঝুঁকে পড়ে বৈরম খানের দিকে। তাঁর হাতে তখন সুযোগ এসে যায় তদারকি-রাজা হিসাবে যথেচ্ছ ক্ষমতাপ্রয়োগের শেষ বাধাটিকে উপড়ে ফেলার। ২২ অক্টোবর, ১৫৫৬ তারিখে রাজার

অনুমোদন না নিয়েই বৈরম খান ফাঁসি দিলেন তর্দি বেগকে, "জেনেশুনে এবং বেইমানি করে" যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়ে পরাজয় ডেকে আনার জন্য।[২০] এই অভিযোগের সমর্থনে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন আলি ক্যুলি খান ও পীর মুহম্মদ খান।

(২)

তর্দি বেগ-এর ফাঁসি মুঘল আমিরদের মধ্যে ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধের সঞ্চার করেছিল, কিন্তু তার কোনো হিংসাত্মক বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়নি। ভারতে মুঘলদের অবস্থান তখন এতটা বিপন্মুক্ত ছিল না যে, রাজকর্মচারীদের মধ্যে প্রকাশ্য ফাটল ধরানোর ঝুঁকি তারা নিতে পারত। সম্ভবত এই ভরসাতেই বৈরম খান তর্দি বেগকে ফাঁসি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এছাড়া যেসব প্রভাবশালী ব্যক্তি ঐ ফাঁসির বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে সজোরে তুলে ধরতে পারতেন, তাঁদের বিভিন্ন অনুগ্রহ প্রদান করে সম্মত করা হয়েছিল তদারকি-রাজার কাজটিকে সমর্থন করতে। এঁদের মধ্যে ছিলেন মহম অনাগা-ও।[২১] তর্দি বেগ-এর কিছু ঘনিষ্ঠ অনুগামী ছিল যারা মুখ বন্ধ রাখতে চায়নি এবং প্রকাশ্যেই তদারকি-রাজার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল ; তাদের হত্যা করা হয়েছিল।[২২] খওয়াজা সুলতান আলি, মীর আসগর মুনৃশি, খঞ্জর বেগ এবং আরো অনেককে বন্দী করা হয়েছিল।[২৩] তাছাড়া, তর্দি বেগ-এর ফাঁসির খবরটি পানিপথ-এর যুদ্ধের একমাস না পেরনো পর্যন্ত সরকারি-ভাবে ঘোষিতও হয়নি। বিশেষ যত্নসহকারে খবরটি চেপে রাখা হয়েছিল কাবুলের আমিরদের কাছ থেকে,[২৪] যাঁদের মধ্যে তর্দি বেগ-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং আত্মীয়ের সংখ্যা কম ছিল না।[২৫] এইসব পদক্ষেপের মধ্য দিয়েই বৈরম খান আমিরদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছিলেন, যদিও তাঁর ঐ দুষ্কর্মটি ব্যাপক অসন্তোষ জাগিয়ে তুলেছিল।

অবশ্য, সাময়িকভাবে হলেও বৈরম খান যা-হোক কিছুটা শৃঙ্খলাপরায়ণতা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন, তর্দি বেগ-এর মতো প্রতিপক্ষের উপস্থিতিতে যা হয়ত সম্ভব হত না। পানিপথ-এর পরবর্তী যুদ্ধে গৌরবময় জয়ে নিশ্চয়ই ঐ প্রশাসনিক উন্নতির একটা বড় অবদান ছিল। ঐ যুদ্ধে মুঘল বাহিনীর সেনাপতিরা প্রায় সবাই ছিলেন বৈরম খান-এর ব্যক্তিগত বন্ধু ও সুহৃদ।[২৬] যুদ্ধজয়ের গৌরবকে কাজে লাগিয়ে বৈরম খান তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু-আমিরদের পুরস্কৃত ও পদোন্নত করলেন যাতে তাঁর অনুগামী একটি স্বাধীন আমির-গোষ্ঠী তৈরি হয়। দোয়াব-এর উপাধি ও জাগিরগুলি দেওয়া হল অবদুল্লা খান উজ্‌বেক, সিকন্দর খান উজ্‌বেক, আলি ক্যুলি খান উজ্‌বেক, কিয়া খান গঙ, এবং পীর মুহম্মদ খান-এর মতো বৈরম খানের সুবিদিত বন্ধু ও

অনুগামীদের, আর এর মধ্য দিয়ে তাঁদের বন্ধুত্ব ও আনুগত্য দৃঢ়তর হল।[২] মূলত ঐ আমিরদের সাহায্য নিয়েই বৈরম খান পানিপথ-এর যুদ্ধজয়সূত্রে প্রাপ্ত এলাকাগুলিতে শান্তিস্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। পানিপথ-এর যুদ্ধের পর যতগুলি অভিযান যতদিকে হয়েছিল, ঐ আমিররাই তাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন।[২৮] খিজর্ খওয়াজা খান-ই[২৯] সম্ভবত একমাত্র বনেদি আমির যিনি বৈরম খানের ঘনিষ্ঠ অনুগামীচক্রের অন্তর্ভুক্ত না হয়েও গুরুত্বপূর্ণ সৈনাপত্যে নিযুক্ত ছিলেন। পানিপথ-এর যুদ্ধের ঠিক আগে তাঁকে পাঞ্জাবে অবস্থিত মুঘল বাহিনী পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য তাঁকে নিজের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি। আসল উদ্যোগ সবসময়েই ছিল হাজি মুহম্মদ খান সিস্তানি-র হাতে, যে ছিল বৈরম খানের ব্যক্তিগত অনুচর এবং সেনাবাহিনীর এক অধস্তন অফিসার-মাত্র।[৩০] এছাড়া, পাঞ্জাবে সামরিক কার্যকলাপের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ামাত্র—সিকন্দর শূর-এর প্রকাশ্য আস্ফালনের ফলস্বরূপ—বৈরম খান দ্রুত সেখানে তাঁর অনুগামীচক্রের অন্তর্ভুক্ত সিকন্দর খান উজ্‌বেক-কে[৩১] পাঠালেন, এবং খিজর খওয়াজা খান-এর ক্ষমতা আরো সীমিত হল। কিছু সময় পরে, মুহম্মদ কুলি খান বরলাস কাবুলে থাকা সত্ত্বেও তাঁর জাগির বদলি করা হল নাগোর-এ, আর মুলতান-এ নিয়োগ করা হল আলি কুলি খান-এর ছোট ভাই বাহাদুর খান-কে।[৩২] এতে নিশ্চয়ই পাঞ্জাবের মুঘল সামরিক অফিসারদের উপর বৈরম খান-এর নিয়ন্ত্রণ বেড়েছিল।

খওয়াজা সুলতান আলি ও মীর আসগর মুন্‌শি-র গ্রেপ্তার ও পদচ্যুতির (অক্টোবর, ১৫৫৬) পর কেন্দ্রীয় সরকারি পর্যায়েও বৈরম খান-এর পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল।[৩৩] কেন্দ্রীয় সরকারের বহুবিধ কাজ দেখাশোনা করতেন বৈরম খান-এর ব্যক্তিগত 'ওয়াকিল' পীর মুহম্মদ খান, যিনি এভাবে প্রশাসনের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে ওঠেন।[৩৪] আরো যে-দুই ব্যক্তি কেন্দ্রীয় সরকারি কাজকর্ম সামলাতেন সেই খওয়াজা আমিন-উদ্দিন (বখ্‌শী)[৩৫] এবং শেখ গদাই (সদর্)[৩৬] ছিলেন বৈরম খানের প্রিয়পাত্র।

এইভাবে, তরদি বেগ-এর ফাঁসির ছ'মাসের মধ্যেই বৈরম খান সক্ষম হলেন রাষ্ট্রযন্ত্রের পূর্ণ কর্তৃত্ব হাতে নিতে। তাঁর সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীরা যাতে রাজার নাগাল না পায় সে-জন্য তিনি সবরকম ব্যবস্থা নিতেন, এবং দরকার হলে, কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। মুনিম খান আর খওয়াজা জলাল-উদ্দিন মহমুদ যাতে দরবারে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা ক্রমশ ত্যাগ করতে থাকেন, সেদিকেও তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল।[৩৭] নবীন রাজার নিকটসম্বন্ধী কোনো আমির যাতে এক নাগাড়ে বেশিদিন শাহী শিবিরে থাকার অনুমতি না পান সেদিকেও তিনি নজর রাখতেন।[৩৮]

তদারকি-রাজার কার্যত সার্বভৌম নৃপতি হয়ে ওঠাটা যাঁরা মেনে নিতে

রাজি ছিলেন না, উপরোক্ত রদবদলগুলি নিশ্চয়ই তাঁদের বিপদসংকেত দিয়েছিল। একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, হিন্দুস্থানযাত্রার আগে সম্ভ্রান্ত মহিলারা আফগানিস্তানে উপস্থিত বনেদি আমিরদের সঙ্গে সমস্যাটি নিয়ে আলোচনায় বসেছিলেন। মনে হয়, ঐ আলোচনার থেকেই তদারকি-রাজার ক্ষমতা খর্ব করার একটি নির্দিষ্ট কর্মপন্থা গৃহীত হয়েছিল। কাবুল থেকে ঐ মহিলারা এসে পৌঁছনোর পর দরবারের ঘটনাক্রম লক্ষ করলে এই ধারণাই দৃঢ়তর হয়।[৩৯]

এইভাবে, ক্ষমতালাভের দুটি প্রতীকী ঘটনার—তর্দি বেগ-এর ফাঁসি এবং পানিপথ-এর যুদ্ধের—ছ'মাসের মধ্যেই বৈরম খানের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রবল-প্রতিদ্বন্দ্বের ক্ষেত্র প্রস্তুত হল।

(৩)

আপাতভাবে, নবীন রাজাকে বৈরম খান-এর প্রভাবমুক্ত করার যে-সমস্ত উপায় সম্পর্কে সম্ভ্রান্ত মহিলারা এবং মুনিম খান ও অন্যান্য আমিররা একমত হয়েছিলেন সেগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল মুনিম খান-এর এক জামাতা মির্জা আব্দুল্লা মুঘল-এর কন্যার সঙ্গে রাজার বিবাহ দেওয়া।[৪০] হমিদা বানু বেগম ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মহিলারা মানকোট-এ আকবর-এর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রথম সুযোগেই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিলেন, এবং বৈরম খানের প্রবল বিরাগ সত্ত্বেও মহা ধুমধাম ও আড়ম্বরে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। এটিই ছিল প্রথম ধাক্কা যা বৈরম খান-কে হজম করতে হয়েছিল।[৪১]

এপ্রিল, ১৫৫৭-তে কাবুল থেকে সম্ভ্রান্ত মহিলারা এসে পৌঁছনোর পর ঘটনা এমন খাতে বইতে থাকে যে, মুঘল শাহী শিবির সংকটের মুখে পড়ল। এটা তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার যে, হমিদা বানু বেগম ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মহিলারা আসবার পরই বৈরম খান-এর বিরুদ্ধে একটি সংগঠিত পক্ষ গড়ে তোলার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। এর আগে এমনকী মহম অনাগা—যাঁকে পরবর্তীকালে তদারকি-রাজার বিরোধীপক্ষের সচল প্রেরণা হিসাবে দেখা যাবে—তিনি পর্যন্ত বৈরম খান-এর সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলতেন। তিনি কাবুলে ছিলেন না; ছিলেন শাহী শিবিরে এবং অক্টোবর ১৫৫৬-তে তর্দি বেগ-এর ফাঁসি সমর্থন করেছিলেন।[৪২] কিন্তু কাবুল থেকে সম্ভ্রান্ত মহিলারা এসে পৌঁছনোর পর তাঁর মনোভাব পাল্টাতে শুরু করেছিল। এ-থেকে বোঝা যায় যে, বৈরম খান-কে উৎখাত করার প্রচেষ্টায় হমিদা বানু বেগম-এর অবদান ছিল সাধারণত যা ভাবা হয় তার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ।[৪৩]

নতুন পরিস্থিতি সূচিত হল কয়েকটি আলোড়নকারী ঘটনার মধ্য দিয়ে। সম্ভ্রান্ত মহিলারা পৌঁছনোর কয়েকদিন পরেই বৈরম খানের প্রাণনাশের চেষ্টা

হয়েছিল। এই ঘটনায় বৈরম খান-এর সন্দেহ গিয়ে পড়ে অত্‌কা খান, অধম খান এবং মহম অনাগা-র মতো কয়েকজনের ওপর, যাঁরা আকবরের নিকট-সম্বন্ধী হওয়ার দরুন দরবারে বিশেষ প্রভাবশালী ছিলেন। নিজের বিশ্বাস-ভাজনদের মধ্যে রাজহস্তী বণ্টন, মহম অনাগা ও অত্‌কা খান-কে সতর্কীকরণ, এবং অত্‌কা খানকে ভীর-এ বহুদূরবর্তী ফাঁড়িতে প্রেরণ—এগুলি ছিল মানকোট এর পতনের (৪ জুলাই, ১৫৫৭)[৪৪] পর যে-সমস্ত পদক্ষেপ তিনি নিয়েছিলেন, তারই কয়েকটি। ঐ সময়েই আকবর-এর জ্ঞাতিভগ্নী সলিমা সুলতান বেগম-এর সঙ্গে বৈরম খান-এর বিবাহের সম্বন্ধ উত্থাপন, এবং তাতে মহম অনাগা-র সহযোগিতা থেকে বোঝা যায় যে, উপরোক্ত পদক্ষেপগুলি নিষ্ফল হয়নি।[৪৫] আপাতদৃষ্টিতে, বিরোধীপক্ষ প্রথমদিকে যে প্রকাশ্য অবাধ্যতা ও সংঘর্ষের মনোভাব গ্রহণ করেছিল তা তখনকার মতো বর্জন করতে বাধ্য হয়। এই পরিবর্তনের পিছনে অবশ্যই দোয়াব ও বুন্দেল খণ্ড-এ বৈরম খান-এর বন্ধু-ও অনুগামী আলি ক্যুলি খান ও কিয়া খান গঙ-কর্তৃক জরুরি যুদ্ধগুলিতে জয়লাভের একটা বড়ো ভূমিকা ছিল।[৪৬] রাজপুত্রীর সঙ্গে বিবাহের মাধ্যমে বৈরম খান আমিরদের মধ্যে তাঁর অবস্থান সুদৃঢ় করে নিতে পেরেছিলেন। অবশ্য এমন ধরে নেওয়া ভুল হবে যে এটি বৈরম খান-এর আধিপত্যকে দীর্ঘকালের জন্য সুরক্ষিত করেছিল। মানকোট-এর পতনের[৪৭] পর শাহী শিবির যে—এমনকী লোক দেখানো কোনো কারণ ছাড়াই প্রায় এক বছর ধরে পাঞ্জাবে রইল, তা-থেকেই মনে হয় ঐ সময় বৈরম খান ও তাঁর বিরোধী আমিরগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ের ফলে শাহী কর্তৃত্ব পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। ঐ অচলাবস্থা কাটিয়ে ওঠার একমাত্র উপায়টি ছিল দুই বিবদমান গোষ্ঠীর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়মিত কাজগুলি চালিয়ে যাওয়ার সহায়ক একটি চুক্তি। এই সংকটে পড়েই বৈরম খান সম্মত হয়েছিলেন অন্যান্য নেতৃস্থানীয় আমিরদের সঙ্গে কিছু ক্ষমতা ভাগ করে নিতে। ১৫৫৮ সালের এপ্রিল নাগাদ ঠিক হল যে, অতঃপর বৈরম খান 'ওয়কিল' পদাধিকারবলে কোনো প্রস্তাব রাজার কাছে পেশ করতে পারবেন না, যতক্ষণ না প্রস্তাবটি নেতৃস্থানীয় আমিরমণ্ডলীর সর্বসম্মতি পাচ্ছে। ঐ আমিরমণ্ডলী সপ্তাহে দুবার মিলিত হবেন।[৪৮] এটি শুধুমাত্র কাগুজে চুক্তি ছিল না, বরং কেন্দ্রীয় সরকারি কাজকর্মে উন্নতি দেখে মনে হয়, দুই বিরোধীগোষ্ঠীর মধ্যে বাস্তবিক সমঝোতাই হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে এর পর থেকেই বৈরম খান-এর কেন্দ্রীয় সরকারে ওপর কর্তৃত্ব কমতে শুরু করেছিল, এবং ১৫৫৮ নাগাদ এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হল যে, তাঁর ব্যক্তিগত 'ওয়কিল' পীর মুহম্মদ-কে দিয়ে পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করানো সম্ভব হল। তাঁর সুবিদিত সমর্থকদের বেছে বেছে হয়রান করা, ও শাস্তি দেওয়া হতে থাকল,, এবং এর পিছনে ছিল কেন্দ্রীয় সেই সংস্থাগুলি যেগুলির পৌরোহিত্য তাঁরই করার কথা।[৪৯]

(৪)

অবস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য বৈরম খান যে-চেষ্টা করলেন তাকে প্রায় কু-দেতা বলা চলে। এটা ঘটল ১৫৫৯-এ। তিনি পীর মুহম্মদ-কে পদ-চ্যুত ও নির্বাসিত করলেন, এবং তাঁর ব্যক্তিগত 'ওয়কিল' হিসাবে নিয়োগ করলেন হাজি মুহম্মদ সিস্তানি কে। এই পরিবর্তনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব আবার বৈরম খান-এর কার্যকর নিয়ন্ত্রণে চলে এল। কেন্দ্রে নতুন দপ্তরবণ্টনের মধ্য দিয়ে শেখ গদাই—যাঁকে নিয়মমাফিক 'সদর্'-এর কাজ ছাড়াও রাজনৈতিক এবং আর্থিক ক্রিয়াকলাপও দেখাশোনা করার ভার দেওয়া হয়েছিল—অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠলেন।[৫০] একই সময়ে, বৈরম খান-এর অনুচরদের মধ্য থেকে বেশ কয়েকজন অফিসারকে অপ্রত্যাশিত উঁচু পদে উন্নীত করা হল, সম্ভবত আমিরদের মধ্যে তাঁর গৌরবহানি রোধ করার জন্য।[৫১] এই পদক্ষেপগুলির পৃষ্ঠরক্ষার্থে নতুন সামরিক অভিযান পরিকল্পিত হল পূবে, এবং মালব ও দক্ষিণ-পূর্ব রাজপুতানায়।[৫২]

এই ব্যবস্থায় অবশ্য অন্যপক্ষের প্রতিক্রিয়াও ত্বরান্বিত হল। মানকোট-এ আকবর ও বৈরম খান এর মধ্যে মতান্তরসৃষ্টির পর বিরোধীপক্ষ প্রণালী-মাফিক কাজ করে চলেছিল, এবং উভয়ের মধ্যেকার ব্যবধানটিকে ক্রমশ অসেতুসম্ভব করে তোলায় কিছুটা সফলও হচ্ছিল। যত সময় যেতে লাগল, বৈরম খান-এর বন্ধুদের বিরুদ্ধে উপহাস ও নিন্দাপ্রচার ততই তুঙ্গে উঠল।[৫৩] আকবর-এর কাছে বলা হতে থাকল যে, তারা অদক্ষ ও অবাধ্য, এবং খান-ই-খনান-এর দুষ্কর্মের জন্যও তারাই দায়ী।[৫৪] রাজা এবং অধিকাংশ আমির-এর সঙ্গে যোগাযোগ না থাকার ফলে বৈরম খানের আচরণও উত্তরোত্তর উত্তেজনাপ্রবণ হয়ে উঠল।[৫৫] বিভিন্ন স্তরের আমিরদের প্রতি ক্ষমতাগর্বী ও হঠকারী মনোভাব প্রদর্শন করে তিনি অনাবশ্যকভাবে শত্রু-সংখ্যা বাড়িয়ে ফেললেন। চগ্‌তাই [chaghtai] আমিরদের মধ্যে তাঁর সমর্থকসংখ্যা কম ছিল না,[৫৬] অথচ কালক্রমে তাঁর আচরণ এমন হয়ে উঠল যেন সব চগ্‌তাই আমিরকে গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে সরিয়ে দিতে তিনি বদ্ধপরিকর। এতে বৈরম খান-এর বিরোধীরা তাঁকে চগ্‌তাই-দের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করার সুযোগ পেয়ে গেল, এবং তাঁর বিরুদ্ধে চগ্‌তাই বংশের একটি বড় জোটকে চালিত করারও চেষ্টা চলতে লাগল। তখনও পর্যন্ত এই চগ্‌তাইরাই ছিল আমিরদের মধ্যে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ।[৫৭] তাদের বিরোধীপক্ষে যোগদান স্বভাবতই বৈরম খান-এর পতনের পথ সুগম করেছিল।

এখনকার গবেষকরা প্রায় সবাই-ই বৈরম খান-এর বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের আরেকটি কারণের কথা বলেন—শেষ দিকে তিনি শিয়াদের জন্য যে-সব অনুগ্রহ মঞ্জুর করেছিলেন তাতে সুন্নিরা রুষ্ট হয়েছিল। যদিও

মনে হয় বৈরম খান শিয়া মতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু কোনো সমসাময়িক দলিলে বা মুঘল আমলের কোনো ইতিহাসবিদের রচনায় এমন কিছু পাওয়া যায় না যা-থেকে বলা যেতে পারে যে, তিনি অনুগ্রহবণ্টন করতেন ধর্ম-বিশ্বাসের ভিত্তিতে।[৫৮] ধর্মজ্ঞদের মধ্যে তাঁর প্রিয়পাত্র শেখ গদাই ছিলেন একজন সুন্নি। অনেক ক্ষেত্রে যদিও শেখ গদাই-কে শিয়া মতাবলম্বী বলা হয়েছে, কিন্তু ঐ অনুমাণের সপক্ষে কোনো প্রমাণ—হয়ত নেই বলেই—দেওয়া হয়নি।[৫৯]

কেন্দ্রীয় প্রশাসনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার জন্য বৈরম খান পুরোপুরিই নির্ভর করেছিলেন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত তাঁর অনুগামীদের উপর। মনে হয়, নবীন রাজার আস্থা অর্জনের প্রয়োজনটি তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন। হয়ত তিনি ভেবেছিলেন যে, একবার প্রশাসনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হাতে চলে এলে রাজাকে সামলানো অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। কিন্তু এটা করতে গিয়ে তিনি তাঁর প্রতিপাল্যটির (অর্থাৎ আকবর-এর) চাতুর্য, এবং মুঘল আমিরদের রাজভক্তি ও আনুগত্যকে ছোট করে দেখেছিলেন। ১৫৬০ সালের মার্চ মাসে আকবর যখন আগ্রা ছেড়ে গেলেন এবং বৈরম খান-এর পদচ্যুতি ঘোষণা করলেন, সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর যে অনুগামী আমিরমণ্ডলীকে তিনি বিগত চার বছর ধরে বহু পরিশ্রমে গড়ে তুলেছিলেন সেটি ভেঙে গেল।[৬০] এমন-কী তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত সেনাপতি-দের মধ্যেও অনেকেই তাঁকে ছেড়ে গেল, বা নিরপেক্ষতা অবলম্বন করল।[৬১] যে-কয়েকজন অনুগামীকে নিয়ে তিনি মাচ্ছিওয়াড়ায় যুদ্ধ করেছিলেন, তাদের সম্ভবত বোঝানো হয়েছিল যে, তিনি বিরোধীদের কবল থেকে রাজাকে উদ্ধার করার জন্যই এ-যুদ্ধে নেমেছেন।[৬২] কিন্তু আকবর স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির হওয়ার পর এই অনুগামীরাও উধাও হল, এবং তাঁর সঙ্গে রইল শুধুমাত্র পাঞ্জাব-এর পার্বত্য অঞ্চলের স্থানীয় কয়েকজন সর্দার। তাঁকে যে শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাবের এক ছোট জমিদারের কাছে আশ্রয় নিতে হয়েছিল, তাতেই বোঝা যায় যে, তাঁর ক্ষমতার দুর্গ ধসে পড়েছিল।

(৫)

ইতিপূর্বের আলোচনা থেকে এটা বেরিয়ে আসে যে, তদারকি-রাজত্ব-কালের প্রায় পুরো পর্যায়টা জুড়েই রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল কার্যত আমিরদের প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলির হাতে। বৈরম খান তদারকি-রাজা হিসাবে ক্ষমতাপ্রয়োগ ততটাই করতে পেরেছিলেন যতটা সুযোগ মুঘল অফিসার ও

রাজপুরুষেরা তাঁকে দিয়েছিলেন, অথবা তাঁরা তাঁকে যতটা উপেক্ষা করেছিলেন। আমিররা তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকার করেছিল, কিন্তু সীমিত অর্থে। তাঁকে কার্যত সার্বভৌম নৃপতির ক্ষমতাভোগ করতে দিতে আমিররা প্রস্তুত ছিল না। যদিও বৈরম খান আমিরদের চাপের মুখে রেখে রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর নিজের কর্তৃত্ব জোরদার করার সাধ্যাতীত চেষ্টা করেছিলেন, তবুও কেবল তরদি বেগ-এর ফাঁসির পরবর্তী মাস ছয়েক পর্যন্ত, যখন আমিররা নিজেদের স্বার্থেই শৃঙ্খলাপরায়ণতার দাবি তুলেছিল, তখন ছাড়া তদারকি-রাজার অবস্থান কখনোই সর্বোচ্চ শাসকের ছিল না। কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য তাঁকে সর্বদাই নির্ভর করতে হত কোনো-না-কোনো গোষ্ঠীর আমিরদের উপর। নিজস্ব একটি স্বাধীন ও স্থিতিশীল অনুগামীবাহিনী তৈরি করা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। ঐ চেষ্টা করতে গিয়ে তিনি নিজের সমস্যা বাড়িয়েই তুলেছিলেন। এর ফলে একদিকে আমির-দের একটি বড় অংশ—হঠাৎ অধস্তন অফিসার-রা পদোন্নতির ফলে তাঁদের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে যাওয়ায়—ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিলেন, এবং অন্যদিকে, ঐ নব্য আমিরদের পরিমিতি-বোধের অভাব ও অদক্ষতার ফলে জটিলতা আরো বেড়ে গিয়েছিল। বৈরম খান-এর নিজেরই তৈরি কিছু ভুঁইফোঁড় আমির এমনকী তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণেরও দুঃসাহস দেখিয়েছিল। এই সঙ্গে, একটি সুবিধা-ভোগী শ্রেণী হিসাবে তাঁদের অবস্থানের বিঘ্নকারক হতে পারে এমন যে-কোনো ব্যাপারে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া আগেকার আমিরদের প্রতিক্রিয়া থেকে খুব একটা অন্যরকম ছিল না।

বৈরম খান ও দরবারে তাঁর বিরোধীদের মধ্যে সংঘর্ষটা ছিল মূলত কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের প্রতিনিধিস্বরূপ তদারকি-রাজা—যাঁর ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট বিধিনিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না—এবং অবশিষ্ট আমিরদের মধ্যে। এই পর্যায়টিতে রাজা ছিলেন ক্ষমতাহীন ও শোভাবর্ধক পদাধিকারী মাত্র, এবং খামখেয়াল ও শখের বশবর্তী হয়ে প্রায়ই তিনি বৈরম খান-এর বিরোধীদের হাতের পুতুল হয়ে পড়তেন। আপাতদৃষ্টিতে, বৈরম খান একটি সংহত ও সমন্বিত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন এবং মুঘল আমিরকুলের দুই প্রধান শরিক চগ্‌তাই ও খোরাসানি [khurasani]-দের একাঙ্গীভূত করেছিলেন ; কিন্তু বেশিরভাগ আমির-ই এহেন পদক্ষেপগুলিকে সন্দেহের চোখে দেখছিলেন। এগুলিকে তাঁরা তাঁদের কর্তৃত্বপ্রয়োগ ও দায়িত্বপালনের স্বাধীনতায় ইচ্ছাকৃত হস্তক্ষেপ হিসাবে দেখছিলেন। বাস্তবিকই, বৈরম খান-এর ব্যবস্থাপনায় আমিরদের ক্ষমতা ও কাজের স্বাধীনতা কিছুটা কমেছিল। এমনকী তাঁর ঘনিষ্ঠ আমিররাও কখনো কখনো কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বাধ্য হতেন।

বৈরম খান-এর উভয় সংকট এটাই ছিল যে, একদিকে তিনি আমিরদের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনক্ষমতা খর্ব করতে চাইতেন, অথচ অন্যদিকে নিজের

ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে ঐ আমিরদেরই কোনো-না-কোনো গোষ্ঠীর উপর নির্ভর করতে হত। এই উভয়সংকট তখন এড়ানোর উপায় ছিল না। ঐ প্রারম্ভিক পর্যায়ে, যখন ভারতে সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপন সম্পূর্ণ হয়নি, মুঘল আমিরদের তৎকালীন গোষ্ঠীগুলিকে সামাল দেওয়ার জন্য আমিরমণ্ডলীতে নতুন লোকজন অন্তর্ভুক্ত করা তখন সম্ভব ছিল না। কোনোমতেই কার্যকর হত না যথেষ্ট সংখ্যায় আফগান সর্দারদের আমিরমণ্ডলীভুক্ত করা কারণ, তারা ছিল প্রকৃতই মুঘলশক্তির প্রতিস্পর্ধী। আর একটিমাত্র শক্তির কথাই এ প্রসঙ্গে বিবেচ্য হতে পারত—রাজপুত সর্দার এবং অন্যান্য জমিন্দার। স্থানীয় সর্দারদের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনে বৈরম খান-এর গভীর আগ্রহ এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য। রাজপুতদের মুঘল আমিরমণ্ডলীতে অন্তর্ভূক্ত করার নীতি উদ্ভাবনের কৃতিত্ব বৈরম খান-এরই প্রাপ্য বলে অবদুল বাকি নহওয়ন্দ্‌ভি মনে করেন।[৬৩]

বৈরম খান হয়ত ভেবেছিলেন রাজপুত সর্দারদের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে মুঘল আমিরদের তৎকালীন গোষ্ঠীগুলিকে সামাল দেওয়া যাবে। কিন্তু প্রক্রিয়াটি বাস্তবায়িত হতে বহুদিন লাগত, অথচ যে-সংকটে তিনি পড়েছিলেন তাতে আশু সমাধান দরকার ছিল। কাজেই তাঁর একমাত্র উপায় ছিল হয় বিরোধীদের কঠোর হাতে দমন করা, আর নাহয় তাদের ঢালাও অনুগ্রহ মঞ্জুর করা। দ্বিতীয় পথটিই তিনি গ্রহণ করায় ১৫৫৮ সালের এপ্রিল মাসে একটি সমঝোতা হয়, কিন্তু পরিণামস্বরূপ, কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব কার্যত পঙ্গু হয়ে পড়ে। এই অবস্থার উদ্ধারকল্পে বৈরম খান যখন বিরোধীদের সঙ্গে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হলেন, তখন তিনি একা, এবং এর মধ্য দিয়েই তাঁর পতন হল।

যে-সংকটের মধ্য দিয়ে বৈরম খান-এর পতন হয় সেটিই সম্ভবত ছিল মুঘল শাসনতন্ত্রের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব ও বিরোধী শক্তিগুলির মধ্যেকার সংঘর্ষের প্রথম পর্ব। বিরোধীরাই সে-পর্বে জিতেছিল। সার্বভৌম ক্ষমতার পুরোপুরি হাতে নেওয়ার পর কেন আকবর ১৫৬২ থেকে ১৫৬৭ পর্যন্ত আমিরমণ্ডলীর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার ব্যাখ্যা হয়ত ঐ ঘটনাক্রম থেকে পাওয়া যাবে।

টীকা

১. মোটামুটিভাবে এই মতই ব্যক্ত করেছেন স্মিথ "ক্যাজেস্ অফ দ্য ফল অফ বৈরম খান" পরিচ্ছেদে ('আকবর দ্য গ্রেট মুঘল', দিল্লি, ১৯৬২, পৃ. ৩২)। এ. এল. শ্রীবাস্তব-এরও একই মত, তবে তিনি আসল দোষ দিয়েছেন বৈরম খান-এর সমভিব্যাহারী "অযোগ্য চাটুকারদের", যারা তাঁর মতে, "উদ্ধত কথাবার্তা বলত, ভুল পরামর্শ দিত, এবং তাঁকে বিদ্রোহে প্ররোচিত করেছিল" ('আকবর দ্য গ্রেট', খণ্ড ১, পৃ. ৪০)। একই প্রসঙ্গে কাজি

মুখতার আহমদ উল্লেখ করেছেন বৈরম খান-এর "মেয়েলি হিংসুকপনা" ও "বুদ্ধির দৈন্যে"র কথা। (তুলনীয়, কাজি মুখতার আহ্মদ, 'ওয়জ্ বৈরম খান এ রেবেল?' ইসলামিক কালচার, জানুয়ারি ১৯৪৭, পৃ. ৫৮, ৬৩)।

২. ভি. এ. স্মিথ-এর যুক্তিকে সমর্থন করে এ. এল. শ্রীবাস্তবও তরদি বেগ-এর ফাঁসিকে "ন্যায়সঙ্গত ও আবশ্যক" বলেছেন। অন্যদিকে, ফন নোয়ার বৈরম খান-এর কাজটিকে নিন্দা করে বলেছেন যে, কাজটি ছিল "তাঁর অবস্থানকে বিপন্ন করতে পারে বলে যাঁকে ভাবতেন" সেই ব্যক্তিটিকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য এক "অনাবশ্যক বর্বরতা।" কাজি মুখ্তার অহ্মদ এই মতটিকে সমর্থন করে বলেছেন : "তরদি বেগ-এর ফাঁসি একটি বোমা-র চেয়ে কম ছিল না, কিন্তু এটি ছিল টাইম-বোমা যা অনেক পরে বিস্ফোরিত হয়েছিল।" এস. কে. রায়-ও দ্বিতীয় মতটির পক্ষে। তুলনীয়, 'আকবর দ্য গ্রেট মুঘল', পৃ. ২৭ ; 'আকবর দ্য গ্রেট', খণ্ড ১, পৃ. ২৭ ; 'দ্য এম্পারার আকবর', খণ্ড ১, এ. এস. বেভারিজ অনূদিত, ১৮৯০, পৃ. ৭৯ ; 'ওয়জ্ বৈরম খান এ রেবেল?" ইসলামিক কালচার, জানুয়ারি ১৯৪৭, পৃ. ৫৯ ; 'দি এক্সিকিউশন অফ তরদি বেগ খান', ইণ্ডিয়ান হিস্টরিকাল কোয়ার্টারলি, জুন ১৯৫২, পৃ. ১৫২।

৩. তুলনীয়, স্মিথ : 'আকরর দ্য গ্রেট মুঘল', পৃ. ৩২—"সদর-উস-সদর [sadr-us-sudur] হিসাবে শেখ গদাই-এর নিযুক্তির ফলে দরবারের সমস্ত সুন্নিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ চাগিয়ে উঠেছিল, এবং তাঁরা অভিযোগ করেছিলেন—এবং এই অভিযোগ অহেতুক ছিল না—যে, বৈরম খান তাঁর নিজের শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত অনুগামীদের অতিরিক্ত সুবিধা দেন।" এই মতটিকে সমর্থন করে আর. পি. ত্রিপাঠি বলেন, "তুর্কি আমিররা সাধারণভাবে এবং আকবরের পালক পিতামাতা বিশেষভাবে" তদারকি-রাজার দুর্দমতম প্রতিপক্ষ ছিলেন। তুলনীয়, 'রাইজ্ অ্যাণ্ড ফল অফ দ্য মুঘল এম্পায়ার', খণ্ড ১, পৃ. ১৭৯।

৪. আবুল ফজল : 'আকবরনামা', খণ্ড ২, মৌলভি অহ্মদ আলি সম্পাদিত, কলকাতা, পৃ. ২৭-৮ ; অহ্মদ য়াদ্গার : 'তারিখ-ই-শাহী', হিদায়ত হুসেন সম্পাদিত, বিব্লোথেকা ইণ্ডিকা সিরিজ, পৃ. ৩৪৯-৫০। আবুল ফজল-এর হিসাবমতো আফগান বাহিনীতে মোট ছিল ৫০০০০ ঘোড়সওয়ার, ১০০০ হাতি, ৫১টি তোপ ও ৫০টি হালকা কামান।

৫. এই আমিরদের জীবনপঞ্জীর জন্য তুলনীয়, শেখ ফরিদ ভক্করি : 'দখিরৎ অল-খওয়ানিন' [Dhakhirat al-khwanin], খণ্ড ১, মইনুল হক সম্পাদিত, করাচি, ১৯৬১, পৃ. ২৪, ২০৯ ; শাহ নওয়াজ খান : 'মআমির-উল-উমরা', আসরফ আলি সম্পাদিত, বিব্লোথেকা ইণ্ডিকা সিরিজ, খণ্ড ১, পৃ. ৪৬৬-৭১, ৬১৫-২২, ৬৩৫-৪৫ ; 'হফ্ৎ-রিসালা-ই-তকওয়িন অল-বলদান' [Haft-Risalah-i-Taqawin al-Baldan]. বোহর সংগ্রহের পাণ্ডুলিপি, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, কলকাতা (বাবর এবং হুমায়ুনের আমিরদের এক প্রামাণ্য ও তথ্যসমৃদ্ধ 'তধ্কিরা' [tadhkira], ১৮শ শতাব্দীর কোনো এক সময়ে সংকলিত) পৃ. ৯৮বি, ১৩১বি, ১৩৯এ, ১৪০বি, ১৫৬বি, ও তৎপরবর্তী।

৬. তুলনীয়, 'দখিরৎ অল-খওয়ানিন' [Dhakhirat al-khwanin], খণ্ড ১, পৃ. ৭৭। শেখ ফরিদ ভক্করি বলেছেন যে, হুমায়ুনের মৃত্যুর পরে শাহ আবুল মালি সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সমসাময়িক কোনো লেখাতেই বিবৃতিটি সমর্থিত হয়নি। আকবরের রাজ্যাভিষেকের সময় শাহ আবুল মালি-র গ্রেপ্তারের বিবরণী দিতে গিয়ে আবুল ফজল বা অবদুল বকি নহওয়ন্দ্ভি, কেউই তাঁর বিরুদ্ধে ও-রকম অভিযোগ উত্থাপন করেননি। তাঁর বাস্তবিক অপরাধ ছিল এই যে, রাজ্যাভিষেকের পরবর্তী উৎসবে তিনি যোগ দিতে চাননি এবং অজুহাত দেখিয়েছিলেন, তখনও তিনি সামলে উঠতে পারেননি। তিনি দরবারে উপস্থিত হতে রাজি হয়েছিলেন কেবল এই প্রতিশ্রুতির পাওয়ার পর যে, সেই সম্মান ও বিশিষ্টতা তাঁকে দিতে হবে যা তিনি হুমায়ুনের আমলে পেয়ে আসছিলেন। ('আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ১৬ ; অব্দুল বকি নহওয়ন্দ্ভি : 'মআমির-ই-রহিমী', হিদায়ত হুসেন সম্পাদিত, বিব্লোথেকা ইণ্ডিকা সিরিজ, খণ্ড ১, পৃ. ৬৪২)।

৭. 'আকবরনামা', খণ্ড ১, পৃ. ৩৬৫ ; নিজামুদ্দিন অহ্মদ : 'তবাকৎ-ই-আকবরী' [Tabaqat-i-Akbari], বি. দে. সম্পাদিত, বিব্লোথেকা ইণ্ডিকা সিরিজ, খণ্ড ২, পৃ. ১২৮ ; 'তারিখ-ই-আল্ফি' [Tarikh-i-Alfi], পাণ্ডুলিপি, ইণ্ডিকা অফিস, এথে, পৃ. ১১২, ৫৮৯বি ; ফৈজি সরহিন্দি : 'আকবরনামা', পাণ্ডুলিপি, ব্রিটিশ ম্যুজিয়াম, মূল ১৬৯ (ফৈজি সরহিন্দি), পৃ. ৭এ। বৈরম খানের সাথে তরদি বেগ-এর শত্রুভাবাপন্ন সম্পর্কের জন্য দেখুন বায়জিদ বয়াৎ : 'তারিখ-ই-হুমায়ুন ওয় আকবর', হিদায়ৎ হুসেন সম্পাদিত, বিব্লোথেকা ইণ্ডিকা (বায়জিদ), পৃ. ২২০-১; 'আকবরনামা', খণ্ড ১, পৃ. ৩৪৪। তুলনীয় 'তারিখ-ই-দিলখুশা', পাণ্ডুলিপি, কেম্ব্রিজ, কিংস, ৭১, পৃ. ৫৩০ বি, ৫৩১ এ, ও তারপরে। ইনায়ৎ-উল্লাহ্ কম্বোহ্-র মতে তরদি বেগ খান-ও ছিলেন 'ওয়কিলৎ'-এর আরেক দাবিদার। তিনি এই বিবৃতি করেছেন তরদি বেগ-এর ফাঁসির কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে। এই ব্যাপারটি পরে ঘটেছে বলে মনে হয়।

৮. 'আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ১৫, 'বায়জিদ', পৃ. ১৯৬।

৯. 'আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ১৬-৭। শাহ্ আবুল মালির জীবনপঞ্জীর জন্য দেখুন 'আকবরনামা', খণ্ড ১, পৃ. ৬১১, ৩৩৪, ৩৫০-১, ৩৫৫, ৩৬৭; বদায়ুনি : 'মুন্ত্খব-উৎ-তওয়ারিখ' [Muntakhab-ut-Tawarikh], খণ্ড ২, বিব্লোথেকা ইণ্ডিকা, নিউ সিরিজ, পৃ. ৯-১০ ; 'দখিরৎ-অল-খওয়ানিন', খণ্ড ১, পৃ. ৭৭-৯ ; 'মআমির-ই-রহিমী' খণ্ড ১, পৃ. ৬১০ ; 'মআমির-উল-উমরা', খণ্ড ৩, পৃ. ৫৫৭-৬০।

১০. তুলনীয়, সিদি আলি রেইজ : 'ট্রাভ্লস্ অ্যাণ্ড অ্যাডভেঞ্চারস্ অফ এ টার্কিশ অ্যাডমিরাল', এ. ভ্যাম্বেরি অনূদিত, লণ্ডন, ১৮৯৯, পৃ. ৫৯-৬৬। আকবর-এর সিংহাসনারোহণের কয়েকদিনের মধ্যেই বাপুস বেগ এবং আরও চারজন অফিসারকে সৈন্যসহ কাবুলে পাঠানো হয়। শাহ আবুল মালি-র গ্রেপ্তারের খবর এঁরাই মুনিম বেগ-কে পৌঁছে দেন। এই বাহিনী কাবুলে পৌঁছয় জুমদা ১, ৯৬৩ হিজরি-র প্রথমদিকে অর্থাৎ মার্চের তৃতীয় সপ্তাহ, ১৫৫৬ নাগাদ।

১১. তুলনীয়, 'আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ১৬ ; এবং 'বায়জিদ', পৃ. ২০৭।

আকবর-এর সিংহাসনারোহণকালে (ফেব্রুয়ারি ১৫৫৬) তুলক খান ক্যুচিন দরবারে উপস্থিত ছিলেন। দরবারে তাঁর ক্ষমতা শাহ্ আবুল মালি-র চেয়ে বেশি ছিল। তিনি কাবুলে এসেছিলেন মে, ১৫৫৬-র কিছু আগে কারণ, মির্জা সুলেইমান-এর কাবুল আক্রমণের সময় আমরা তাঁকে সেখানে উপস্থিত থাকতে দেখি।

১২. 'আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ৫, ১৫; 'তারিখ-ই-আল্‌ফি', পৃ. ৬০০ এ; ফৈজি সরহিন্দি, পৃ. ৮ এ। আমার গবেষণাপত্রটিও দেখুন 'ওয়জিরৎ আণ্ডার হুমায়ুন', মিডিয়েভ্‌ল ইণ্ডিয়া কোয়ার্টারলি, খণ্ড ৫, সংখ্যা ১।

১৩. 'আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ১৭।

১৪. দুজনকেই 'খান'-এর পদমর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। এই ব্যাপারটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ যে, আকবর-এর সিংহাসনারোহণের সময় কেবলমাত্র ঐ দুই আমির-কেই ওহেন সম্মান দেওয়া হয়েছিল। অন্যান্যদের পুরস্কৃত করা হয়েছিল পানিপথ-এর যুদ্ধের পর। 'বায়জিদ', পৃ. ১৯৫; 'আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ৪৫; ফৈজি সরহিন্দি, পৃ. ৭ এ। তুলনীয় কেওয়ল রাম: 'তজ্‌কিরৎ-উল-উমরা', পাণ্ডুলিপি, হবিবগঞ্জ সংগ্রহ, মৌলানা আজাদ লাইব্রেরি, আলিগড়, পৃ. ১১৪ বি। মুনিম খান-এর পুত্র গণি খান-কেও 'খান' উপাধি দেওয়া হয়েছিল।

১৫. আবুল ফজল ঐ আক্রমণের কালনির্দেশ করেছেন প্রথম দিব্য বর্ষের (১০ মার্চ, ১৫৫৬ থেকে যার আরম্ভ) বসন্তকালে। বায়জিদ-ও বসন্তকালের (নৌনাহ্ [naunah]) কথাই বলেছেন। আক্রমণের খবর শাহী শিবিরে পৌঁছেছিল জলন্ধর-এ, ১৫৫৬-র মে মাসের শেষদিকে। সিদি আলি রেইজ-এর বিবরণী থেকে এটা স্পষ্ট যে, ১৫৫৬-র এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত মির্জা সুলেমান আফগানিস্তানে ঢুকতে পারেননি। অবরোধ যেহেতু চার মাসের মতো ছিল, এবং নিশ্চিতভাবেই তুঘলকাবাদ-এর যুদ্ধের (৬ অক্টোবর, ১৫৫৬) আগে তুলে নেওয়া হয়েছিল, সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, মির্জা সুলেমান-এর আক্রমণ হয়ে থাকবে ৬ জুন, ১৫৫৬-র আগে। এ-থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, আক্রমণ হয়েছিল মে, ১৫৫৬-তে। ('আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ২১, ২২, ৩১, ৫৪; সিদি আলি রেইজ, পৃ. ৬৬, বায়জিদ, পৃ. ১৯৭, ২১০, 'তারিখ-ই-আল্‌ফি', পৃ. ৫৯১ বি)।

১৬. তুলনীয়, 'আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ২৪। কাবুলে মির্জা সুলেমান-এর আক্রমণের খবর পাওয়ামাত্র আকবর ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন মুনিম খান-এর শক্তিবৃদ্ধি করার জন্য সেনা পাঠাতে, কিন্তু 'কিছু ব্যক্তি' তাতে বাধা দিয়েছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল এই যে, সম্ভ্রান্ত মহিলাদের সঙ্গে যে-সমস্ত আমিরকে কাবুলে পাঠানো হয়েছে, তাঁরাই ব্যাপারটা সামলাতে পারবেন। 'ভারতে গুরুতর পরিস্থিতি'র উল্লেখও তাঁরা করেছিলেন, যদিও সে-সময় ভারতে কোনো বড় অভিযান চলছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

১৭. 'আকবরনামা', খণ্ড পৃ. ২, ২৯—"ভীরুরা ভয় পেয়ে এবং সাহসীরা সাবধানী হয়ে" যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে চাইছিল।

১৮. তুলনীয়, 'আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ২৯, ৩০। এ-সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছেন আবুল ফজল-ও। উল্লেখ করেছেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পীর মুহম্মদ-এর সর্বাগ্রে পলায়নের কথাও।

১৯. তরদি বেগ-এর অনুগামীদের মধ্যে মুখ্যত উল্লেখ আছে খওয়াজা সুলতান আলি, মীর আসগর মুন্‌শি, খঞ্জর বেগ, বল্‌তু বেগ, মজনুন খান ক্যাক্‌শল, হায়দার মুহম্মদ খান অখ্‌তা বেগী, কাসিম মুখ্‌লিস, আলি দোস্ত বর বেগী, হায়দার বখ্‌শী প্রমুখের (তুলনীয় 'আকবরনামা', খণ্ড ১, পৃ. ৩৪৪; খণ্ড ২, পৃ. ২০, ২৯)। আপাতদৃষ্টিতে, এই আমিরদের অধিকাংশেরই জাগির ছিল দোয়াব এবং মেওয়াত্‌-এর সেই অঞ্চলগুলিতে, তরদি বেগ খান যেগুলির তত্ত্বাবধান করতেন দিল্লি থেকে। তুঘলকাবাদে মুঘলদের পরাজয়ের ফলে ঐ অঞ্চলটা পুরোপুরিই আফগানদের হাতে চলে গিয়েছিল।

২০. তুলনীয় 'আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ৩২; 'তারিখ-ই-হাজি কান্দাহারি', রামপুর পাণ্ডুলিপির আলিগড় প্রতিলিপি, পৃ. ৪৫; 'বায়জিদ', পৃ. ২২০; 'তারিখ-ই-আল্‌ফি', পৃ. ৫৯১ বি; 'তারিখ-ই-ফরিশ্‌তা', খণ্ড ১, নওল কিশোর, পৃ. ২৪৫। বদায়ুনি-র বিবৃতিটিতে (খণ্ড ২, পৃ. ১৪)—যে, তরদি বেগ-কে ফাঁসি দেওয়ার জন্য আকবরের "একপ্রকার অনুমতি" নিয়েছিলেন বৈরম খান—সম্ভবত কাজটি হয়ে যাওয়ার পরে অনুমোদন আনিয়ে নেওয়ার কথাই বলা হয়েছে। অহ্‌মদ য়াদগার-এর বক্তব্য—যে, স্বয়ং রাজার আদেশবলেই তরদি বেগ-কে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল ('তারিখ-ই-শাহী', পৃ. ৩৫৪-৫)—ঠিক মেনে নেওয়া যায় না কারণ, সমসাময়িক সব লেখকই অন্য কথা বলেছেন। এস. কে. রায় : 'দি এক্সিকিউশন অফ তরদি বেগ', জার্নাল অফ ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি, জুন ১৯৫২, পৃ. ১৫৪ দ্র। তুলনীয় 'মআসির-ই-রহিমী', খণ্ড ১, পৃ. ৬৪৯-৫০। এখানে একটি কৌতূহলজনক পরিচ্ছেদ আছে, বৈরম খান ও তরদি বেগ-এর ধর্মভক্তি সম্পর্কে। পরিচ্ছেদটির আক্ষরিক অনুবাদ এইরকম : "(কিছু অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি) যারা এই বিশ্বাসঘাতকের প্রতি অন্ধভক্তিকেই তাদের ধর্মের অন্যতম পালনীয় বলে মনে করত, তারাই ছিল বৈরম খান-এর উচ্ছেদকামী দল।" আপাতদৃষ্টিতে, এই অস্পষ্ট বক্তব্যের ভিত্তিতেই 'মআসির-উল-উমরা'র লেখক (খণ্ড ১, পৃ. ৪৭০) সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ধর্মীয় গোঁড়ামি তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণে একটি অতিরিক্ত ভূমিকা পালন করেছিল। ব্লকম্যান ('আইন-ই-আকবরী'-র অনুবাদ, খণ্ড ১, পৃ. ৩৩৫) বিনা বিতর্কে এই ব্যাখ্যা মেনে নিয়েছেন।

২১. 'তারিখ-ই আল্‌ফি', পৃ. ৫৫২এ; তুলনীয় 'তারিখ-ই-শাহী', পৃ. ৩৫৫। অহ্‌মদ য়াদগার-ও একই ইঙ্গিত করেছেন।

২২. 'তারিখ-ই-হাজি অরিফ কান্দাহারি', পৃ. ৪৫।

২৩. এই প্রকার দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন খওয়াজা সুলতান আলি ও মীর আসগর মুন্‌শি। ব্লকম্যান-কর্তৃক স্বীকৃত ('আইন-ই-আকবরী'-র অনুবাদ, খণ্ড ১, পৃ. ৪০৮) 'মআসির-উল-উমরা'র বিবৃতিটি—যে, ঐ দুই অফিসারও, পীর মুহম্মদ খান-এর সঙ্গে, তরদি বেগ-এর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন (যে শত্রুতার আরেকটি কারণ হিসাবে ব্লকম্যান তাদের খোরাসানি [khurasani] বংশপরিচয়ের কথা বলেছেন) ছিলেন—'আকবরনামা'র একটি পরিচ্ছেদের (খণ্ড ২, পৃ. ২৯) ভ্রান্ত ব্যাখ্যা বলেই মনে হয়। ওখানে কেবলমাত্র পীর মুহম্মদ খান-কেই তরদি বেগ-এর বৈরী বলা হয়েছে। আবুল ফজল-এর মতে (ওখানেই, পৃ. ৩২) ঐ দুজনকে উৎকোচগ্রহণ ও বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। 'তারিখ-ই-আল্‌ফি' (পৃ. ৫৫২ এ) এবং

বদায়ুনি (খণ্ড ২, পৃ. ১৪)-র বিবৃতি অনুযায়ী বৈরম খান সন্দেহ করেছিলেন ঐ দুজন তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। মুহম্মদ খান ('ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গিরী', নওল কিশোর, পৃ. ১৩৩) স্পষ্টতর ভাষায় বলেছেন : কারারুদ্ধ আমিররা তরদি বেগ-এর দৃঢ় সমর্থক ছিলেন।

২৪. তুলনীয় 'বায়জিদ', পৃ. ২১৩, ২১৮, ২২১ ; এবং 'আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ৩১-২, ৩৮, ৪২। পানিপথ-এ মুঘল বিজয়ের খবর নিয়ে শাহী দূত যখন কাবুলে পৌঁছয়, মুনিম খান ও তাঁর অধীনস্থরা তখনও তরদি বেগ-এর ফাঁসির খবর জানতেন না। ঐ দূতটিও, মনে হয়, সে-কথা তাঁর কাছে প্রকাশ করেনি। তিনি খবরটি পেয়েছিলেন আরো একমাস পরে বৈরম খান-এর পত্র মারফৎ। এ-থেকেই মনে হয় যে, খবরটি সরকারিভাবে ততদিন পর্যন্ত ঘোষিত হয়নি। ফাঁসি ও তার পরবর্তী ঘটনাবলীর খবর ও সেগুলি নিয়ে বিভিন্ন কাহিনী নিশ্চয়ই মুখে মুখে চালু হয়ে গিয়েছিল, এবং আফগানিস্থানেও পৌঁছেছিল, কিন্তু সেখানকার অফিসাররা দরবারের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে এতটাই অনবহিত ছিলেন যে, ঐ গুজবে বিশেষ কান দেননি।

২৫. তরদি বেগ-এর এক ভ্রাতুষ্পুত্র মুক্যিম খান (পরবর্তীকালে শুজাত খান) তখন কাবুলে ছিলেন। তরদি বেগ-এর ভালোমন্দ দেখাশোনার জন্য তিনি আফগানিস্তানে রয়ে গিয়েছিলেন। তরদি বেগ-এর আরেক আত্মীয় বনু্তু বেগ-ও কাবুলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এসেছিলেন সম্ভবত মির্জা সুলেমান-এর কাবুল আক্রমণের কিছু আগে। তুলনীয় 'আকবরনামা', খণ্ড ১, পৃ. ৩৫৪ ; 'বায়জিদ', পৃ. ২৪ ; এবং 'তবাকৎ-ই-আকবরী', খণ্ড ২, পৃ. ১৪৮।

২৬. সিকন্দর খান উজবেক, অবদুল্লা খান উজবেক, আলি ক্যুলি খান উজবেক, হুসেন ক্যুলি খান এবং শাহ ক্যুলি খান মরহম ছিলেন পানিপথ-এর বাহিনীর পার্শ্বরক্ষী সেনাপতি। প্রথম তিনজন ছিলেন একই পরিবারভুক্ত। অবদুল্লা খান ছিলেন আলি ক্যুলি খান-এর পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ('আকবরনামা', খণ্ড ১, পৃ. ১৪২ ; 'বায়জিদ', পৃ. ৮৭)। তাঁদের এবং সিকন্দর খানের মধ্যে ঠিক কী আত্মীয়তা ছিল জানা যায় না। পরবর্তী কর্মজীবনে অবশ্য দেখা যায় যে, বরাবরই তাঁরা একটি সুসম্বদ্ধ আমির-পরিবার হিসাবে একত্রে কাজ করেছেন (তুলনীয় 'আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ২২১-৯৯। ১৫৬৫-৬৭-তে উজবেক অফিসারদের বিদ্রোহের বিবরণী)। বৈরম খান এবং উজবেক আমিরদের মধ্যে সহযোগিতার নিদর্শনের জন্য দেখুন বদায়ুনি, খণ্ড ২, পৃ. ১৪ ; 'আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ৪৫, ৬৯, ৮২, ৯৭, ১০৫-৬, ১১৪ ; তুলনীয় 'তারিখ-ই-ফরিশ্‌তা', খণ্ড ১, পৃ. ২৪৭-৮ ; খাফী খান : 'মুন্তখব-অল-লুবাব', আশ্‌রফ আলি সম্পাদিত, বিব্লোথেকা ইণ্ডিকা সিরিজ, খণ্ড ১, পৃ. ১৩৮-৯, ১৪৫। অন্য দুজন, হুসেন ক্যুলি এবং শাহ ক্যুলি খান মরহম ছিলেন বৈরম খানের ব্যক্তিগত অনুচর ও ঘনিষ্ঠ অনুগামী, এবং এঁরা শেষপর্যন্ত তাঁর পাশে ছিলেন। তুলনীয় 'আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ৩৩, ১০৪ ; 'দখিরৎ অল-খওয়ানিন', খণ্ড ১, পৃ. ১৮৯, ২০৯।

২৭. আলি ক্যুলি খান উজবেক-কে 'খান-ই-জমান' উপাধি দেওয়া হয়, এবং সম্বল ও দোয়াব-এর অন্যান্য পরগনার 'সরকার' নিযুক্ত করা হয়। অবদুল্লা

খান উজবেক-কে 'শুজাত খান' উপাধি দেওয়া হয়, এবং কল্পী-র 'সরকার' নিযুক্ত করা হয়।

সিকন্দর খানকে 'খান-ই-আলম' উপাধি দেওয়া হয়, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শিয়ালকোট-এ নিযুক্ত করা হয় খিজর খওয়াজা খান-কে সিকন্দর শুর-এর বিরুদ্ধে সাহায্য করার জন্য।

মৌলানা পীর মুহম্মদ-কে 'নাসির-উল-মুল্ক্' উপাধি দেওয়া হয় এবং রাজার ব্যক্তিগত পার্ষদ হিসাবে নিযুক্ত করা হয়, সম্ভবত তদারকি রাজার 'ওয়কিল' পদাধিকারে।

কিয়া খান-কে আগ্রায় নিযুক্ত করা হয়। তুলনীয় 'আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ৪৫, ৪৭, ৩০।

২৮. পানিপথ-এর যুদ্ধের পর আলি ক্যুলি খান উজবেক, কিয়া খান, অবদুল্লা খান উজবেক, পীর মুহম্মদ খান ও মুহম্মদ কাশিম নিশাপুরী যথাক্রমে সম্বল, আগ্রা, কল্পী, আলওয়ার এবং আজমীর-এর অভিযানে নেতৃত্ব দেন। তুলনীয় 'আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ৪৫-৬, ৩৩।

২৯. তিনি ছিলেন কাশগার-এর মুঘল শাসকদের বংশধর। আমির হিসাবে তাঁর পদমর্যাদা যথেষ্ট বেশিই ছিল যেহেতু তিনি রাজপরিবারের আত্মীয়, এবং উপরন্তু তিনি ছিলেন আমির-উল-উমরা উপাধিধারী। তুলনীয় 'দখিরৎ অল্-খওয়ানিন', খণ্ড ১, পৃ. ২০৯ ; 'মআসির-উল-উমরা, খণ্ড ১, পৃ. ৬১৩-৫ ; 'হফ্ৎ-রিসালা-ই-তক্ওয়িম-অল্-বলদান', পৃ. ২৪৬ বি।

৩০. 'আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ৪৭। বৈরম খান-এর আরেক বিশ্বস্ত ব্যক্তি শাহ ক্যুলি নারজি ঐ সময় পাঞ্জাবে উপস্থিত ছিলেন। হাজি মুহম্মদ খান ও শাহ ক্যুলি নারজি যে বৈরম খানের অনুগত এবং আস্থাভাজন ছিলেন সে-সম্পর্কে 'বায়জিদ', পৃ. ১৮৬ দ্র ; 'দখিরৎ অল্-খওয়ানিন', খণ্ড ১, পৃ. ২৩১ ; 'মআসির-উল-উমরা', খণ্ড ১, পৃ. ৫৪৮-৫১।

৩১. তিনি তখন শিয়ালকোট-এ নিযুক্ত ছিলেন। তুলনীয় 'আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ৪৭।

৩২. 'আকবরনামা' খণ্ড ২, পৃ. ৫৪. কাবুল থেকে সম্ভ্রান্ত মহিলাদের নিয়ে আসার জন্য মহম্মদ ক্যুলি খান-কে পাঠানো হয়েছিল।

৩৩. বদায়ুনি-র বিবরণী (খণ্ড ২, পৃ. ১৪) থেকে মনে হয়, ঐ দুজন অক্টোবর ১৫৫৬ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কোনো-না-কোনো পদে নিযুক্ত ছিলেন। বৈরম খান-এর 'ওয়কিলৎ' পদোন্নতির পর খওয়াজা সুলতান আলির 'ওয়জির' পদচ্যুতি সম্পর্কে দ্র প্রাগুক্ত ; এবং আমার গবেষণাপত্র 'ওয়জিরৎ আণ্ডার হুমায়ুন', মিডিয়েভ্ল ইণ্ডিয়া কোয়ার্টারলি, খণ্ড ৫, সংখ্যা ১।

৩৪. পীর মুহম্মদ খান-এর পূর্ববৃত্তান্তের জন্য তুলনীয় 'দখিরৎ অল্-খওয়ানিন', খণ্ড ১, পৃ. ১০১-৩ ; 'মআসির-উল-উমরা', খণ্ড ৩, পৃ. ১৮২-৬ ; 'আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ২৯। পানিপথ-এর যুদ্ধের পর তিনি রাজার পার্শ্বচর হিসাবে নিযুক্ত হলেন।

৩৫. খওয়াজা আমিন-উদ্দিন মহমুদ-এর পূর্ববৃত্তান্তের জন্য দ্র 'মআসির-উল-উমরা', খণ্ড ১, পৃ. ৬৩০। তুলনীয় 'আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ৯৬। তিনি ছিলেন বৈরম খান-এর সেই বিশ্বস্ত অনুচরদের অন্যতম যাদের পাঠানো হয়েছিল তদারকি-রাজার মনোভাব সম্পর্কে আকবর-এর আশঙ্কা দূর করার জন্য।

৩৬. বৈরম খান 'ওয়কিলৎ' পাওয়ার পরে পরেই শেখ গদাই-কে 'সদারৎ'-এ নিযুক্ত করা হল, আপাতত ঐ পদাসীন মৌলানা অব্দুল বকি-কে সরিয়ে ('আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ২০ ; 'মআসির-উল-উমরা', খণ্ড ২, পৃ. ২৯)। স্মিথ এবং আরো কয়েকজন আধুনিক গবেষক বলেন যে, এই নিয়োগ হয়েছিল রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে ; এই অনুমান মনে হয় ভুল। এঁরা গদাই-কে দৃঢ় শিয়ামতাবলম্বী বলেছেন, এবং এই নিয়োগ নাকি "কট্টর সুন্নি সভাসদ্‌দের চূড়ান্ত আঘাত" করেছিল ('আকবর দ্য গ্রেট মুঘল', পৃ. ৩১ ; আর. পি. ত্রিপাঠি : 'রাইজ অ্যাণ্ড ফল অফ দ্য মুঘল এম্পায়ার', খণ্ড ১, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ১৭৯ ; এস. আর. শর্মা : 'দ্য রিলিজিয়াস পলিসি অফ দ্য মুঘল এম্পারারস্', প্রথম সংস্করণ, পৃ. ১৮ ; এ. এল. শ্রীবাস্তব : 'আকবর দ্য গ্রেট', খণ্ড ১, পৃ. ৪১)। সমসাময়িক ইতিহাসবিদ্‌রা মতটিকে কোথাও সমর্থন করেননি। বরং বদায়ুনি যেভাবে (খণ্ড ৩, পৃ. ৭৬) ধর্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপারে গদাই-এর জ্ঞান ও গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন তাতে মনে হয়, গদাই-এর ধার্মিক দৃষ্টিভঙ্গি কোনোভাবেই সুন্নিদের আহত করেনি। আপাতদৃষ্টিতে, উপরোক্ত ভ্রান্ত ব্যাখ্যাটির উৎস সম্ভবত 'মআসির-ই-রহিমি' (খণ্ড ১, পৃ. ৬৪৯-৫০) ; 'দখিরৎ অল্-খওয়ানিন' (খণ্ড ১, পৃ. ৬২) ; 'মুণ্ডখব অল্ লুবার' (খণ্ড ১, পৃ. ১৩৮) এবং 'মআসির-উল-উমরা' (খণ্ড ১, পৃ. ৪৭০, অনুবাদ খণ্ড ১, পৃ. ৬৩) ইত্যাদিতে শিয়া ধর্মমতের প্রতি বৈরম খান-এর ঝোঁক সম্পর্কে উল্লেখ।

৩৭. তুলনীয় বায়জিদ, পৃ. ২২০। তরদি বেগ-এর ফাঁসির খবরটা যেভাবে মুনিম খান-কে, ঘটনার প্রায় তিন মাস বাদে, দেওয়া হয়েছিল তাতে মনে হয়, বৈরম খান চেয়েছিলেন তাঁকে—যিনি ঐ সময় হিন্দুস্থানের দিকে আসছিলেন —ভয় পাইয়ে কাবুলে ফেরৎ পাঠাতে। খওয়াজা জলাল-উদ্দিনকে দরবার থেকে দূরে রাখার জন্য বৈরম খান-এর উদ্বেগ সম্পর্কে 'আকবরনামা', পৃ. ৭০-১, ৭৮ দ্র। আবুল ফজল-এর মতে খওয়াজা জলাল-উদ্দিন হিন্দুস্থানে বৈরম খানের সর্বময় কর্তৃত্ব দেখে আফগানিস্তানেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

৩৮. তুলনীয় 'আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ৫৫, ৬৬, ৯৫। কাবুল থেকে ফিরে আসার পরেই অত্‌কা খান-কে ভীর-এ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল (এপ্রিল, ১৫৫৭), এবং বৈরম খান-এর শাসনকালের বাকি সময়টা তিনি সেখানেই ছিলেন।

৩৯. উত্তরোক্ত।

৪০. বায়জিদ, পৃ. ১৭৭।

৪১. 'আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ৫৭। আবুল ফজল কোথাও সেই ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেননি যিনি প্রস্তাবটি দিয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমিক নজির থেকে প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মুখ্য ভূমিকা হমিদা বানু বেগম-ই নিয়েছিলেন। অন্য কারও পক্ষেই বৈরম খান-এর কড়াকড়ির মধ্য দিয়ে প্রস্তাবটি পৌঁছনো সম্ভব ছিল না।

৪২. 'তারিখ-ই-আল্‌ফি', পৃ. ৫৯২ এ।

৪৩. তুলনীয় আর. পি. ত্রিপাঠি : 'আকবর অ্যাণ্ড মহম অনাগা', জার্নাল অফ ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি, খণ্ড ১, ১৯২২, পৃ. ৩২৯-৩২। তিনি এই মতপ্রকাশ

করেছেন যে, মহিলারা ছিলেন নবীন রাজার হাতের পুতুলমাত্র, আকবর নিজেই বৈরম খান-এর প্রভাবমুক্ত হতে চাইছিলেন। কিন্তু হামিদা বানু ও মহম অনাগা বৈরম খান-এর প্রথম বিরুদ্ধাচরণ করেন এপ্রিল-আগস্ট, ১৫৫৭ নাগাদ, যখন আকবর নেহাৎই অল্পবয়স্ক (খুব বেশি হলে ১৫ বছরের)।

৪৪. 'আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ৬০-২ ; 'মআসির-ই-রহিমী', খণ্ড ১, পৃ. ৬৫৭। আবুল ফজল-এর এই অনুমান স্বীকার করা মুশ্‌কিল যে, মানকোট-এ বৈরম খান-এর উপর হাতি চালিয়ে দেওয়াটা নিছকই দুর্ঘটনা! বৈরম খান নিজে অন্ততঃ নিশ্চিত ছিলেন যে, তাঁকে হত্যা করারই ষড়যন্ত্র ছিল সেটি।

৪৫. 'আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ৬৪-৫।

৪৬. 'তারিখ-ই-হাজি আরিফ কন্দাহারি', পৃ. ৪৮ ; 'আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ৫৬, ৫৭।

৪৭. মানকোট দখল হয় ৭ রমজান, ৯৬৪ হিজরি অর্থাৎ ৪ জুলাই, ১৫৫৭-তে। শাহী শিবির লাহোরে পৌঁছয় ১২ শওয়াল, ৯৬৪ হিজরি অর্থাৎ ৮ অগাস্ট, ১৫৫৭-তে ; লাহোর ছেড়ে দিল্লি রওনা হয় ১২ সফর, ৯৬৫ হিজরি অর্থাৎ ৭ ডিসেম্বর, ১৫৫৭-তে ; এবং দিল্লি পৌঁছয় পাঁচ মাস পরে ২০ জুমদা ১, ৯৬৫ হিজরি অর্থাৎ ১৪ এপ্রিল, ১৫৫৮-তে। তুলনীয় 'আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ৫৯, ৬১, ৬৪-৫।

৪৮. 'আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ৬৭।

৪৯. তুলনীয় 'আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ৬৯। আলি ক্যুলি খান-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণ, এবং তাঁকে রক্ষা করায় বৈরম খান-এর ব্যর্থতাই বুঝিয়ে দেয় ঘটনার গতি কোন্‌দিকে ছিল।

৫০. 'আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ৮৬-৭। তুলনীয় 'মআসির-উল-উমরা', খণ্ড ২, পৃ. ৫৪০। দরবারি আদেশের পিছনে গদাই নিজের সিলমোহর লাগিয়ে দিতেন।

৫১. পদচ্যুতির পর বৈরম খান-এর নামে একটি শাহী ফরমান-এ তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছে নিজের অনুগামীদের অন্যান্য পদোন্নতি করানোর, এবং প্রবীণ ও রাজভক্ত আমিরদের দাবি অগ্রাহ্য করার ('আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ১০৬)। পূর্বতন কিছু তথ্য উদ্ধৃত করে ফরিদ ভক্করি বলেছেন যে, বৈরম খান অন্ততঃ পঁচিশ জনকে পাঁচহাজারী 'খান'-এর পদে উন্নীত করেছিলেন ('দখিরৎ অল-খওয়ানিন', খণ্ড ১, পৃ. ১৭ ; আরও দেখুন 'মআসির-ই-রহিমী', খণ্ড ২, পৃ. ৬০)।

৫২. 'আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ৮২, ৮৭, ৮৯.

৫৩. ইদানীং তাদের উপহাস ও বদনাম করা হচ্ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারে হাজি মুহম্মদ সিস্তানি-র নিযুক্তি প্রসঙ্গে একটি ব্যঙ্গোক্তি মুখে মুখে চালু হয়ে গিয়েছিল : "কুত্তা হয়েছে মেঠাইওয়ালা।" শেখ গদাই-কে বিদ্রূপ করে ছড়া বেঁধেছিলেন মীর সৈয়দ রসুলি, এবং তা গদাই-এর বাড়ির দেয়ালে লেখা হয়েছিল (বদায়ুনি, খণ্ড ২, পৃ. ২৯)।

৫৪. শেখ গদাই ও হাজি মুহম্মদ সিস্তানি ছাড়া সমালোচনার লক্ষ্যব্যক্তি ছিলেন কিয়া খান গঙ, শাহ ক্যুলি খান নারঙ্গি এবং মুহম্মদ তাহির। তুলনীয় 'আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ১০৬-৭।

৫৫. রাজহস্তীর মাহুতকে ফাঁসি দেওয়ার (১৫৫৯) ধরন থেকেই এটা বোঝা যায়। তুলনীয় 'আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ৯২।

৫৬. কিয়া খান গঙ ও মিহর্ আলি সিল্‌দোজ-এর মতো কয়েকজন চগ্‌তাই আমির শেষদিন পর্যন্ত বৈরম খান-কে সাথ দিয়েছেন। বৈরম খান-এর অনুগামীদের মধ্যে আরো ছিলেন, সম্ভবত, তুরানিরা, যেমন, তরসুন মুহম্মদ খান, মুহম্মদ কাসিম খান নিশাপুরী, হুসেন খান তুকোরিয়া। এঁরা ছাড়াও ছিলেন উজবেক আমির-রা বাহ্যত, শিয়া ও সুন্নি উভয় তরফেরই। তাঁদের কেউ কেউ যেমন, আলি ক্যুলি খান উজবেক ও তাঁর ভ্রাতা বাহাদুর খান উজবেক ছিলেন সর্বপ্রকারে খোরাসানি [khurasani] কারণ, তাঁরা প্রতিপালিত হয়েছিলেন ইরানে; কিন্তু এমন অন্যান্যরাও ছিলেন যাঁরা অবদুল্লা খান উজবেক ও সিকন্দর খান উজবেক-এর মতো সমগ্র কর্মজীবনটাই ব্যয় করেছেন তৈমুরদের পরিষেবায়, এবং আপাতদৃষ্টিতে, যাঁদের সঙ্গে খোরাসান [khurasan]-এর কোনো বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। তুলনীয় 'তারিখ-ই-হাজি অরিফ কান্দাহারি', পৃ. ৫১; বায়জিদ, পৃ. ৩৬; 'আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ৪৮, ১১৩; 'তারিখ-ই-আল্‌ফি', পৃ. ৬১০ বি; 'তবাকৎ-ই-আকবরী', খণ্ড ২, পৃ. ৪৪৫; বদায়ুনি, খণ্ড ২, পৃ. ২৫-৬, ৩২, ৩৮, ৪১; 'দখিরৎ অল-খওয়ানিন', খণ্ড ১, পৃ. ২১১; 'মআসির-ই-রহিমী', খণ্ড ২, পৃ. ৬০; 'মুন্তখাব অল-লুবাব', খণ্ড ১, পৃ. ১৩৮; 'মআসির-উল-উমরা', খণ্ড ১, পৃ. ৫৫১-৪, ৪৭১-৫; খণ্ড ২, ৫০৩-৫; খণ্ড ৩, পৃ. ৫৪-৬; ব্লকম্যান, 'আইন-ই-আকবরী', অনুবাদ খণ্ড ১, পৃ. ৩৬৪, ৩৬৬, ৩৭৯, ৪০২, ৪৮১, ৪৮৪।

৫৭. তুলনীয় 'আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ১১৭। বজওয়ারা-য় আকবর-এর কাছে আত্মসমর্পণ করার আগে বৈরম খান রাজার কাছে একটি বার্তা পাঠিয়েছিলেন এই বলে যে, চগ্‌তাই আমির-দের মনোভাবে তিনি শঙ্কিত, এবং দুর্গ থেকে বাইরে আসার আগে তিনি ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সম্পর্কে মুনিম খান-এর আশ্বাস চান। এ-থেকে প্রকট হয়ে ওঠে যে, ১৫৬০-এ চগ্‌তাই আমিরদের একটি বড় অংশ বৈরম খান-এর বিপক্ষে চলে গিয়েছিল।

৫৮. বৈরম খান-এর শিয়া ধর্মমতে বিশ্বাস সম্পর্কে তুলনীয় 'মআসির-ই-রহিমী', খণ্ড ১, পৃ. ৬৪৯-৫০; 'দখিরৎ অল-খওয়ানিন', খণ্ড ১, পৃ. ৬২; 'মআসির-উল-উমরা', খণ্ড ১, পৃ. ৪৭০; অনুবাদ খণ্ড ১, পৃ. ৬৩; খাফি খান: 'মুন্তখব অল-লুবাব', খণ্ড ১, পৃ. ১৩৮, ১৪৭-৮। এটা জোর দিয়ে বলা হয় যে, বৈরম খান-এর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত উদার, এবং তিনি সব সম্প্রদায়ের সাথেই মেলামেশা করতেন। কয়েকজন তুরানি আমির, যাঁরা অধিকাংশতই ছিলেন সুন্নি, তাঁরা যে তদারকি-রাজত্বের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর পাশে ছিলেন, এই তথ্য উপরোক্ত মতটিকেই সমর্থন করে। এঁদের মধ্যে একজন, হুসেন খান তুকোরিয়া—মেহদী কাসিম খান-এর ভ্রাতুষ্পুত্র—সম্পর্কে বদায়ুনি স্পষ্ট বলেছেন যে, তিনি সুন্নি ছিলেন। খাফি খান (খণ্ড ১, পৃ. ১৪৭-৮) একটি চিঠির প্রতিলিপি দিয়ে বলেছেন সেটি বৈরম খান কর্তৃক আকবরকে লেখা। কিছু গোঁড়া সুন্নি ধর্মতাত্ত্বিক পুরো বিতর্কটাতেই ধর্মীয় রঙ চড়াতে চাইছেন—চিঠিটা পড়ে এ-কথা মনে হতে পারে। কিন্তু চিঠির ভাষার ওজস্বিতা—যা পুরো ব্যাপারটাকে নাটকীয় করে তুলেছে—

তাতে মনে হয়, চিঠির বেশিরভাগটাই খাফি খান-এর আপন কল্পনাপ্রসূত। দ্রষ্টব্য, পূর্বোক্ত, বৈরম খান-এর চগ্‌তাই ও তুর্কি অনুগামী সম্পর্কে টীকা।

৫৯. গদাই শিয়া ছিলেন এমন নজির কোথাও নেই। বরং, বদায়ুনি (খণ্ড ৩, পৃ. ৭৬) যেভাবে গদাই-এর ধর্মবিষয়ক জ্ঞানের প্রশংসা করেছেন তাতে তাঁর ধর্মবিশ্বাসে আপত্তিকর কিছু ছিল না বলেই মনে হয়। তাছাড়া, গদাই-এর পিতা শেখ জমালি—সোহরওয়র্দির এক অনুগামী—নিশ্চিতভাবেই সুন্নি মতাবলম্বী ছিলেন। এ-সমস্ত ইঙ্গিত করে যে, শেখ গদাই নিজেও হয়ত সুন্নি ছিলেন। তুলনীয় 'আকবর-উল-আখিয়ার' [Akbar-ul-Akhyar], মুহম্মদ অবদুল অহ্‌মদ সম্পাদিত, দিল্লি, পৃ. ২২৭-৯; 'মআসির-উল্‌-উমরা', খণ্ড ২, পৃ. ৫৩৯-৪১।

৬০. 'আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ৯৫। তুলনীয় আলা-উদ্দৌলা ক্যজ্বিনি: 'নফাইস-উল-মআসির', পাণ্ডুলিপি, ব্রিটিশ ম্যুজিয়াম, মূল ১৭৬১, পৃ. ৪৫ বি—"যেইমাত্র রাজা আগ্রা ছেড়ে চললেন, তখুনি সমস্ত আমির—এমনকী বৈরম খান-এর নিজস্ব অনুগামীরা পর্যন্ত—কেউ তাঁর অনুমতি নিয়ে, এবং অনেকে না-নিয়েই, রাজার সঙ্গে তড়িঘড়ি যোগ দিতে চলল।"

৬১. এ-প্রসঙ্গে উজবেক অফিসারদের মনোভাব দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই আমির-রা সর্বদাই বৈরম খান-কে সমর্থন করে এসেছেন (পূর্বোক্ত)। এমনকী এই সময়েও এঁদের সহানুভূতি তাঁর প্রতি ছিল। এঁদের বৈরম খান-এর প্রভাবমুক্ত করার জন্য বাহাদুর খান উজবেক-কে এই সময় 'ওয়কিল' নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও এঁদের সন্তুষ্ট করা যায়নি, এবং রাজভক্তদের প্রতি বৈরিতাপোষণ থেকে নিবৃত্ত করা যায়নি ('আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ৯৯-১০০, ১১৪)। তবে, এই আমির-রা—মুঘল রাজার প্রতি যাঁরা, পরবর্তীকালে, নামমাত্র আনুগত্য পোষণ করত—যথেষ্ট ক্ষমতাশালী হওয়া সত্ত্বেও প্রকাশ্যে বৈরম খান-এর পক্ষাবলম্বন করার সাহস পায়নি। তুলনীয় 'আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ৯৭; 'তারিখ-ই-ফরিশ্‌তা', খণ্ড ১, পৃ. ২৪৮। পদচ্যুতির পরে বৈরম খান-এর মাথায় একটা মতলব এসেছিল উজবেক আমির-দের সহায়তায় বাংলা আক্রমণ করে সেখানকার স্বাধীন রাজা হয়ে বসবেন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি পূর্বাভিমুখে অগ্রসরও হয়েছিলেন, কিন্তু হঠাৎ মত পাল্টেছিলেন। হয়ত উজবেক আমির-দের অনিচ্ছুক মনোভাব তাঁকে নিরুৎসাহ করেছিল।

৬২. তুলনীয় 'আকবরনামা', খণ্ড ২, পৃ. ৯৭; 'মআসির-ই-রহিমী', খণ্ড ২, পৃ. ৪১-৪। আপাতদৃষ্টিতে, আকবর-এর সাথে পত্রবিনিময়ে বৈরম খান বারংবার জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, কিছু লোক তাঁর বিরুদ্ধে রাজার কান ভারী করছে, এবং ব্যক্তিগতভাবে তিনি রাজার সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

৬৩. 'মআসির-ই-রহিমী', খণ্ড ২, পৃ. ৫৯.

৫

জিজিয়া এবং সপ্তদশ শতাব্দীর ভারত রাষ্ট্র

সতীশ চন্দ্র

১৬৭৯-এ অওরঙজেব কর্তৃক 'জিজিয়া' পুনর্বলবৎ হওয়ার ঘটনাটিকে সাধারণভাবে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে একটি সন্ধিক্ষণ বলে মনে করা হয়ে থাকে। তাছাড়া এও মনে করা হয় যে, ধর্মীয় গোঁড়ামি তুঙ্গে ওঠা, এবং তার ফলে মারাঠা ও রাজপুতদের—আর সাধারণভাবে হিন্দুদের—বিজাতীয় করে ফেলা, এবং সাম্রাজ্যের ভাঙন ত্বরান্বিত হওয়ারও সূচক ছিল এটি।[১] অন্যদিকে, কোনো-কোনো লেখকের মতে পদক্ষেপটি ছিল হিন্দুদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বৈরিতার প্রতিবিধান। তখন অওরঙজেব-এর সামনে ইসলাম রাষ্ট্র পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে মুসলমানদের আনুগত্য আহ্বান করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না।[২] উভয়মতেই বলা হয়েছে যে, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে অমিল ও শত্রুতা, এবং বিশেষাধিকার সম্পর্কিত একটি ভাবনার উন্মেষ—এই দুটিই ছিল জিজিয়া পুনর্বলবৎ হওয়ার মুখ্য প্রতিপাদক। তবুও, পদক্ষেপটির গুরুত্ব বুঝতে হলে সাম্রাজ্যে রাজনীতি ও অর্থনীতির বিকাশ, দরবারের ধর্মীয় ঝোঁকগুলি, এবং বিশেষত রাষ্ট্রচরিত্র সংশ্লিষ্ট বিতর্ক সম্পর্কে জানতে হবে, যা ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই রূপ ও ভঙ্গি বদলের মধ্য দিয়ে ক্রমাগতই হয়ে চলেছিল।

সমসাময়িক ও প্রায়-সমসাময়িক পর্যবেক্ষকদের ব্যাখ্যাগুলি প্রথমে খুঁটিয়ে দেখা যেতে পারে। মুহম্মদ সাকি্য মুস্তাইদ খান—যিনি সরকারি নথিপত্রের ভিত্তিতে লিখেছেন, এবং যাঁকে একরকম সরকারি ইতিহাসবিদ্ বলে মানা হয় (অওরঙজেব-এর আমলের)—তিনি বলেছেন :

> "যেহেতু ধর্মপ্রাণ সম্রাটের ঐকান্তিক উদ্দেশ্য ছিল ইসলামি কানুনের প্রসার ও নাস্তিক আচরণের উচ্ছেদ, তাই তিনি দিওয়ানী-র ঊর্ধ্বতন কার্যাধিকারীদের আদেশ দিলেন যে, কোরআনের 'যতদিন তারা দীনভাব সহকারে জরিমানা (জিজিয়া) দেবে'—এই নির্দেশ মান্য করে, এবং ধর্মানুশাসনিক ঐতিহ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে রাজধানী ও সুবা-গুলির কাফের (জিম্মি)-দের কাছ থেকে জিজিয়া আদায় করতে হবে।"[৩]

ঈসরদাস (ঈশ্বরদাস) এবং আলি মুহম্মদ খান মোটামুটিভাবে সাকি মুস্তাইদ খান-এর সঙ্গে একমত হয়েও ব্যাপারটিতে 'উলেমা'র ভূমিকাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ঈসরদাস বলেছেন :

"...ধর্মজ্ঞ, বিদ্বজ্জন ও সনাতনপন্থীরা ঈশ্বরের প্রতিরূপ সম্রাটকে—(সাচ্চা) বিশ্বাসের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার দৃষ্টিকোণ থেকে—বোঝাল যে, 'শরিয়া' অনুসারে জিজিয়া বলবৎ করাটা অত্যাবশ্যক এবং অপরিহার্য।"[৪]

আলি মুহম্মদ খান বলেছেন :

যেহেতু সম্রাট যত্নবান ছিলেন ব্যয়নির্ধারণ এবং রাজস্ব ও প্রশাসনসহ সমুদয় রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে 'শরিয়া'র অনুগমনকে উৎসাহ দিতে, তাই এই শুভক্ষণে বিদ্বজ্জন, ধর্মজ্ঞ ও ঋষিতুল্য ব্যক্তিরা সম্রাটকে—বিশ্বাসের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার দৃষ্টিকোণ থেকে—বোঝাল যে, (সাচ্চা) বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচারীদের উপর জিজিয়া বলবৎ করাটা 'শরিয়া' অনুসারে অপরিহার্য, এবং তাঁকে বারংবার উপরোধ করল সাম্রাজ্যের সুবাগুলিতে ঐটি পুনর্বলবৎ করতে।"[৫]

প্রায় একই ধরণের এ-দুটি বিবৃতিকে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গির নমুনা বলে ধরা যায়। সরকারি ঘোষণাগুলিতে জিজিয়া পুনর্বলবৎ করার কারণ হিসাবে স্বভাবতই জোর দেওয়া হয়েছে সাচ্চা বিশ্বাসের প্রতি সম্রাটের শ্রদ্ধা এবং ধর্মজ্ঞ, বিদ্বজ্জন প্রমুখের প্রতি তাঁর সভক্তি বাধ্যতাকে। কিন্তু তা-থেকে এটা বোঝা যায় না, কী করে অওরঙজেব—স্বয়ং 'শরিয়া'য় সুশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও—সিংহাসনারোহণের বাইশ বছর পরে জিজিয়া-সম্পর্কিত ঐ রক্ষণশীল নীতি অবলম্বন করলেন, যেটি ছিল প্রাচীনপন্থী 'উলেমা'দের দ্বারা ইতি-পূর্বেই বারংবার ব্যাখ্যাত, এবং পর্যাপ্তরূপে স্পষ্ট।[৬]

সমসাময়িক ইউরোপীয় পর্যটক ও ভারতে নিযুক্ত বাণিজ্যসংস্থার প্রতিনিধিরা অবশ্য কাজটির অন্য ব্যাখ্যা দেন। সুরাট-এ ইংরেজ কারখানার প্রেসিডেণ্ট টমাস রোল ১৬৭৯-এ লেখেন যে, কঠোর হাতে জিজিয়া আদায়ের উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র অওরঙজেব-এর শূন্য কোষাগার পূর্ণ করাই নয়, জনসংখ্যার দরিদ্রতর অংশগুলিকে মুসলমান হতে বাধ্য করাও।[৭] মানুচ্চি [Manucci] প্রায় পঁচিশ বছর পরে এ-প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে একই বিষয়ের উপর জোর দেন :

"যশওয়ন্ত সিংহের মৃত্যুকে হিন্দুদের আরো বেশি নিপীড়ন করার একটি সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করেন অওরঙজেব কারণ, হিন্দুদের মধ্যে এমন কোনো সাহসী ও ক্ষমতাশালী রাজা তখন ছিলেন না যিনি তাদের রক্ষা করতে পারেন। তিনি হিন্দুদের উপর মাথট (মাথাপিছু কর) ধার্য করেন যা প্রত্যেককেই দিতে হত, কম অথবা বেশি...। অওরঙজেব এটা করেছিলেন দুটি কারণে, প্রথমত, এ-সময়ে যুদ্ধাভি-

যানের খরচ যোগাতে গিয়ে রাজকোষ শূন্য হয়ে যাচ্ছিল; এবং দ্বিতীয়ত, হিন্দুদের মুসলমান হতে বাধ্য করার জন্য।”[৮]

অওরঙজেব-এর সমসাময়িক অনেকে হয়ত আন্তরিকভাবেই মানতেন যে, জিজিয়া বলবৎ করে তিনি অ-মুসলমানদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ঐতিহাসিক নিরীক্ষণের আলোকে কারণটি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। দেশের বৃহত্তর অংশে চারশো বছরেরও বেশি সময় ধরে মুসলমান শাসন বহাল থাকা সত্ত্বেও হিন্দুরা দৃঢ়ভাবে তাদের ধর্ম বিশ্বাস আঁকড়ে রেখেছিল।[৯] এই সময়ের বেশিরভাগটা জুড়েই তারা জিজিয়া দিতে বাধ্য ছিল।[১০] জিজিয়া পুনর্বলবৎ করা হলেই যে ঐ চিত্র পাল্টে যাবে—অওরঙ্গজেবের এমন আশাবাদী হওয়ার কারণ ছিল না। যদিও করাটি ছিল প্রতিক্রিয়ামূলক, এবং চাপটা ধনীদের চেয়ে গরিবদের উপরই বেশি পড়েছিল, তা সত্ত্বেও এর ফলে তখন ব্যাপক কোনো ধর্মান্তরের নজির পাওয়া যায় না। তেমন যদি কিছু হত, সম্রাটের প্রশস্তিকাররা নিশ্চয়ই তা আনন্দের সঙ্গে নথিবদ্ধ করে রাখত তাঁর কর্মনীতির জয় হিসাবে।[১১] বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যটি বিচার করলে দেখা যায় যে, অওরঙজেব তাঁর ত্রয়োদশ শাসনবর্ষে আর্থিক সংস্থানগুলি নতুন করে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে বুঝলেন, বিগত বারো বছরে ব্যয় হয়েছে আয়ের চেয়ে বেশি। ফলত, অর্থনৈতিক রদবদল হল, এবং এমনকী “সম্রাট, শাহজাদা ও বেগমদেরও ব্যয়সংকোচ করা হল।”[১২] এই সঙ্গে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, দাক্ষিণাত্যে নিরন্তর যুদ্ধ বিশেষত ১৬৭৬-এর পর থেকে, উত্তর-পূর্বে সীমানা নিয়ে হাঙ্গামা, আফগান উপজাতিগুলির সঙ্গে সবিরাম লড়াই এবং পরে শিশোদিয়া ও রাঠোরদের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা—এগুলির কোনোটি থেকেই রাজ্যসীমাবৃদ্ধি কিম্বা অর্থাগম হচ্ছিল না, বরং রাজকোষে টান পড়েছিল। তাঁর আমলে, অওরঙজেব বহুসংখ্যক উপকর প্রত্যাহারের আদেশ দিয়েছিলেন।[১৩] এ-রকম আদেশ জারি হয়েছিল তাঁর পূর্বসূরীদের আমলেও। কিন্তু জানা যায় যে, এই আদেশ সত্ত্বেও রাজস্ব দপ্তর থেকে জাগির-এর মূল্য-নির্ধারণে (জমাদানি [jama'dani]) ঐ উপকরগুলি থেকে প্রাপ্তব্য আয়ও ধরে নেওয়া হত।[১৪] সম্ভবত এটাই আশা করা হত যে, জাগিরদারর তাদের অনুমোদিত আয় থেকে ঐ ছাড়টুকু দিয়ে দেবে। কিন্তু অল্প কয়েকজন আমিরই—যেমন রাজা যশ্ওয়ন্ত সিংহ—এই ব্যবস্থায় রাজি ছিলেন। অন্যান্যরা ভরতুকি দাবি করেছিলেন,[১৫] এবং যেহেতু তা দেওয়ার মতো অর্থ রাজকোষে ছিল না তাই ঐ জাগিরগুলিতে করছাড়ের আদেশটি নিস্ফল হয়ে গিয়েছিল। কাজেই, এ রকম ধারণার কোনো ভিত্তি নেই যে, অওরঙজেব যেহেতু ইসলাম অনুমোদিত নয় এমন উপকরগুলি উচ্ছেদ করেছেন, অতএব ইসলামি কানুন দ্বারা বিশেষভাবে অনুমোদিত করগুলির অন্যতম জিজিয়া বলবৎ করে তিনি উচিতকাজই করেছিলেন।[১৬]

অওরঙজেব-এর আমলে জিজিয়া বাবদ কত আদায় হত তার কোনো হিসাব পাওয়া যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর এক লেখক শিবদাস লখ্‌নওয়ি-র[১৭] মতে, সাম্রাজ্যের সমস্ত সুবা মিলিয়ে জিজিয়া আদায়ের (হাসিল) পরিমাণ ছিল ৪ কোটি টাকা। এই হিসাব যদিও দেওয়া হয়েছে ১৭২০-তে সৈয়দ ভ্রাতাদের পরাজয়ের পর রাজা জয়সিংহ-এর অনুরোধক্রমে জিজিয়া (পুনঃ) প্রত্যাহারের সময়কার আদায়ের ভিত্তিতে, তবুও হিসাবটিকে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা-র অন্তর্ভুক্তির পর থেকে মোটামুটিভাবে প্রযোজ্য বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। জগজীবনদাসের মত অনুসারে, ১৭০৮-৯ নাগাদ সাম্রাজ্যের মোট হাসিল ছিল ২৬ কোটির সামান্য বেশি ;[১৮] এবং এর মধ্যে জিজিয়ার ভাগ ছিল ১৫ শতাংশের মতো। তবে, পুরোপুরি আদায় প্রতি বছর হত কিনা সন্দেহ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুর দিকের একটি রচনা 'নিগরনামা-ই মুন্‌শি' অনুসারে জমা-র ১,০০,০০০ দাম [dam]-এর উপর জিজিয়া নির্ধারিত ছিল একশো টাকা, অর্থাৎ, খালিস ও জাগিরমহলগুলিতে চার শতাংশের বাঁধা হারে। ঐ জোতগুলির কার্যাধিকারী ও জাগিরদার-দের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল কৃষকদের থেকে কর আদায়ের জন্য যেকোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের।[১৯] ফসল-বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে জিজিয়া 'মকুবের আবেদন করা যেত, এবং এ-রকম মকুব মনে হয় নিয়মিতভাবেই করা হত। শহরাঞ্চলে কর নির্ধারণ হত অন্যভাবে। সেখানকার আদায়ের মোটামুটি হিসাবটাও করা মুশ্‌কিল। খাফি খানের রচনা অনুসারে, 'আমিন-ই-জিজিয়া' মীর অব্দুল করিম ১০৯২/১৬৮১-তে জানিয়েছেন যে, তিনি গত বছরে বুর্‌হানপুর শহর থেকে জিজিয়া বাবদ ২৬,০০০ টাকা আদায় করেছেন, এবং তিন মাসে ১,০৮,০০০ টাকা বুরহানপুর-এর অর্ধেকসংখ্যক অধিবাসী (পুর-জাঠ [pur-jat]) কর্তৃক প্রদেয় হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।[২০] বাদশাহপুর-এর শহর ও পরগণা সংশ্লিষ্ট একটি দস্তাবেজে দেখা যায় যে, মোট নির্ধারিত ২৯৫০ টাকার মধ্যে শহরের ভাগ হল ২১৪০ টাকা ১০ আনা, অর্থাৎ, মোটামুটি ৭২ শতাংশ।[২১] এত কম নজিরের ভিত্তিতে সাধারণ কোনো সূত্রায়ন করা কঠিন, কিন্তু এমন একটা সিদ্ধান্ত করা নিশ্চয়ই ভুল হবে না যে, শহর থেকে আদায় বেশ ভালো পরিমাণেই হত। এ-জন্যই, সম্ভবত, জিজিয়া বিরোধিতার বহিঃপ্রকাশ শহরাঞ্চলেই বারবার ঘটেছে, এবং সেগুলিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন ব্যবসায়ী ও বণিকরা। খ্রিস্টান বণিকদের আমদানিকৃত সামগ্রীর উপর জিজিয়ার পরিবর্তে ১½ শতাংশের একটি অতিরিক্ত শুল্ক চাপানো হয়েছিল। ঐ বণিকদের মধ্যে ছিল ইংরেজ, ফরাসি, পর্তুগীজ, এবং অন্যান্য ইউরোপীয় সংস্থাগুলির বণিকরা, যেগুলি ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য করত।[২২]

অতএব, জিজিয়া থেকে আদায়ের পরিমাণ নেহাৎ কম ছিল না। এটা উল্লেখযোগ্য যে, সংগৃহীত অর্থ 'খাজানা—জিজিয়া' নামে একটি পৃথক রাজকোষে

রাখা হত, দাতব্য কাজের জন্য নির্দিষ্ট করে।[২৩] এমতাবস্থায়, প্রধান কোষাগারের ভার খানিকটা লাঘব করার একটি উপায় হিসাবে জিজিয়া-কে ধরা যেতে পারে। কিন্তু তা শুধু সেই পর্যন্তই, যতদূর পর্যন্ত এটা দেখানো যাবে যে, এর ফলে প্রধান কোষাগার থেকে যামিয়াদার [Yamiyadars] বা নগদ বৃত্তিধারীদের প্রাপ্যবণ্টনে ব্যয়সংকোচ করা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা বেরিয়ে আসে যে, শুধুমাত্র বিশুদ্ধ আর্থিক উদ্দেশ্যেই জিজিয়া পুনর্বলবৎ হয়নি। পদক্ষেপটি সম্যক্ বুঝতে হলে রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল বিপুলসংখ্যক বৃত্তিধারীর চরিত্র, অবস্থান ও সামাজিক ভূমিকা; এবং রাষ্ট্রচরিত্র, হিন্দুদের অবস্থান, ও রাষ্ট্রের মূল কর্মনীতি নির্ধারণে উলেমা-র এক্তিয়ার প্রসঙ্গে ঐ আমলের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত বিতর্ক—এই সবকিছু সম্পর্কে জানতে হবে।

ধর্মজ্ঞ, সন্ন্যাসী, বিধবা ও অনাথশিশু, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটি স্তর এবং বিপুলসংখ্যক সৃষ্টিছাড়া পরজীবী—বৃত্তিধারীদের এই বিশাল বাহিনী কোনো সুলতানকেই স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি। ইসলামের প্রথম যুগের অস্পষ্ট সমতাবাদী ও মানবতাবাদীদের একাংশ মনে করতেন যে, সমস্ত সক্ষমদেহ মুসলমান—বিশেষত যারা পবিত্র কানুনে কিছুটা শিক্ষিত হয়েছে—তাদের জীবনধারণের ব্যবস্থা করে দেওয়াটা রাষ্ট্রেরই কর্তব্য। বলবন-এর আমল থেকেই উপরোক্ত ঐ বাহিনীভুক্তদের অনুদান ও বিশেষ সুবিধাগুলি ছাঁটাই করা হচ্ছিল। কিন্তু সাধারণভাবে ঐ বাহিনীর জীবনধারণের ব্যবস্থা করার দায়িত্বটি—যা ছিল রাষ্ট্রের জনকল্যাণকর্মের অন্যতম—কেউই অস্বীকার করেননি। আকবর ব্যাপারটিকে নতুন ভিত্তিতে সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন, এম্মাদার [a'immadar]-দের অগ্রাধিকার দিয়ে এবং গ্রামগুলির দাবি অগ্রাহ্য করে। কিন্তু কালক্রমে, সমস্যাটি আবার গুরুতর হয়ে ওঠে, এবং ঔরঙ্গজেবকে নতুন-ভাবে তার মোকাবিলা করতে হয়।[২৪]

বৃত্তিধারীদের মধ্যে ধর্মজ্ঞদের প্রতিপত্তি বেশি ছিল। শিক্ষার আপাত-একাধিকার ছিল তাঁদেরই, এবং তাঁরা শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা ভোগ করতেন। অনেক সম্রাট প্রশাসনিক কাজেও তাঁদের সহায়তা নিতেন। তাঁদের ঔদ্ধত্য অনেক ক্ষেত্রেই শাসকদের পক্ষে রুচিকর হত না, এবং কয়েকজন কাজির অর্থলোলুপতা উলেমা-র সুনামহানিও করেছিল। তবুও শাসকরা তাঁদের উপেক্ষা করতে পারতেন না কারণ, ভারতে মুসলমানরা এত গোষ্ঠীতে ও স্তরে বিভক্ত ছিল যে, ইসলাম ছাড়া তাদের মধ্যে ঐক্যসূত্র টিকিয়ে রাখা যেত না। উলেমা কোনো সংগঠিত সংস্থা না হওয়ায় 'শরিয়া'র কঠিন বিধিনিষেধগুলি, যা উদ্ভূত হয়েছিল পশ্চিম এশিয়ায় এবং যেখানকার পরিস্থিতির সঙ্গে মধ্য-যুগীয় ভারতের প্রচুর অমিল, এখানকার শাসকদের পক্ষে বহুবিধ রাজনৈতিক জটিলতা তৈরি করেছিল। ভারতে একজন সুলতান কতদূর পর্যন্ত 'শরিয়া'

সম্মতভাবে শাসনকার্য চালাতে পারেন, তা নিয়েই বিতর্ক ছিল। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এ-ব্যাপারটায় অবশ্য মতৈক্য ছিল যে ভারতে স্থাপিত রাষ্ট্রটি সাচ্চা অর্থে ইসলাম রাষ্ট্র হতে পারে না;[২৬] এবং বহুরকম ইসলাম-বিরোধী বৈশিষ্ট্য—যেমন, সুলতানের ব্যক্তিগত ভোগের জন্য বৈত-উল-মল অধিকার করা, সুলতান কর্তৃক জাঁক ও আড়ম্বর রক্ষণাবেক্ষণ, মুসলমানের রক্তপাত—ইত্যাদি সহ্য করতে হবে। এতৎসত্ত্বেও উলেমা চাইত সুলতান-রা 'বিদাৎ' [bid'at] এবং প্রকশ্যে 'শরিয়া' নিষিদ্ধ কাজগুলিকে দমন করে ইসলাম-এর রক্ষকরূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করুন, হিন্দুদের বিরুদ্ধে নিরন্তর জেহাদ তুলুন, তাদের অপমান ও মর্যাদাহানি করুন, এবং তাদের প্রকাশ্য মূর্তিপূজার অনুমতি না দিন।[২৭] ধর্মজ্ঞদের অধিকাংশই মনে করতেন যে, জিজিয়া বলবৎ হওয়াটা আবশ্যাক, এবং হিন্দুদের অপদস্থ করাটাই এর উদ্দেশ্য। উলেমাদের কেউ কেউ এ-ব্যাপারে এতই উৎসাহী ছিলেন যে, তাঁরা জিজিয়া আদায়কারীদের দিয়ে হিন্দুদের উৎপীড়ন করার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন।[২৮] ধর্মজ্ঞদের কাছে জিজিয়া বলবৎ হওয়াটা ছিল হিন্দুদের উপর একটি অধস্তন ও বশ্য জাতির ছাপ মারার, শাসকশ্রেণী হিসাবে মুসলমানদের অবস্থান দৃঢ়তর করার, এবং তার মধ্য দিয়েই সাচ্চা বিশ্বাসের ধারক উলেমা-র রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বসূচক অবস্থান স্থায়ী করে নেবার একটি সুবর্ণসুযোগস্বরূপ।

রাজনৈতিক বাস্তববাদীর মতোই, সুলতান ও তাঁর নেতৃস্থানীয় আমির-রা এমন কোনো কর্মনীতি প্রয়োগ করতে রাজি ছিলেন না, যেটি অনাবশ্যক রাজনৈতিক জটিলতা তৈরি করবে। উলেমা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগকারী স্তরটির মধ্যে স্বার্থের এই পার্থক্য ছিল মধ্যযুগীয় ভারতে মুসলমান সমাজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। উলেমা বা রাজনৈতিক শক্তিগুলি—কোনোটিই সংস্থা হিসাবে সংগঠিত ছিল না। কট্টর এবং উদারনৈতিক ধারাদুটির মধ্যে একপক্ষ প্রবক্তা ছিল হিন্দুদের চিরশত্রু হিসাবে গণ্য করার, এবং তাদের অপদস্থ করার ও রাজনৈতিক ক্ষমতার সমস্ত অংশভাগ থেকে বঞ্চিত করার কর্মনীতিটির; আর অন্যপক্ষের আকাঙ্খিত কর্মনীতি ছিল অনুগত হিন্দুদের প্রতি উদারতার, এবং বিভিন্ন সুবিধাদানের মাধ্যমে হিন্দু রাজাদের সক্রিয় সহযোগিতা অর্জন করার। দুটি ধারার মধ্যে এই বিতর্কটি ছিল—১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত—দেশের মননশীল ও রাজনৈতিক জীবনের এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কট্টর ধারাটির সহায় ছিল মৌলবাদী শক্তিগুলি এবং পবিত্র বিধান অক্ষরে অক্ষরে পালন করার অনমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাদের, যে-বিধান ভারতে বিরাজমান পরিস্থিতির প্রতি ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন।[২৯]

উদারনৈতিক ধারাটির আবেদন ছিল রাজনৈতিক উপযোগিতার। শাস্ত্রীয় মতবাদসংক্রান্ত পার্থক্যগুলিও—যেমন, 'ওয়হদৎ-অল-ওয়জুদ' এবং 'ওয়হদৎ-অল-শহুদ' পন্থীদের মধ্যে বিতর্ক—তাদের মধ্যে বিভেদ জিইয়ে রেখেছিল।

দিল্লির সুলতানিতে ভাঙন, এবং বেশ কিছু সংখ্যক প্রাদেশিক রাজ্য-স্থাপনের ফলস্বরূপ মুসলমান শাসক ও স্থানীয় হিন্দু 'অভিজাত'দের মধ্যে নিকটতর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। গ্রামীণ এলাকাগুলিতে আফগানদের ব্যাপক বসবাসের প্রভাবও ছিল এইরকম। বিভিন্ন স্তরের রাষ্ট্রীয় পরিষেবায় হিন্দু জমিনদারদের নিয়ে আসার ঝোঁকটি লোদি ও শূরদের আমলেই জোরালো পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল,[৩০] এবং আকবর সেটিকে কর্মনীতি হিসাবে গ্রহণ করেন। এই পরিবর্তনগুলির ফলে সুলতানি আমলের কষ্টরচিত রাষ্ট্রতত্ত্বটি আপাতভাবে ভেঙে পড়ল। আরেকটি বড় আঘাত এল ১৫৬৪-তে যখন আকবর জিজিয়া প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন।

আবুল ফজলের কাছ থেকে জানা যায়, সম্রাটকে 'রাজপুরুষের বিরুদ্ধতা' এবং 'বেওকুফের বাচালতা' অগ্রাহ্য করতে হত। 'সে যুগের কাঠগোঁয়ার' উলেমাদের বিরোধিতাই মনে হয় বিশেষভাবে প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিল, অবশ্য তাতে কোনো ফল হয়নি।

জিজিয়া প্রত্যাহারের সপক্ষে আবুল ফজলের মূল যুক্তিগুলি রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত হলেও, অর্থনৈতিক দিকটিও উপেক্ষিত হয়নি। তিনি বলেছেন, জিজিয়া প্রাথমিকভাবে বলবৎ করা হয়েছিল 'হিন্দুদের বিরোধিতা ও শাসকদের অর্থলালসা'র কারণে। তবুও, "যুগপরিত্রাতার অপার শুভকামনা ও মহানুভবতার", প্রভাবে বিভিন্ন ধর্মমতের মানুষ "একাত্মার মতো, ভক্তি ও সেবার সংকল্প নিয়ে কোমর বেঁধে নামল রাজ্যের উন্নতিসাধনে নিজেদের উজাড় করে দিতে।" এই কারণেই তাঁকে পার্থক্য করতে হয়েছিল উপরোক্ত জনগণের সঙ্গে পুরনো সেই শ্রেণীর মানুষদের, যারা ভয়ংকর শত্রুতা লালন করত। তিনি আরো বলেছেন যে, প্রথম যুগের শাসকবর্গ ও তাদের সহকারীদের অর্থলালসার দরুনই জিজিয়া বলবৎ করা হয়েছিল কিন্তু এখন সম্পদের প্রাচুর্য থাকায় সম্রাটের আর প্রজাপীড়ন করার দরকার ছিল না। তাই তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, জিজিয়া আদায়ের সুফল ছিল 'অবাস্তব', বরং এটি বলবৎ করায় "প্রজাদের মধ্যে মতবিরোধ বেড়ে উঠেছিল"[৩১], এবং তার ফলে, রাজনৈতিক ক্ষতি হয়েছিল।

হিন্দুরা মুসলমানদের মতোই রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত ছিল—এই প্রতর্কের মধ্য দিয়ে আবুল ফজল জিজিয়া-র সপক্ষে প্রধান স্তম্ভটি উন্মূল করতে চেয়েছেন।[৩২] তিনি জোর দিয়ে এ-ও বলেছেন যে, ঐ পরিস্থিতিতে জিজিয়া বলবৎ করাটা রাজনৈতিক উপযোগিতা ও স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের বিরোধী ছিল।

ধর্মবিশ্বাসের কারণে প্রজায় প্রজায় ভেদ করা চলবে না—এই ভাবনার সঙ্গে 'সুলহ্-ই-কুল' (যে, সমস্ত ধর্মই অভিন্ন ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার বিভিন্ন পথ) সংকল্প যুক্ত হয়ে রাষ্ট্রকে, স্পষ্টতই, ধর্মের ঊর্ধ্বে অবস্থিত—যদিও ধর্ম-বিরোধী নয়—এমন একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে তুলে ধরেছিল। অতএব,

আকবরের রাষ্ট্রচিন্তা ছিল আধুনিক ও ধর্ম নিরপেক্ষ, এবং তা ধর্মোপজীবীদের বিশেষাধিকারের মূলে আঘাত করেছিল। আর যদি কারণ না-ও থাকে, শুধু এই কারণেই কট্টরপন্থীদের কাছে এটি গ্রহণযোগ্য হয়নি।

১৭শ শতাব্দীতে কট্টরপন্থা ও উদারনীতিবাদের মধ্যে সংঘর্ষের একটি বিশদ বিশ্লেষণের প্রয়াস আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যের সহায়ক হতে পারে। কট্টর-পন্থীরা শেখ অহ্‌মদ সরহিন্দি-র মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল তাদের উপাধ্যায়কে, এবং 'ওয়হ্‌দৎ-অল-শহুদ' আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। ১৭শ শতাব্দীতে শেখ আহ্‌মদ সরহিন্দি-র রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাবকে অযথা বাড়িয়ে দেখা উচিত হবে না। তবে, আমিরমণ্ডলী ও উলেমা উভয়ের মধ্যেই যে কট্টরপন্থার একটি জোরালো ঝোঁক বিদ্যমান ছিল, তা-তে সংশয়ের কোনো কারণ নেই। আমিরদের একটি গোষ্ঠী মনে করতেন, রাজতন্ত্র হল একটি জাতিবাদী ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, এবং তাঁরা নিজেদের একচ্ছত্র ক্ষমতা খর্ব হওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন।[৩৩] সাম্রাজ্য দৃঢ়মূল করার উদ্দেশ্যে প্রচুর সংখ্যায় দেশীয় শাসকদের আমিরমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার যে কর্মনীতি আকবর-এর ছিল, তার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন এ'রা। শাহ্‌জাহান-এর আমলের প্রথমদিকেই পাঁচ হাজারি বা তদূর্ধ্বতন আমিরিপ্রাপ্ত মারাঠাদের সংখ্যা রাজপুতদের ছাড়িয়ে গিয়েছিল।[৩৪] এই কর্মনীতি সাম্প্রসারণের প্রতিকূল প্রভাব আমিরমণ্ডলীর পূর্বতন ক্ষমতাধর গোষ্ঠীগুলির উপর পড়তে বাধ্য। এছাড়া, আকবর-এর রাষ্ট্রচিন্তার প্রতি রক্ষণশীল উলেমাদের শত্রুভাব ক্রমশ বাড়ছিল ছাড়া কমছিল না। মুঘল সম্রাটদের সামনে মূল রাজনৈতিক সমস্যাটি ছিল কট্টরপন্থী শক্তিগুলিকে বশে আনা, রাজপুত এবং অন্যান্য দেশীয় শাসকবর্গকে মৈত্রীবদ্ধ করার আকবর-এর মৌলিক কর্মনীতিটি থেকে বিচ্যুত না হয়ে। এর জন্য, আবার, ব্যাপক ধর্মীয় সহিষ্ণুতার একটি কর্মনীতি প্রয়োজন ছিল। কট্টরপন্থী শক্তিগুলির সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘর্ষ এড়াতে জাহাঙ্গির সক্ষম হয়েছিলেন, কিন্তু সামগ্রিক পরিস্থিতির বিশেষ কিছু হেরফের ঘটাতে পারেননি। শাহ্‌জাহান চেষ্টা করলেন রাষ্ট্রের ইসলাম মৌলবাদী চরিত্র প্রতিষ্ঠা করার—আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেকে ইমানরক্ষক বলে ঘোষণা করে, নবনির্মিত মন্দির ধ্বংসের আদেশ দিয়ে, এবং বিধর্মী কার্যকলাপ (যেমন, ভিম্বর-এ প্রচলিত হিন্দু-মুসলমানে বিবাহ) নিষিদ্ধ করে।[৩৫] একই সঙ্গে, নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনি উলেমাকে হস্তক্ষেপ করতে দিলেন না, এবং 'ওয়জুদী' ও 'শহুদী' সমেত সর্ব স্তরের উলেমার জন্য রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা সমানভাবে সম্প্রসারিত করলেন। শাহ্‌জাহান-এর রাষ্ট্রচিন্তা ছিল আকবর-এর নীতি (আবুল ফজল যেমন ব্যাখ্যা করেছেন) থেকে অধোগমন। কিন্তু ১৭শ শতাব্দীর ভারতে মুসলমান কট্টরপন্থার সুরক্ষিত প্রতিপত্তির কথা বিবেচনা করলে, ঐ সমঝোতা না-করে হয়ত সম্রাটের উপায় ছিল না।[৩৬] সমস্ত

সমঝোতার মতোই, এটিও কোনো স্পষ্ট নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না—একমাত্র রাজনৈতিক প্রয়োজনবাদ ছাড়া—এবং সেইজন্য স্থিতিশীলও হতে পারেনি। একবার রাষ্ট্রের চরিত্র ইসলাম মৌলবাদী (এমনকী, শুধুমাত্র তত্ত্বগত-ভাবে হলেও) হিসাবে স্বীকৃত হয়ে যাওয়ার পর, 'শরিয়া'র ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠনের পক্ষের যুক্তিগুলি প্রচণ্ড জোরালো হয়ে ওঠে। দারা সিংহাসনারূঢ় হলে আকবর-এর রাষ্ট্রচিন্তা পুনরুজ্জীবিত হবে—এই সম্ভাবনায় ঐ মতাদর্শগত যুক্তি-গুলি দৃঢ়তর হয়ে ওঠে।

যদিও অওরঙজেব সমুগড়-এর যুদ্ধের আগে ইসলামের জয়ধ্বনি তোলা থেকে বিরত ছিলেন,[৩৭] এবং রাজপুতদের সঙ্গে রাজনীতিগত আঁতাত করেছিলেন—উল্লেখ্যত মেওয়াড়-এর রাণা রাজসিংহ আর, খানিকটা, অম্বর-এর জয়সিংহ কচবাদা-র সঙ্গে[৩৮]—তথাপি, তাঁর সিংহাসনারোহণ কট্টরপন্থী উলেমাদের আশান্বিত করেছিল।

অওরঙজেব নতুন মন্দির নির্মাণের উপর নিষেধাজ্ঞা পুনর্জারি করেছিলেন, নবপ্রবর্তিত বহু কিছুকে দমিয়েছিলেন, এবং ইসলামি কানুন অমান্য করার মিথ্যা অভিযোগে দারাকে হত্যা ও মুরাদকে বন্দী করেছিলেন। কিন্তু প্রথমদিকে মনে হয়েছিল, শাহ্‌জাহানের কর্মনৈতিক ধাঁচটিই তিনি বজায় রাখবেন, সেটিকে অতিক্রম করবেন না। হয়ত সে-কারণেই তিনি জিজিয়া পুনর্বলবৎ করা থেকে বিরত ছিলেন, রক্ষণশীল মতানুসারে এটির অনিবার্যতা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও। রাজপুত ও অন্যান্য দেশীয় শাসকদের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপনের কর্মনীতিটি তিনি ধরে রেখেছিলেন, এবং জয়সিংহ আর যশ্‌ওয়ন্ত সিংহকে শাহী পদমর্যাদাক্রমে এমন উচ্চাসন দিয়েছিলেন যা রাজা মানসিংহের পর থেকে এতদিন আর কাউকে দেওয়া হয়নি। রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণে উলেমার হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হত না। তবুও কট্টরপন্থী শক্তিগুলির প্রভাব ক্রমশ বেড়েছিল, এবং এর জন্য হয়ত আংশিক-ভাবে দায়ী ছিল জনক্ষোভ (যার আশঙ্কা অওরঙজেব করেছিলেন ভ্রাতৃ-হত্যা এবং পিতা ও অন্যান্য ভ্রাতাদের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া হিসাবে) প্রশমন করার জন্য অওরঙজেবের ধর্মাশ্রয়ী কর্মনীতি।[৩৯] তাঁর নিজের রক্ষণশীল মনোবৃত্তি, এবং 'শরিয়া' সম্মত নয় এই অজুহাতে অনেক প্রাচীন প্রথা ও অনুষ্ঠান তৎকর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে কট্টরপন্থী গোষ্ঠীটি উৎসাহ পেয়েছিল।

সমসাময়িক এক লেখকের রচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, জিজিয়া পুনর্বলবৎ করার প্রশ্নটি সিংহাসনারোহণের সময়ই সম্রাটকে ভাবিয়েছিল, কিন্তু "কয়েকটি রাজনৈতিক আশুকর্তব্যের খাতিরে তিনি ব্যাপারটিকে মুলতুবি রেখেছিলেন।"[৪০] ঐ রাজনৈতিক আশুকর্তব্যের বিবরণ অবশ্য লেখক দেননি, কিন্তু আমরা ধরে নিতে পারি যে, রাজপুতদের সঙ্গে মৈত্রী-

স্থাপন ছিল তার অন্যতম। মারাঠাদের সঙ্গে একটা সমঝোতা সম্পর্কেও হয়ত অওরঙজেব আশাবাদী ছিলেন। অবশ্য সে-আশা নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল বিশেষত যখন শিবাজী-র সঙ্গে বাহাদুর খান-এর আলোচনা ব্যর্থ হল (১৬৭৬), গোলকুণ্ডার সহায়তায় দাক্ষিণাত্যে মারাঠারাজ্য স্থাপনে শিবাজী প্রয়াসী হলেন, এবং মুঘলের হাত থেকে দক্ষিণী রাজ্যগুলিকে উদ্ধারের সর্বাধিনায়ক হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করলেন।[৪১] এই পরিস্থিতিতে, এবং দক্ষিণী রাজ্যগুলির আসন্ন বিযুক্তি রোধকল্পে অওরঙজেব ১৬৭৬-এ সিদ্ধান্ত নিলেন সর্বশক্তি নিয়ে দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধাভিযানের। তিনি এইভাবে ভাঙলেন সীমিত আগ্রাসনের মুঘল কর্মনীতিটি, যা অনুসৃত হয়ে আসছিল আকবর-এর আমল থেকে, যেটি ১৬৩৬-এর সমঝোতায় শাহ্‌জাহান গ্রহণ করেছিলেন, এবং সিংহাসনারোহণের পর থেকে যা মেনে চলছিলেন তিনি নিজেও।[৪২]

কাজেই, রাজনৈতিকভাবে, ১৬৭৬ থেকেই অওরঙজেব শাহ্‌জাহানী ধাঁচের বাইরে পা বাড়ালেন। দীর্ঘকালীন যুদ্ধ এবং ক্লেশকর উদ্যোগের যুগ শুরু হল। ১৬৭৬ থেকে ১৬৭৮-এর মধ্যে দাক্ষিণাত্যে প্রচণ্ড কয়েকটি অভিযান হতে দেখা গেল। ন্যূনতম লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হল বিজাপুর ও গোলকুণ্ডায় মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা যাতে ঐ রাজ্যগুলিকে মারাঠাদের সঙ্গে জোট বাঁধা থেকে নিরস্ত করা যায়, মারাঠা প্রভুত্বাধীন হয়ে পড়ার হাত থেকে তাদের বাঁচানো যায়, এবং রাজ্যগুলির সম্পদ ও পরিসীমাকে মারাঠাশক্তির বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু, ১৬৭৮ পর্যন্ত এই সামান্য লক্ষ্যপূরণেও মুঘলরা সফল হল না। মনে হয় এই পরিস্থিতিতেই, অওরঙজেব এমন এক জাদুকরী ঘোষণার প্রয়োজন বোধ করলেন যা দিয়ে সার্বিক উৎসাহের পুনরুজ্জীবন এবং মুসলমান বিচারধারার ঐক্যবদ্ধ সমাবেশ (তাঁর সপক্ষে) সম্ভব হবে। অতীতে, এইরকম সংকটমুহূর্তে শাসকরা 'জেহাদ' ঘোষণা করতেন। মূলত রক্ষণপন্থী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী অওরঙজেব মনে করলেন, জিজিয়া পুনর্বলবৎ করার (অর্থাৎ, অধিকতর রক্ষণশীল একটি রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রত্যাগমনের ইঙ্গিত দেওয়ার) মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবিস্তারের নতুন পর্যায়টিকে চিহ্নিত করার চেয়ে অধিকতর ফলদায়ক আর কোনো পদক্ষেপই হতে পারে না।[৪৩] দাক্ষিণাত্যে ঘনায়মান রাজনৈতিক সংকটের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এই আগ্রাসী মেজাজের পরিপ্রেক্ষিতেই রাজপুত-যুদ্ধটিকেও বিচার করতে হবে। জিজিয়া পুনর্বলবৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাঠোর-যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়া থেকে এটা বোঝায় না যে, রাজপুত ও অন্যান্য দেশীয় শাসকবর্গের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপনের আকবরী কর্মনীতিটি বর্জিত হয়েছিল। তা যে হয়নি, সেটা অওরঙজেব-এর বিভিন্ন মতঘোষণার মধ্যেই আপাতদৃষ্ট।[৪৪] সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা গেছে যে, আমিরবর্গের

বিভিন্ন স্তরে হিন্দুদের সংখ্যা ১৬৭৯-এর পর কমে যায়নি, বরং বেড়েছিল।[৪৫] কাজেই, কখনো কখনো সেভাবে বলা হয়ে থাকলেও, জিজিয়া পুনর্বলবৎ হওয়াটাকে তিক্ততর হিন্দু-বিরোধী কর্মনীতির সূচনা বলে চিহ্নিত করা মুশকিল।

আমরা আগে বলেছি যে, জিজিয়া পুনর্বলবৎ হওয়ার ঘটনা একটি ঘনায়মান রাজনৈতিক সংকটকে চিহ্নিত করে, প্রাথমিকভাবে যা শুরু হয়েছিল দাক্ষিণাত্যে পরিস্থিতির অবনতির মধ্য দিয়ে। রাঠোর-যুদ্ধ এই সংকটকে তীব্রতর করেছিল, কিন্তু এটির কারণ ছিল না।[৪৬] জিজিয়া পুনর্বলবতের আরেকটি কারণ ছিল ধর্মোপজীবী স্তরটির মধ্যে বেকারত্ব। এমনকী মুঘল-দের কুলাচার্য শেখ মইনুদ্দিন চিশ্‌তি-র বংশধরগণ পর্যন্ত দারিদ্র্য ও অভাবে দিন কাটাচ্ছিলেন।[৪৭] জিজিয়া-র আয় থেকে বিদ্বজ্জন, ফকির, ধর্মজ্ঞ প্রমুখদের মধ্যে বিতরণের জন্য একটি বড় অংশ পৃথক করে রাখা হত। এই সঙ্গে, নিজস্ব কোষাগার ও আমিন-সহ জিজিয়া-র নতুন দপ্তরে প্রধানত ঐ স্তরটি থেকে কর্মচারী নিয়োগের নিয়ম চালু করে[৪৮] কট্টরপন্থী ধর্মোপজীবী স্তরটিকে অওরঙজেব প্রায় বশীভূত করে ফেললেন। এঁদের প্রভাবের জোরে মুসলমানদের সমস্ত গোষ্ঠীকে তাঁর পৃষ্ঠরক্ষায় সমাবেশিত করা যাবে—এইরকমই অওরঙজেব ভেবেছিলেন। কিন্তু, ধর্মোপজীবীরা এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে নিল ব্যাপক শোষণ ও নিপীড়ন, এবং ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি জমানোর জন্য। মেরথা থেকে শাহী সংবাদদাতা এক প্রতিবেদনে লিখেছিলেন যে, সেখানকার কাজি জিজিয়া-র নামে বিপুল অর্থ হিন্দুদের থেকে বলপূর্বক আদায় করছেন।[৪৯] মানুচ্চি আরো জোর দিয়ে বলেছেন যে, জিজিয়া দপ্তরের আমিনরা আদায়ের অর্ধেক বা এমনকী তিন-চতুর্থাংশ পর্যন্ত নিজেদের ভোগের জন্য রেখে দিত।[৫০] এমনও নজির আছে যে, কাজিরা কখনো কখনো জিজিয়া-র আদায়কৃত অর্থ কাজে লাগাতেন যারা ঐ অর্থপ্রদান করেছে তাদেরই অপমানিত ও নাকাল করার জন্য।[৫১]

অওরঙজেব এইভাবে ফিরে গিয়েছিলেন অধিকতর রক্ষণশীল এক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায়, যার সঙ্গে সুলতানি আমলের কিছু কিছু লক্ষণের মিল পাওয়া যায়। খাফি খান ও মাসুমুরি-র[৫২] বক্তব্য অনুসারে এই প্রত্যাগমনের আদত উদ্দেশ্য ছিল "দর-উল ইসলাম (অর্থাৎ, যেখানে 'শরিয়া'র কানুন চলে)-কে দর-উল-হর্ব (অর্থাৎ, কাফের-দের দেশ) থেকে আলাদা করা।" কিন্তু অওরঙজেব মনে রাখেননি যে, ১৭শ শতাব্দীর ভারতীয় পরিস্থিতি ১৪শ বা ১৫শ শতাব্দীর মতো ছিল না। পারস্পরিক সহিষ্ণুতা ও একতাকামী শক্তিগুলির বৃদ্ধিবিকাশ ঘটেছিল এবং আকবরী ঐতিহ্য ততদিনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। এমনকী অওরঙজেব-ও উপলব্ধি করেছিলেন যে, আমিরমণ্ডলী থেকে, এবং ইসলাম রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতার পরিচালন থেকে হিন্দুদের বহিষ্কার করা সম্ভব নয়।

এ-দিক থেকে দেখলে, জিজিয়া পুনর্বলবৎ করাটা অর্থহীন হয়েছিল। আমিরমণ্ডলীর একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী এর বিরোধিতা করেছিলেন, শোনা যায় জহানারা বেগম-ও ছিলেন এঁদের সাথে।[৫৩] এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, অওরঙজেব-এর মৃত্যুর পরে পরেই জিজিয়া প্রত্যাহারের যে-উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তাতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অওরঙজেব-এরই দুই অগ্রণী আমির—আসাদ খান ও জুল্‌ফিকার খান।[৫৪] স্পষ্টতই এঁরা শাসকশ্রেণীর সেই গোষ্ঠীর প্রতিনিধি ছিলেন যাঁরা জিজিয়াকে রাজনৈতিকভাবে অনুপযোগী ভাবতেন, এবং রাজনীতিতে ধর্মোপজীবী সম্প্রদায়ের হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বৃদ্ধিকে অরুচিকর মনে করতেন।[৫৫] স্বাধীন হিন্দু রাজাদেরও ব্যাপারটিতে ক্ষোভ ছিল।[৫৬] জিজিয়া-র চাপ কোন্ স্তরে কত ছিল তার হিসাব খুব সহজ নয়। ইদানীংকালের এক হিসাবে বলা হয়েছে, শহুরে শ্রমিককে বছরে এক মাসের মাইনে জিজিয়া হিসাবে দিতে হত।[৫৭] কিন্তু সম্ভবত দিনমজুর ও অন্যান্য দিন-আনা-দিন-খাওয়া লোকদের 'অকিঞ্চন' বর্গভুক্ত করা হয়েছিল,[৫৮] এবং তাদের জিজিয়া দিতে হত না। জিজিয়া থেকে কাউকে রেহাই[৫৯] দেওয়ার ব্যাপারে অওরঙজেব-এর ঘোর আপত্তি থাকা সত্ত্বেও উল্লিখিত রেহাইটি, মনে হয়, নিয়মিতই হয়ে গিয়েছিল।[৬০] ১৭০৪-এ দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধজনিত কারণে সমস্ত দাক্ষিণাত্যের জিজিয়া মকুব করা হয়েছিল।[৬১]

রাজনৈতিকভাবে, জিজিয়া-র বিরুদ্ধে সবচেয়ে জোরালো আপত্তি ছিল এই যে, এতে হয়রান ও অসন্তুষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে হিন্দুদের সবচেয়ে প্রভাবশালী স্তরটিকে—বিশেষত শহরবাসী বণিক, দোকানদার ও সাহুকার-দের দ্রুতবর্ধমান অংশটিকে যারা ক্রমশই দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিল।[৬২] জিজিয়া আদায়কারীরা এদের চূড়ান্ত হয়রান ও নিপীড়ন করত, এবং প্রতিবাদে এরা প্রায়ই 'হরতাল' ডাকত, বা একত্র জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ জানাত।[৬৩] আর শেষ বিচারে, সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের কাছে জিজিয়া-র স্লোগান ছিল হিন্দু ভাবপ্রবণতাকে সমাবেশিত করার এক জুতসই হাতিয়ার।[৬৪] তাই বুঝি শাহজাদা আকবর লিখতে পেরেছিলেন ঃ

> "আপনার রাজত্বে, হে মহামহিম, উজিরদের কোনো ক্ষমতা নেই, আমিরদের কেউ বিশ্বাস করে না, সৈনিকদের দারিদ্র্য মর্মান্তিক, লেখকরা কর্মহীন, ব্যবসায়ীরা সঙ্গতিহীন, কৃষকশ্রেণী ভূপাতিত...হিন্দু ফির্কা (জাতি বা সম্প্রদায়) দুই বিপর্যয়ের সম্মুখীন—(প্রথম) শহরে জিজিয়া-র উৎপীড়ন এবং (দ্বিতীয়) গ্রামাঞ্চলে হানাদার (অর্থাৎ, মারাঠা)-দের অত্যাচার। চতুর্দিক থেকে এই রকম দুর্বিপাক মাথার উপর চেপে বসতে থাকলে কেনই বা তারা শাসকদের ধন্যবাদ দিতে বা মঙ্গল কামনা করতে ভুলে যাবে না?"[৬৫]

জিজিয়া নিয়ে অওরঙজেব-এর পরীক্ষা নিরীক্ষা—যদি চোখে আঙুল দিয়ে

কিছু দেখিয়ে থাকে তবে—দেখিয়ে দিয়েছে ভারতে এমনকী ঔপচারিকভাবেও 'শরিয়া' ভিত্তিক রাষ্ট্রস্থাপনের, এবং ঐ ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ কায়েম করার অসম্ভাব্যতা। শেষ পর্যন্ত, আকবর-এর উদারনৈতিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রটিও থাকল না, আবার সুলতানী আমলের সঙ্কীর্ণতাবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থাও ফিরে এল না। ১৮শ ও ১৯শ শতাব্দীর মুসলমান শাসকদের অধীনে সাধারণভাবে যা টি'কে রইল, তা হল শাহ্‌জাহান-এর সারগ্রাহী আপসপন্থা।

টীকা

১. সরকার : 'অওরঙজেব', III, পৃ. ২৬৪-৫, ২৭৪, ৩২৫।

২. ফারুকি : 'অওরঙজেব অ্যাণ্ড হিজ্ টাইমস্', পৃ. ১৪৮-৫১ ; আই. এইচ. ক্যুরেশি : 'দ্য মুস্লিম কম্যুনিটি ইন দি ইন্দো-পাকিস্তান সাবকন্টিনেন্ট', পৃ. ১৬১-৩।

৩. 'মআসির-ই-আলমগীরী', বিব্লোথেকা ইণ্ডিকা, পৃ. ১৭৪।

৪. ঈসরদাস : 'ফাতুহৎ-ই-আলমগীরী', ব্রিটিশ ম্যুজিয়াম অতিরিক্ত সংগ্রহ [B. M. Add.], ২৩, ৮৮৪, পৃ. ৭৪ এ।

৫. 'মীরৎ-ই-আহ্‌মদী', বিব্লোথেকা ইণ্ডিকা, পৃ. ২৯৬।

৬. কেবলমাত্র আবু হনিফ-এর অনুগামীরা বলত ইসলাম, মৃত্যু, এবং জিজিয়া প্রদান—এই তিনটের মধ্যে যে কোনো একটি বেছে নেওয়ার কথা। অন্যান্য গোঁড়া 'মতবাদের অনুগামীরা শুধুমাত্র ইসলাম ও মৃত্যু—এই দুটির কথা বলত। (এন্‌সাইক্লোপিডিয়া অফ ইসলাম)।

৭. 'দি ইংলিশ ফ্যাক্টরিস্ ইন ইণ্ডিয়া', ফাওসেট সম্পাদিত, নিউ সিরিজ, III, পৃ. ২৪১। বোম্বাই-এর ডেপুটি গভর্ণর কাজটির গরজ হিসাবে বলেছেন, "শিবাজী, পাঠান ও রাজপুতদের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী ও যশোহানিকর যুদ্ধের ফলে এই রাজার কোষাগার প্রায় খালি হয়ে এসেছিল।" [O.C., খণ্ড ৪০, সংখ্যা ৪৭০৫, তাং ১৮ (?) অগাস্ট ১৬৬০]।

৮. মানুচ্চি এন. : 'Storia de nogor', ডব্লু. আরভিন অনূদিত, II, পৃ. ২৩৩-৩৪, III, পৃ. ২৮৮।

৯. হিন্দুদের আপন ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সংলগ্নতা, এবং তাদের ধর্মান্তরিত করার দুরূহতার জন্য দ্র. শেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়া : 'ফওয়াইদ-উল-ফুআদ', পৃ. ৬৫, ১৫০, ১৯৫-৭।

১০. এখানে এই বিতর্কে প্রবেশ করা সম্ভব নয় যে, ঐ সময়ে 'জিজিয়া' ও 'খরাজ' দুটি ভিন্ন কর ছিল কিনা, এবং হিন্দুদের উভয় করই দিতে হত কিনা। কেউ কেউ বলেছেন যে, মধ্যযুগের ভারতে জিজিয়া ও খরাজ ছিল অভিন্ন (পি. হার্ডি, দ্র: জিজিয়া, 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া অফ ইসলাম')। খরাজ ও জিজিয়া বহুক্ষেত্রে সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হলেও ১৪শ শতাব্দীর বেশ কিছু ধর্মপুস্তকে এ-দুটিকে আলাদা শুল্ক হিসাবে দেখানো হয়েছে। (দেখুন 'ফওয়াইদ-ই-ফিরোজ শাহী', বাঁকিপুর, XIV, সংখ্যা ১২২৫, পৃষ্ঠা ২৯৮ এ-৩০০ এ; 'ফিক্‌হ্-ই-ফিরোজ শাহী', ইণ্ডিয়ান অফিস লাইব্রেরি, লণ্ডন

সংখ্যা ২৯৮৭, পৃ. ৪১১ বি-৪১৯ এ)। কে. এ. নিযামি : 'সাম আসপেক্টস্ অফ রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড পলিটিকস্ ইন ইণ্ডিয়া ডিউরিং দ্য থার্টিনথ সেঞ্চুরি', আলিগড়, ১৯৬১, পৃ. ৩১৫-তে এই মতপ্রকাশ করা হয়েছে যে, জিজিয়া ছিল খরাজ-এর অন্তর্ভুক্ত এবং মোট ধার্য করের একটি অংশ, কিন্তু শহরাঞ্চলে কর নির্ধারণ সম্পর্কে এখানে কিছু বলা হয়নি। অওরঙজেব-এর আমলের (উত্তরোক্ত, পাদটীকা) প্রথমদিকে গ্রামীণ এলাকায় জিজিয়া ধরে নেওয়া হত খরাজ-এর মধ্যেই, কিন্তু শহরাঞ্চলে এ-দুটিকে আলাদা হিসাব করা হত। সুলতানী আমলেও সম্ভবতঃ এই ব্যবস্থাই ছিল।

১১. মধ্যযুগীয় ভারতে ইসলাম ধর্মান্তরণের সমস্যাটির জন্য দেখুন এস. নুরুল হাসান : 'চিস্তি অ্যাণ্ড সুরাওয়র্দি সিলসিলাজ ইন ইণ্ডিয়া ডিউরিং দ্য থার্টিনথ অ্যাণ্ড ফোর্টিনথ সেঞ্চুরিজ্', অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ; এস. এ. এ. রিজভি : 'মুসলিম রিভাইভ্যালিস্ট মুভমেন্টস্ ইন নর্দার্ন ইণ্ডিয়া ইন দ্য সিক্সটিন্থ সেঞ্চুরিজ্, আগ্রা ১৯৬৫, পৃ. ১৫-২১।

১২. 'মআসির-ই-আলমগীরী', পৃ. ১০০।

১৩. 'আলমগীর নামা', II, ৩৯২, ৪৩২-৮।
বিভিন্ন সময়ে অওরঙজেব-এর জারি করা বেশ কিছু আদেশ উল্লিখিত আছে মীরাট-ই-আহমদী পৃ. ২৫৯, ২৬৪, ২৮৬, ২৮৮-তে।
'মীরৎ', I, পৃ. ২৪৯-এ বলা হয়েছে, ঐ কর বিলোপের ফলে শুধু 'খালিস' জমিগুলিতেই ২৫ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

১৪. খাফি খান : 'মুন্তখব-উল-লুবাব', II, ৮৮-৯।

১৫. 'মীরৎ', পৃ. ২৮৮-৯১।

১৬. তুলনীয় আজিজ আহ্মদ : 'ইসলামিক কাল্চার ইন দি ইণ্ডিয়ান এনভায়রনমেন্ট', অক্সফোর্ড, ১৯৬৪, পৃ. ১৪৮।

১৭. শিবদাস লখ্নওয়ি : 'শাহনামা-ই মুনাওয়র কালাম', ব্রিটিশ ম্যুজিয়ম প্রাচ্য সংগ্রহ ২৬, পৃ. ৬৪ বি-৬৫ এ, ও তারপরে।

১৮. জগজীবন দাস—ইরফান হাবিব : 'অ্যাগ্রারিয়ান সিস্টেম অফ মুঘল ইণ্ডিয়া', এশিয়া, ১৯৬৩, পৃ. ৪০৯-এ উদ্ধৃত।

১৯. 'নিগরনামা-ই-মুন্শি', ব্রিটিশ ম্যুজিয়াম প্রাচ্য সংগ্রহ ১৭৩৫, পৃ. ৯৮ এ-বি, ও তারপরে ; 'মীরৎ-ই-আহ্মদী', I, পৃ. ২৯৮; ইরফান হবিব : 'অ্যাগ্রারিয়ান সিস্টেম অফ মুঘল ইণ্ডিয়া', পৃ ২৪৫। হবিব-এর বিবেচনায়, অক্কিসার ও জাগিরদার-রা ৪ শতাংশ বাঁধা হারে জিজিয়া জমা দেওয়ার পর কৃষকদের থেকে অনুমোদিত হারমাফিক জিজিয়া আদায় করত। পরে, বিশদীকৃত নিবন্ধ তৈরি হত জিজিয়া নির্ধারণ, আদায় ও তা-দ্বারা ব্যয়-নির্বাহের (তুমর-ই-জিজিয়া, মুজমল, জমা-খর্চ, রোজনামচা, অওয়ারজা); এবং চৌধুরি ও কানুনগো দ্বারা সেটিকে প্রতিস্বাক্ষরিত করিয়ে নিতে হত। ('খুলাসৎ', ৩৯ এ-বি). আদায় সাধারণতঃ হত রীতিমাফিক রাজস্বযন্ত্রের মাধ্যমে, জমিন্দার-দের সহায়তায়, এবং তদুপলক্ষ্যে নিযুক্ত আলিম-দের তত্ত্বাবধানে। বাদশাহ্পুর-এর শহর ও পরগনায় ধার্য 'তুমর-ই-জিজিয়া'র নমুনার জন্য দ্র. 'খুলাসাৎ-উস-সিয়াক', পৃ. ৩৯ বি-৪১ বি। এস. আর. শর্মা : 'রিলিজিয়াস পলিসি', ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৬৩-৪-তেও মহারাষ্ট্রে

প্রচলিত এ-ধরনের দস্তাবেজ সম্পর্কে উল্লেখ আছে। রাজস্থান স্টেট আর্কাইভস্-এও এইরকম দস্তাবেজ দেখা যায়।

২০. খাফি খান, ২৭৯, 'মআসির-উল-উমরা', III, ৬০৯-১০।

২১. "খুলাসৎ-উস-সিয়াক', পৃ. ৩৯ বি-৪১ ও তারপরে। এখানে যেভাবে গ্রামবাসী-দের বর্গীকরণ করা হয়েছে, সেটাই গ্রামীণ সমাজের ধাঁচ সম্পর্কে যথেষ্ট কিনা তা-তে সংশয় আছে। একটি গ্রাম নয়, বলা হয়েছে বাদশাহপুর পরগনায় একটি মৌজা (কয়েকটি গ্রাম মিলিয়ে)-র কথা। করদাতার সন্দেহজনক সংখ্যাল্পতা—মাত্র ২৮০ জন, এবং তার মধ্যে ১৮৫ জনকে কর জমা দিতে হত—দেখে মনে হয় যে, হয়ত সংখ্যাটি মনগড়া, কিম্বা গ্রামগুলিতে মুসলমানের সংখ্যাই বেশি ছিল, যারা করের আওতায় পড়ত না। (তুলনীয় আই. হবিব : 'অ্যাগ্রারিয়ান সিস্টেম', পৃ. ১১৯-২০).

২২. 'বম্বে L.S.', সংখ্যা ৯, তাং ৩.৬.১৬৮০ (সুরাট-এ); 'সুরাট ডায়রি L. S.', ৯১, তাং ১.১২.১৬৮২ (হুগলী-তে), তাং ৩০.১১.১৬৮২ (ইংল্যাণ্ড-এ), এবং এইরকম আরও। ইংরেজরা সুবেদার রন্মসৎ খান-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলে ১৬৮৩-এ অওরঙজেব-এর দরবারে একজন ওয়কিল পাঠায়; কিন্তু বাড়তি শুল্কের আদেশ প্রত্যাহার করানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। রোল এবং চাইল্ড উভয়েই বলেছেন ইউরোপীয়ান-দের সম্পর্কে ভারতবাসীর শ্রদ্ধাহানির কথা, অংশত তাদের "সময়মতো ঐ কর মেনে নেওয়ার" জন্য। ('ইংলিশ ফ্যাক্টরিস্', ফস্টার সম্পাদিত, ১৬৭৮-৮৪, পৃ. xxix)।

২৩. জয়পুর রেকর্ডস্ 'ওয়কা-ই পেপারস্' তাং ২৯ শবন [Sha'ban] বর্ষ ২৪/১৪ সেপ্টেম্বর ১৬৮০। এছাড়া 'মীরৎ', II, পৃ. ৩০-১ দেখুন।

২৪. এমন বলা হয়ে থাকে যে, পরহিতকর্মের জন্য স্বতন্ত্র অর্থভাণ্ডার গড়ে তুলে জিজিয়া রাজকোষের উপর চাপ খানিকটা কমিয়েছিল যার ফলে এযাবৎ পরহিতার্থে ব্যয়িত রাজকোষের অর্থ এখন অন্যত্র ব্যয় করা সম্ভব হচ্ছিল। কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে যে-কতটা সত্যিই করা গিয়েছিল, তা বলা মুশকিল। (তুলনীয় ফারুকি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮-৬১)

২৫. বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন আই. হবিব : 'অ্যাগ্রারিয়ান সিস্টেম', পৃ. ২৯৮-৩১৬। অওরঙজেব-এর আমলে দানগ্রহীতাদের অবস্থান দৃঢ়তর হয়েছিল. এবং জমিতে তাদের বংশগত অধিকার—রাষ্ট্রের কিছু নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে—স্বীকৃত হয়েছিল। মধ্যযুগে এই বর্গটি যে-কতটা প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল, এটি তারই এক দৃষ্টান্ত।

২৬. দ্র. বরানি : 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী', বিব্লোথেকা ইণ্ডিকা সিরিজ, পৃ. ৪১-৪ ; 'দ্য পলিটিকাল থিওরি অফ দ্য দিল্লি সুলতানেট' (কিতাব মহল, এবং তার আগে 'মিডিয়েভ্ল এণ্ডিয়া কোয়ার্টারলি', আলিগড়, খণ্ড ৩, পৃ. ১৩৭-৮-এ প্রকাশিত) রচনায় এম. হবিব কর্তৃক 'ফতওয়া-ই-জাহান্দারী'-র নির্বাচিত অংশের উদ্ধৃতি।

২৭. ওখানেই।

২৮. দ্র.—আলাউদ্দিন খিলজি-কে কাজি মুগিস-উদ্দিন-এর পরামর্শ—বরানি, পৃ. ২৯০। এছাড়া দেখুন শেখ অহ্মদ সরহিন্দি : 'মক্তুবৎ-ই-ইমাম-ই রব্বানি', খণ্ড ১, পত্র নং ১৬৩।

২৯. কে. এম. আশরফ : 'লাইফ অ্যাণ্ড কণ্ডিশন অফ দ্য পিপ্‌ল অফ হিন্দুস্থান', জার্নাল অফ রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ ব্রিটেন [J.R.A.S.B.], 'লেটারস্‌', খণ্ড ১, ১৯৩৫, পৃ. ১৮৩-৪ থেকে পুনর্মুদ্রিত।

৩০. ইব্রাহিম লোদির আমলে মিয়া হুসেন (ফারমুলী) কর্তৃক চান্দেরি-র কয়েকটি পরগনা রায় সালাদিন-কে 'ইক্তা'স্বরূপ দেওয়া হয়েছিল ; জগৎ-সিংহ কচ্ছাহা-কেও একটি 'ইক্তা' দেওয়া হয়েছিল ওখানে। সিকন্দর লোদির আমলে রায় গণেশ-কে একটি 'ইক্তা' দেওয়া হয়েছিল যার মধ্যে ছিল পাতিয়ালী, শমসাবাদ, কম্পিল এবং ভোগাঁও পরগনাগুলি। ('ওয়কিয়ত-ই মুশ্‌তাকি', আলিগড় ইউনিভার্সিটি রোটোগ্রাফ, পৃ. ৬৩বি ; 'তবাকৎ-ই আকবরী', বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা সিরিজ, ৩৩২ ; 'তারিখ-ই খান জাহানী', I, ১৭৩)। (এই সন্দর্ভগুলির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের জন্য আমি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ইক্‌তিদার সিদ্দিকি-র প্রতি কৃতজ্ঞ)। এছাড়া দ্র. এ. বি. পাণ্ডে : 'ফার্স্ট ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার', পৃ ১৪০ (রাজসিংহ কচ্ছাহা-র নরওয়াড় দুর্গে সেনাধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্তি) এবং এইচ. এন. সিন্‌হা : 'ডেভ্‌লপমেন্ট অফ ইণ্ডিয়ান পলিটি', ১৯৬৩, প. ৩৫৬-৬২।

৩১. আবুল ফজল : 'আকবরনামা', বেভারিজ অনূদিত, II, পৃ. ৩১৬-৭।

৩২. বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্র. এস. এ. এ. রিজ্‌ভি : 'মুসলিম রিভাইভালিস্ট মুভমেন্টস্‌ ইন নর্দার্ন ইণ্ডিয়া', ১৯৬৫, পৃ. ২৫৮-৬০।

৩৩. তুলনীয় বদায়ুনি, II, পৃ. ৩৩৯-এ মন্তব্য। এছাড়া দেখুন জাহাঙ্গীরের উদ্দেশে আজিজ কোকা-র পত্রাবলী, 'প্রসিডিংস্‌ অফ ইণ্ডিয়ান হিস্টরিকাল কংগ্রেস XXIII', ১৯৬১, পৃ. ২২৩।

৩৪. লাহৌরি : 'বাদশাহ্‌নামা', I, পৃ. ৩২৮।

৩৫. দেখুন সাক্সেনা, 'শাহ্‌জাহান'. ১৯৫৮, পৃ. ২৯৩-৪। দক্ষিণী রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে অভিযানকালে শাহ্‌জাহান ঘোষণা করেছিলেন, বিধর্মের মূলোচ্ছেদ করাই তাঁর ব্রত, এবং শিয়া 'খুৎবা'-র বিপদ সম্পর্কে গোলকুণ্ডা-র শাসককে সতর্ক করেছিলেন। (লাহৌরি, খণ্ড ১, ভাগ ২, পৃ. ১৩০-৩)।

৩৬. দ্র. রিজ্‌ভি : রিভাইভালিস্ট মুভমেন্টস্‌, পৃ. ৪০৭-৯।

৩৭. দ্র. এম. আত্‌হার আলি : 'রিলিজিয়াস ইস্যুস্‌ ইন দি ওয়র অফ সাক্‌সেশন', 'প্রসিডিংস, ইণ্ডিয়ান হিস্টরিকাল কংগ্রেস XXIII', ১৯৬১, পৃ. ২৫৩-৪।

৩৮. অওরঙজেব ও রাণা রাজসিংহ-এর মধ্যে পত্র বিনিময়ের জন্য দেখুন 'বীর বিনোদ', II, পৃ. ৪১৫-৩১। অওরঙজেব রাণাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সাত হাজারী পদ, ১৬৫৬-য় পৃথক্‌কৃত পরগণাগুলি পুনঃপ্রদান, এবং 'তাঁর পূর্বপুরুষদের সমতুল অনুদানাদি'-র।

অওরঙজেব ও জয়সিংহ-এর মধ্যে পত্র বিনিময়ের জন্য দ্র. সি. বি. ত্রিপাঠি : 'মির্জা রাজা জয়সিংহ', অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র, এলাহাবাদ।

৩৯. তাঁর দ্বিতীয়বার সিংহাসনারোহণের সময় সাম্রাজ্যের প্রধান কাজি এই মতপ্রকাশ করেছিলেন যে, অওরঙজেব-এর নামে 'খুৎবা' (রাজার মঙ্গলার্থে প্রার্থনা) পাঠ করা বৈধ হবে না যেহেতু তাঁর পিতা তখনও জীবিত। অওরঙজেব বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত কাজি অব্দুল ওয়াহাব

তাঁকে এই বলে উদ্ধার করেন যে, শাহ্জাহান যেহেতু অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ায় কাজকর্ম সামলাতে পারছেন না, অতএব অওরঙজেব-এর নামে 'খুৎবা' পাঠের বৈধতা নিয়ে আপত্তি উঠতে পারে না। কাজি অব্দুল ওয়াহাব-কে প্রধান কাজি-র পদ দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছিল। ('মীরৎ', I, পৃ. ২৪৮)।

৪০. 'খুলাসৎ-উস-সিয়াক,' আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৩৮বি।

৪১. সরকার : 'শিবাজী'. ৪র্থ সংস্করণ, ২১৪-৬।

৪২. সরকার : 'শিবাজী', পৃ. ২৭৭-৮০. বহ্লোল খান-এর সঙ্গে শিবাজী-র চুক্তির জন্য দ্র. 'অওরঙজেব' IV, পৃ. ২৪৩।

৪৩. জিজিয়া পুনর্বলবৎ, এবং রাষ্ট্রের ইসলামী চরিত্র ঘোষণা সত্ত্বেও দক্ষিণী রাজ্যগুলি অধিকারের পরিকল্পনায় সর্বস্তরের মুসলমানকে অওরঙজেব তাঁর সাথে পাননি। ১৬৮৬-তে কাজি শেখ-উল-ইসলাম এমন 'ফতোয়া' দিতে অস্বীকার করেছিলেন যে, বিজাপুর ও গোলকুন্ডা-র যুদ্ধ ছিল একটি 'জেহাদ'।' তাঁকে পদচ্যুত করে 'হজ'-এ যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল (আবুল ফজল মায়মুরি, আলিগড় ইউনিভার্সিটি রোটোগ্রাফ, পৃ ১৬২ এ)। গোলকুণ্ডা-র সঙ্গে শান্তি বজায় রাখার প্রস্তাব দেওয়ার জন্য কাজি আব্দুল্লাহ্-কে দরবার থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল (ওখানেই, পৃ. ১৭৩ বি)। বাহাদুর খান কোকলতাশ, সৈয়দ অব্দুল্লাহ্ খান, মুনিম খান নজ্ম সানি, সাদিক খান এবং শাহ্জাদা শাহ আলম-এর মতো আমির-রাও দক্ষিণী রাজ্যগুলিকে বলপূর্বক অধিকারের বিরোধিতা করে-ছিলেন। (মায়মুরি, পৃ. ১৭১ এ-বি; খাফি খান, II, পৃ. ৩৩০-৪)।

৪৪. দ্র. শেখ আমিন-এর উত্তরে অওরঙজেব-এর পত্র। তিনি প্রস্তাব দিয়ে-ছিলেন, শিয়া বখ্শীদের পদচ্যুত করা হোক।

৪৫. দ্র. আত্হার আলি : 'মুঘল নোবিলিটি আণ্ডার অওরঙজেব', এশিয়া, ১৯৬৬, পৃ. ৩১।

৪৬. আবুল ফজল মায়ামুরি (ব্রিটিশ মুাজিয়ম প্রাচ্য সংগ্রহ ১৬৭১, পৃ. ১৪৯এ) বলেছেন যে, জিজিয়া পুনর্বলবৎ করা হয়েছিল সৎনামী-দের দমনের পর অওরঙজেব-এর আজমীর যাত্রার আগে, এবং এর উদ্দেশ্য ছিল 'বিদ্রোহী নাস্তিকদের উৎপীড়ন করা' ('মনকুর সখ্তন কুফ্ফর-ই-দার-উল-হর্ব')।

৪৭. 'ওয়কা-ই সরকার আজমীর ওয় রণথম্বৌর', আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি-লিপি, পৃ. ২৪-৬, ৩০-২। সজ্জাদ-নশীন বলেছেন যে, রোজিনাদার-এর সংখ্যা দশ থেকে চল্লিশ গুণ বেড়েছিল।

৪৮. 'মআসির-ই আলমগীরী', পৃ. ১৭৪ ; 'মীরৎ', ২৯৭।

৪৯. 'ওয়কা-ই সরকার আজমীর', পৃ. ৪৭৩, ৪৭৬, ৫০৮-৯, ৬১৪, এবং এইরকম।

৫০. মানুচ্চি, II, ৪১৫ ; III, ২৯১; এছাড়া দ্র. 'দিলখুশা', পৃ. ১৩৯ বি।

৫১. 'অখ্বারাৎ' ২৩ রমজান বর্ষ ৩৮ / ১৮ মে ১৬৯৪। (আমির-উল-উমরা বহ্রামন্দ খান-এর মৃত্যুর পর তাঁর হিন্দু কর্মচারিদের বলা হল ব্যক্তিগত-ভাবে জিজিয়া দিতে) ; K. K., II, ২৭৮, ৩৭৭ (আমিন-ই-জিজিয়া নিহত হলেন)। এছাড়া দ্র. 'মালদা ডায়রি অ্যাণ্ড কন্সাল্টেশনস্', ডব্লু. কে. ফারমিঙ্গার সম্পাদিত, জার্নাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল

[JASB], নিউ সিরিজ, ১৯১৮, পৃ. ৯৭, ১২০; 'ডায়রি অফ উইলিয়ম হেজেস এস্কোয়ার' (১৬৮১-৮৭), হ্যাক্লুট, লণ্ডন, খণ্ড ১, পৃ. ১৩৬-৭। (শেষ দু-টি নথির জন্য আমি ডঃ ইরফান হবিব-এর কাছে কৃতজ্ঞ)।

৫২. মায়মুরি, পৃ, ১৪৯এ-বি; খাফি খান, II, ২৫৫।

৫৩. মানুচ্চি, IV, ২৮৮-৯১।

৫৪. সতীশ চন্দ্র: 'পার্টিস্ অ্যাণ্ড পলিটিকস্', পৃ. ৪৫। এর আগে, জিজিয়া থেকে কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না—এই আদেশ বলবৎ থাকা সত্ত্বেও আসাদ খান সর্বসমক্ষে তিরস্কার করেছিলেন দাক্ষিণাত্যের চারটি সুবা-র আমিন-ই-জিজিয়া শরিক খান-কে, জিজিয়া আদায়ে কঠোরতার জন্য। (জয়পুর রেকর্ডস্, 'অর্জদশ্ত', তাং ১৫ জমদা II বর্ষ ৩১/১৭ এপ্রিল ১৬৮৮)।

৫৫. দ্র. 'ওয়কা-ই আজমীর', পৃ. ৪৩৭। প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যে, কাজি-র বদলে প্রতি জেলায় দরবারের একজন আমির-কে জিজিয়া আদায়ের জন্য নিযুক্ত করা হোক।

১৬৭২-এ অওরঙজেব-কে লেখা একটি চিঠিতে মহাবৎ খান বক্রোক্তি করেছেন যে, "সাম্রাজ্য এখন কাজিদের ভরসায় চলছে।" (রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি [R.A.S.] অফ পার্শিয়া, সুচি ১৭৩, পৃ. ৮এ-১১এ)। আরেকটি ক্ষেত্রে, যখন জাফর খান ও মহাবৎ খান-কে বলা হল শিবাজীকে শায়েস্তা করতে, মহাবৎ খান তখন মন্তব্য করেছিলেন যে, সৈন্যসামন্তের দরকার নেই কারণ, একজন কাজি-র অভিশাপই এক্ষেত্রে যথেষ্ট হওয়া উচিত। (খাফি খান, II, ২১৬-৭)

৫৬. 'দিলখুশ' পৃ, ৭৫এ; 'মীরৎ', I, ৩৯০; জয়পুর 'রেকর্ডস্, 'অর্জ্দশ্ত', I, ৭৭ ডি, তাং ২৯ মহরম বর্ষ ৩৮/৩০ সেপ্টেম্বর ১৬৯৩)।

৫৭. আই. হবিব: 'অ্যাগ্রারিয়ান সিস্টেম', পৃ. ২৪৬-৭।

৫৮. 'জিম্মিনদার'। অবশ্য 'অকিঞ্চন' ও গরিব শব্দগুলির সংজ্ঞার্থ নিয়ে সর্বসম্মত কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। দ্র. অ্যাঘানাইডস্: 'মহামেডান থিওরিস্ অফ ফিন্যান্স', ১৯১৬, পৃ. ৩৯৯-৪০৫।

অওরঙজেব-এর আমলে এটা বিধিবদ্ধ হয়েছিল যে, "এক ব্যক্তির যদি কোনও সম্পত্তি না থাকে এবং শ্রম (কর্ব) থেকে তার উপার্জন যদি নিজের, ও পরিবারের প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক না হয়, তাহলে তার উপর জিজিয়া ধার্য হবে না।" ('মীরৎ', I, পৃ, ১৬৬-৭)।

'খুলাসৎ-উম-সিয়াক' (পৃ. ৩৯ বি)-এ বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি যদি সমস্ত অত্যাবশ্যক খরচ মিটিয়ে বছরে চল্লিশ দিরহাম (প্রায় দশ টাকা) জমাতে না পারে, তাহলে তাকে গরিব বলে ধরতে হবে।

এই ধারা অনুযায়ী মজুরদের রেহাই দেওয়া হত কি-না, সেটা স্পষ্ট নয়। সম্ভবত ব্যাপারটি নির্ভর করতে আমিন-এর বিচক্ষণতার উপর।

৫৯. অওরেঙজেব একবার দাক্ষিণাত্যের দেওয়ান আমানত খান-কে অর্ধেকেরও বেশি হিন্দুদের জিজিয়া-মুক্ত 'সনদ' মঞ্জুর করার জন্য ভর্ৎসনা করেছিলেন, এবং বলেছিলেন যে জিজিয়া পুনর্বলবৎ করতে তাঁকে অনেক মেহনৎ করতে হয়েছে। (মায়মুরি, পৃ. ১৭৯ এ; খাফি খান, II, পৃ. ৩৭৭-৮)

৬০. ফসল খারাপ হলে জিজিয়া মকুব করা হত (দেখুন 'নিগরনামা-ই মুন্শি', ব্রিটিশ ম্যুজিয়ম প্রাচ্য সংগ্রহ ১৭৩৫, পৃ. ১৮০ এ, ও তারপরে)। ১৬৮৮-৮৯-এ

হায়দরাবাদ সুবা-য় খরার জন্য এক বছরের জিজিয়াম কুব করা হয়েছিল। (ঈসরদাস, পৃ, ১১১ বি)

৬১. 'অখ্‌বারাৎ' ৪৮/৩৬ এবং এ ২৪৫, আই, হবিব : 'অ্যাগ্রারিয়ান সিস্টেম', পৃ ২৪৬-এ উদ্ধৃত।

৬২. মানুচ্চি বলেছেন, স্থানান্তরে যেতে হলে বণিকদের একটি রসিদ রাখতে হত যে, তারা জিজিয়া দিয়েছে। কিন্তু যদি ঐ রসিদটি খোয়া, বা চুরি যেত, তাহলে আবার তাদের জিজিয়া দিতে হত—একই অথবা অন্য সুবায় (II, পৃ. ৪১৫)। "কিন্তু যখন তারা অন্য রাজ্যে যেত, ঐ ছাড়পত্রের কোনও মূল্য থাকত না। যাওয়া এবং আসা উভয়পথেই সমপরিমাণ অর্থ আদায় করা হত। এইভাবে বণিকরা অত্যধিক করভারে নাজেহাল হত, এবং তাদের ও মাহকারদের মধ্যে অনেকেই এভাবে নিঃস্ব হয়েছিল" (IV, পৃ. ১৭৭)।

৬৩. দ্র. জয়পুর রেকর্ডস্, 'অর্জদশ্‌ত' ৭০৪, তাং ১২ জমদা I, বর্ষ ৪৯/১ অক্টোবর ১৭০৪ (জিজিয়া-র প্রতিবাদে উজ্জয়িনী-তে দোকানদারদের হরতাল) ; 'মীরৎ', I, পৃ ৩৪০-১ (দেশাই ও শেঠ-দের জিজিয়া-বিরোধিতা কঠোর হাতে দমন করতে হবে) ; মাআমুরি, পৃ. ১৪৯ এ-বি, খাফি খান, II. ২৫৫) দিল্লি-তে জিজিয়া-র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-সমাবেশ) ; এবং খাফি খান, II, ২৭৮ (বুরহানপুর-এ ফৌজদার ও মুকদ্দম-রা বিক্ষোভ ও প্রতিরোধে সামিল হয়েছিল)।

৬৪. দ্র. অওরঙজেব-এর উদ্দেশে শিবাজীর পত্র ('খতুৎ-ই শিবাজী', রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি পাণ্ডুলিপি [RAS MS], পত্র নং ৩২, সরকার অনূদিত ; 'শিবাজী', পৃ. ৩০৬-৯ ; 'বিসাৎ-উল-ঘনৈম', ইণ্ডিয়ান অফিস লাইব্রেরি, লণ্ডন ৩৫৯৫, পৃ-৫২এ-৫৫এ, ও তারপরে)।

৬৫. 'খতুৎ-ই শিবাজী', পত্র নং ১৫, ইংরাজি অনুবাদ ; 'অওরঙজেবস্ রেইন', ১৯৩৬, পৃ. ১০০-১।

৬

মুঘল সাম্রাজ্যের অভিজাতদের মধ্যে রাজস্ব-সম্পদের বণ্টন

এ. জান ক্যায়সর

মুঘল সাম্রাজ্যের অভিজাতশ্রেণীর উপার্জন ও অর্থনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে সাধারণভাবে অনেক কথা বলা হয়েছে। কিন্তু, এই লেখকের জ্ঞানমতে, মুঘল সাম্রাজ্যের শাসকদের বিভিন্ন স্তরে রাজস্ব-আয় বণ্টনের ধাঁচটিকে পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে ঢেলে সাজানোর কোনো চেষ্টা এখনো পর্যন্ত হয়নি।

এ-রকম বণ্টনের পরিসংখ্যান পেশ করার উপস্থিত প্রচেষ্টাটি মুঘল প্রশাসনিক কার্যপ্রণালী সম্পর্কে এমন দুয়েকটি অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত, যেগুলি এযাবৎ প্রাপ্ত প্রমাণাদি দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। প্রথম অনুমানটি এইরকম যে, যখন একজন অফিসার-এর বেতন অনুমোদিত হত বা, তাঁর জন্য কোনো জাগির মঞ্জুর হত, তখন তাঁর জাগির-এর অন্তর্গত এলাকাগুলির নামে যে-পরিমাণ অর্থ 'জমা' বা 'জমাদামি' হিসাবে শাহী নিবন্ধভুক্ত হত, ঠিক সেই পরিমাণ অর্থই বেতন (তলব) হিসাবে তাঁর প্রাপ্য ছিল। এই 'জমা' বলতে বোঝাত মুঘল প্রশাসনের দ্বারা নির্ধারিত রাজস্ব-আয়; এলাকাটির যথার্থ আয় (হাসিল) নয়। 'জমা' ও 'হাসিল'-এর মধ্যে এই পার্থক্য থেকেই তথাকথিত মাসিক বেতনহারের প্রবর্তন হয়।[১]

এখন এই পরিস্থিতিতে, যদি আমরা জানতে পারি বিভিন্ন স্তরের মুঘল মনসবদারদের প্রাপ্য বেতনের মোট পরিমাণ কত ছিল এবং একই বছরে শাহী খাতায় মোট জমা কত ছিল, তাহলে সাম্রাজ্যের মোট অনুমিত রাজস্ব-সম্পদে প্রত্যেক স্তরের প্রাপ্যাংশ বের করা যাবে। বিভিন্ন স্তরের অফিসারদের যথার্থ নগদ আয় জানা না গেলেও মোট আয়ে তাঁদের আনুপাতিক প্রাপ্যাংশ উপরোক্ত হিসাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে ধরা যেতে পারে।[২]

ঘটনাচক্রে, শাহ্‌জাহান-এর বিংশতি শাসনবর্ষের এমন তথ্যাদি আমাদের হাতে আছে যার ভিত্তিতে উপরোক্ত পরিসংখ্যানগত সমীক্ষা করা সম্ভব।

প্রথমত, ঐ সময়ের সরকারি বেতন-অনুসূচিগুলি পাওয়া গেছে: একটি শাহ্‌জাহান-এর ১৪শ শাসনবর্ষে অনুমোদিত,[৩] এবং আরেকটি অনুমোদিত হয়েছিল শাহ্‌জাহান-এর দেওয়ান সাদুল্লা খান কর্তৃক।[৪] অনুসূচি দুটি

সর্বাংশে এক, এবং অতএব, আমরা সপ্রত্যয়ে বলতে পারি বিংশতিবর্ষের যথার্থ বেতনহার কী ছিল।

শাহ্‌জাহান-এর রাজত্বকালের সরকারি ইতিহাস 'বাদশাহ্‌নামাতে' (অব্দুল হমিদ লাহোরি কর্তৃক রচিত) আমরা মনসবদারদের একটি তালিকা (এটিতে চারজন শাহ্‌জাদার নামও আছে) পাই, যাদের অধীনে ৫০০ বা তদধিক জাঠ ছিল। 'জাঠ' এবং 'সওয়ার' পদের বৈশিষ্ট্যগুলিও তালিকাটিতে দেওয়া ছিল।[৫] বেতন-অনুসূচিগুলি ব্যবহার করে আমরা প্রত্যেক মনসবদার-এর জন্য অনুমোদিত বেতন এবং বিভিন্ন স্তরের মনসবদার-দের মোট বেতনের হিসাব পেতে পারি। এছাড়া, ঐ (বিংশতি) বর্ষে সাম্রাজ্যের মোট জমাদামির সুবা-অনুযায়ী বিবরণও তালিকাটিতে আছে।[৬] কাজেই আমরা প্রাপ্য বেতনের মোট অঙ্ক ও সাম্রাজ্যের মোট জমার পরিমাণকে পাশাপাশি তুলনা করতে পারি।

কোনো-কোনো মনসবদার যে জাগির-এর পরিবর্তে নগদ বেতন পেতেন, তাতে আমাদের পরিসংখ্যানটি ভুল প্রমাণিত হবে না। সাধারণ জাগিরদাররা যেমন তাঁদের জাগির থেকে অনুমিত আয়ের সবটুকু পেতেন না, ঠিক তেমনই শাহী কোষাগার থেকে নগদ বেতনপ্রাপক মনসবদারদের জন্যও সাধারণভাবে মাসিক বেতনহার নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, অর্থাৎ তাঁরাও ধার্য বেতনের একটি অংশমাত্রই পেতেন। এটাও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তাঁদের নগদ বেতন আসত 'খালিস' বাবদ রাজস্ব থেকে, এবং শাহ্‌জাহান-এর বিংশতি শাসনবর্ষে ঐ জমার[৭] পরিমাণ ছিল মোট জমার[৮] $\frac{১}{৭}$ অংশ। আমরা মোটামুটি ধরে নিয়েছি যে, মনসবদারদের প্রাপ্য বেতন মিটিয়ে দেওয়া হত সরাসরি সমপরিমাণ জমার একেকটি জাগির প্রদান করে, নাহয় পরোক্ষভাবে, 'খালিস'-এর জমা থেকে একেকজনের প্রাপ্য বেতনের সমান একেকটি অংশ হিসাব করে নিয়ে।

'জাঠ' এবং 'সওয়ার' পদের বেতন আলাদাভাবে নির্ধারিত হত। প্রত্যেক জাঠ পদের বেতন অনুসূচিতে দেওয়া আছে; তাদের জন্য তিনটি বেতনহার ছিল, এবং সেগুলির কোন্‌টা প্রযোজ্য হবে তা নির্ভর করত মনসবদার-এর অধীনস্থ সওয়ার-সংখ্যার উপর, অর্থাৎ সওয়ার-সংখ্যা সমান, অর্ধেক বা তদধিক, কিম্বা অর্ধেকের কম, তার উপর।[৯] যেহেতু লাহোরি প্রত্যেক মনসবদার-এর অধীনে জাঠ এবং সওয়ার—উভয় পদই রেখেছেন, অতএব প্রত্যেক জাঠ পদের বেতন নির্ধারণ করতে হবে ঐ তিনটি বেতনহারের ভিত্তিতেই।[১০] সওয়ার পদের বেতন হিসাব করা হত সওয়ার পদসংখ্যাকে ৮,০০০ 'দাম' দিয়ে গুণ করে। 'দো-অস্প-সিহ্‌-অস্প' সওয়ার পদের ক্ষেত্রে গুণনীয়কটি ছিল ১৬,০০০ 'দাম'।[১১]

এই গণনার ফলাফল দেওয়া হয়েছে উপস্থিত রচনাটির শেষে, দুটি বিশদ

সারণিতে। প্রথম সারণিটিতে (সারণি 'ক') রয়েছে মোট বেতন-বিল (জাঠ এবং সওয়ার-দের প্রাপ্য বেতনসহ) এবং এটি ও মোট জমার অনুপাত। দ্বিতীয় সারণিটিতে (সারণি 'খ') রয়েছে জাঠ এবং সওয়ার পদের পৃথক পৃথক হিসাব—মোট বেতন-বিল, এবং এটির অনুপাতে জাঠ বেতন ও সওয়ার বেতনের শতকরা ভাগ।

আলোচ্য বিংশতিবর্ষের মনসবদার ও শাহ্‌জাদাদের যে-তালিকা লাহৌরি তৈরি করেছিলেন তাতে ৫৭৮ জনের নাম আছে। ১৬৪৭-৪৮ নাগাদ এঁদের ১৩৩ জনই ছিলেন মৃত। স্বাভাবিকভাবেই মৃতদের বেতন আমরা হিসাব করিনি, এবং আমাদের হিসাবের আওতায় এসেছেন ৪৪৫ জন মনসবদার (শাহ্‌জাদা-সহ)। ঐ সময়ে শাহ্‌জাহানের অধীনস্থ[১২] মনসবদার-এর সংখ্যা ছিল ৮,০০০ ; অর্থাৎ লাহৌরির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল মোট মনসবদারদের ৫·৬ শতাংশ মাত্র.

শাহ্‌জাহানের বিংশতি শাসনবর্ষে সাম্রাজ্যের মোট অনুমিত রাজস্ব ছিল ৮৮০ কোটি 'দাম'।[১৩] ৪৪৫ জন শাহ্‌জাদা ও আমীর-এর অধীনস্থ জাঠ এবং সওয়ার-দের মোট বেতন—উপরোক্ত অনুসূচি-মাফিক হিসাব করলে—দাঁড়ায় ৫৪১·০৯ কোটি 'দাম' যার মধ্যে মোট জাঠ বেতন ছিল ১২২·৮৭ কোটি 'দাম'।

সারণি 'ক' থেকে দেখা যায় যে, ৪৪৫ জন মনসবদার (চারজন শাহ্‌জাদা-সহ), বা অন্যকথায়, মনসবদারদের মাত্র ৫·৬ শতাংশের হাতেই ছিল সাম্রাজ্যের মোট অনুমিত রাজস্বের ৬১·৫ শতাংশ। রাজস্ব সম্পদ নিয়ন্ত্রণের এই তীব্র কেন্দ্রীভবন নিম্নলিখিত উদাহরণ থেকে আরেকটু প্রকট হবে :[১৪]

মনসবদার (এবং শাহ্‌জাদা)-এর সংখ্যা	জাঠ পদ	মনসবদারদের মোট সংখ্যা (৮০০০)-এর শতাংশ	মোট জমার শতাংশ
৪৪৫	৫০০ ও ততোধিক	৫·৬	৬১·৫
১১৪	১০০০ ,,	১·৪	৪৪·০
৭৩	২৫০০ ,,	০·৯	৩৭·৬
৩৫	৪০০০ ,,	০·৪	২৮·২
২৫	৫০০০ ,,	০·৩	২৪·৩
১০	৬০০০ ,,	০·১	১৩·৮
৪ শাহ্‌জাদা	১২০০০ ,,	০·০৫	৮·২০

কাজেই, মুঘল সাম্রাজ্যের বর্গক্রমিক আমলাতন্ত্রের শীর্ষস্থানীয় মাত্র ৭৩ জন শাহ্‌জাদা এবং আমির-ই (অর্থাৎ মনসবদারদের মোট সংখ্যার ০·৯ শতাংশ)

মোট জমার ৩৭·৬ শতাংশ—অর্থাৎ ⅓ অংশেরও বেশি—নিয়ন্ত্রণ করত। অন্যদিকে ৭,৫৫৫ জন মনসবদার (অর্থাৎ মনসবদারদের মোট সংখ্যার ৯৪·৪ শতাংশ)-এর বেতন হিসাবে প্রাপ্য ছিল সাম্রাজ্যের মোট অনুমিত রাজস্বের ২৫, বা খুব বেশি হলে ৩০ শতাংশ। মনসবদারদের নগদ বেতন (নক্দী) ছাড়া 'খালিস'-এর ব্যয়ও এর মধ্যে ধরা হত।

তবে, প্রত্যেক মনসবদার-এর বেতন-বিলের একটি বড় অংশ সম্ভবত নির্দিষ্ট ছিল তাঁর অধীনস্থ সওয়ার পদতুল্য একটি বাহিনী রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়নির্বাহের জন্য। বিভিন্ন স্তরের মনসবদারদের, ও তাঁদের একেকজনের অধীনস্থ জাঠ এবং সওয়ারদের প্রাপ্য বেতনের পৃথক পৃথক অঙ্কগুলি খুঁটিয়ে দেখলে এই ধাঁচটাই বেরিয়ে আসে।[১৫]

৪৪৫ জন মনসবদার (ও শাহ্‌জাদা)-এর অধীনস্থ সওয়ারদের মোট প্রাপ্য বেতন ছিল ৪১৮·২২ কোটি 'দাম'। এটি ছিল ৪৪৫ জন মনসবদার-এর অধীনস্থ জাঠ ও সওয়ারদের মোট প্রাপ্য বেতনের ৭৭·২ শতাংশ। সেনাদল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এই বিপুল ব্যয়সংস্থানের তাৎপর্য আরো বেড়ে যায় যখন দেখি যে, ৪৪৫ জন ব্যক্তি (যাঁদের একেকজনের অধীনে অন্তত্পক্ষে ৫০০ জাঠ ছিল) সাম্রাজ্যের মোট জমার ৪৭·৫ শতাংশ নিয়ে নিতেন তাঁদের অধীনস্থ সওয়ারদের বেতন হিসাবে।

সারণি ''খ' থেকে দেখা যায় যে, সেনাদল রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় ৪৪৫ জন মনসবদার-এর একজনেরও মোট প্রাপ্য বেতনের ৭০ শতাংশের কম ছিল না।[১৬] এ থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে মুঘল রাষ্ট্রের সামরিক সংগঠন খাতে বিপুল সম্পদ ব্যয়িত হত। কিন্তু হয়ত এটা অতিশয়োক্তি হল কারণ, এটা খুবই সম্ভব যে, অধীনস্থ সওয়ারদের প্রাপ্য বেতন হিসাবে যে-অর্থ মনসবদাররা সংগ্রহ করতেন, তার পুরোটা সেনাদল রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় করতেন না।

আমাদের অনুসন্ধানের আরেকটি দৃষ্টিকোণ হতে পারে আমিরদের বিভিন্ন স্তরের—যেমন ইরানি, তুরানি, বা জমিন্দার, খানজাদ ইত্যাদির—মধ্যে সম্পদ বণ্টনের হিসাবটি। এই অনুসন্ধানের জন্য অবশ্য লাহোরিক তালিকাভুক্ত প্রত্যেক মনসবদার-এর সামাজিক মূল খুঁজে বের করতে হবে। মনে হয়, এ-দিকে বিস্তৃত অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে আগ্রহোদ্দীপক ফলাফল পাওয়া যাবে।

শেষে এই কথা বলতে পারি যে, সারণিগুলি তৈরি করার সময় যদিও এগুলি দ্বারা উদ্‌ঘাটিত বণ্টন ধাঁচটি লক্ষ্য করে আমি চমৎকৃত হয়েছি, কিন্তু এটাও আমি জানি যে, এ-ধরনের পরিসংখ্যান উপস্থাপনার সীমাবদ্ধতাও অনেক। অতিসরলীকরণের ঝোঁক এড়ানো যায় না, অথচ বাস্তবে হয়ত ব্যবস্থাটি অত্যন্ত জটিল ছিল। যাই হোক, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি কিঞ্চিৎ মনোযোগ আকর্ষণ যদি করে থাকতে পারি, এবং যদি পারি সমস্যাটি নিয়ে গভীরতর

অধ্যয়নে কিছু উৎসাহ সৃষ্টি করতে, তাহলেই আমার উদ্দেশ্য সার্থক বলে মনে করব।

সারণি 'ক'

মনসব	মোট সংখ্যা	জাঠ এবং সওয়ার পদের মোট প্রাপ্য বেতন (কোটি 'দাম'-এ)	নির্ধারিত রাজস্ব-আয় (জমা)-র শতাংশ
শাহ্জাদা (৭০০০ জাঠ-এর অধিক)	৪	৭২·৪০	৮·২
৭০০০ জাঠ	৪	৪০·০০	৪·৫
৬০০০ ,,	২	৮·৮০	১·০
৫০০০ ,,	১৫	৯২·৯৭	১০·৫
৪০০০ ,,	১০	৩৩·৬৮	৩·৮
৩০০০ ,,	৩৩	৭৪·৩৪	৮·৪
২৫০০ ,,	৫	৮·৭২	০·৯
২০০০ ,,	৪১	৫৬·২৪	৬·৩
১৫০০ ,,	৩৫	৩৫·৩৩	৪·০
১০০০ ,,	৭০	৪৫·১১	৫·১
৯০০ ,,	১৮	৭·৮	০·৯
৮০০ ,,	৩০	১৪·৬২	১·৬
৭০০ ,,	৫২	১৭·৯১	২·০
৬০০ ,,	২৫	৮·৬০	০·৯
৫০০ ,,	১০১	২৪·৪৮	২·৭
মোট :	৪৪৫	৫৪১·০৯	৬১·৫

সারণি 'খ'

মনসব	মোট প্রাপ্য বেতন (কোটি 'দাম'-এ)	জাঠ বেতন (কোটি 'দাম'-এ)	মোট প্রাপ্য বেতনের শতাংশ	সওয়ার বেতন (কোটি 'দাম'-এ)	মোট প্রাপ্য বেতনের শতাংশ
শাহ্‌জাদা	৭২·৪০	১২·৪০	১৭·১	৬০·০০	৮২·৯
৭০০০ জাঠ	৪০·০০	৫·৬০	১৪·০	৩৪·৪০	৮৬·০
৬০০০ ,,	৮·৮০	২·৪০	২৭·৩	৬·৪০	৭২·৭
৫০০০ ,,	৯২·৯৭	১৪·৯৭	১৬·১	৭৮·০০	৮৩·৯
৪০০০ ,,	৩৩·৬৮	৭·৭৬	২৩·০	২৫·৯২	৭৭·০
৩০০০ ,,	৭৪·৩৪	১৮·৯০	২৫·৪	৫৫·৪৪	৭৪·৬
২৫০০ ,,	৮·৭২	২·৩২	২৬·৬	৬·৪০	৭৩·৪
২০০০ ,,	৫৬·২৪	১৫·২০	২৭·০	৪১·০৪	৭৩·০
১৫০০ ,,	৩৫·৩২	৯·২১	২৬·০	২৬·১২	৭৪·০
১০০০ ,,	৪৫·১১	১৩·১৫	২৯·২	৩১·৯৬	৭০·৮
৯০০ ,,	৭·৮৯	২·৫৬	৩২·৪	৫·৩৪	৬৭·৬
৮০০ ,,	১৪·৬২	৩·৫৮	২৪·৫	১১·০৪	৭৫·৭
৭০০ ,,	১৭·৯১	৫·৩০	৩০·০	১২·৬১	৭০·০
৬০০ ,,	৮·৬০	২·২৩	২৫·৯	৬·৩৮	৭৪·১
৫০০ ,,	২৪·৪৮	৭·৩০	২৯·৮	১৭·১৮	৭০·২

টীকা

১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন ইরফান হবিব : 'দি অ্যাগ্র্যারিয়ান সিস্টেম অফ মুঘল ইণ্ডিয়া', ১৯৬৩, পৃ. ২৬৪-৬ ও পাদটীকা। এছাড়া তুলনীয় এম. আত্‌হার আলি : 'দ্য মুঘল নোবিলিটি আণ্ডার অওরঙজেব', পৃ. ৪৬-৫৩।

২. যেহেতু আমাদের কাজ 'জমা' নিয়ে—'হাসিল' নিয়ে নয়—তাই আমাদের গণনায় মাসিক বেতনহারের বিশেষ কোনো তাৎপর্য থাকছে না।

৩. তুলনীয় 'সিলেক্টেড ডকুমেন্টস্ অফ শাহ্‌জাহানস্ রেইন', দফতর-ই দিওয়ানী. হায়দরাবাদ, ১৯৫০, পৃ. ৭৯-৮৯। এটি জারি হয়েছিল ইসলাম খান কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়ে।

৪. 'দস্তুর-অল অমল-ই আলমগিরি', ব্রিটিশ ম্যুজিয়াম অতিরিক্ত সংগ্রহ ৬৫৯৮, পৃ. ১২১এ-১২৩এ, ও তারপরে। তুলনীয় ইরফান হবিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮ ; আত্‌হার আলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৮।

৫. 'বাদশাহ্‌নামা' II, বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা সিরিজ, ১৮৬৮, পৃ. ৭১৭-৫২। লাহৌরি আরো একটি তালিকা দিয়েছেন (ওখানেই, I, পৃ. ২৯২-৩২৮) শাহ্‌জাহান-এর দশম শাসনবর্ষে ৫০০ জাঠ (বা ততোধিক) পদাধিকারী মনসবদারদের। কিন্তু আমাদের উপস্থিত অনুসন্ধানে তালিকাটিকে ব্যবহার করা যাবে না কারণ, লাহৌরি সেই বছরের জমার হিসেব দেননি।

৬. তত্রত্য, II, পৃ. ৭১০-১।

৭. তত্রত্য, II, পৃ. ৭১৩ (খালিস-এর জমা ছিল ১২০ কোটি 'দাম')। তুলনীয় ইরফান হবিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২, পাদটীকা ৬৯।

৮. 'বাদশাহ্‌নামা' II, পৃ. ৭১০। মোট জমার পরিমাণ ছিল ৮৮০ কোটি 'দাম'।

৯. দ্রষ্টব্য 'আইন-ই-আকবরী', নওলকিশোর, I, পৃ. ১২৩-৪। এটা বুঝতে হবে যে, ঐ তিনটি বেতনহারের মধ্যে পার্থক্য (মোট প্রাপ্য বেতনের তুলনায়) কমই শুধু ছিল না, একটি বিশিষ্ট ধাঁচও মেনে চলত। উদাহরণস্বরূপ, ১৫০০ থেকে ৫০০০ জাঠ পর্যন্ত ক্ষেত্রগুলিতে তিনটি বেতনহারের মধ্যে সাধারণ অন্তর ছিল ৩ লাখ 'দাম'; আবার ৫০০ থেকে ৯০০ জাঠ পর্যন্ত ঐ সাধারণ অন্তর ছিল ৫০ হাজার 'দাম'।

১০. ৬০০০ ও ততোধিক জাঠ পদাধিকারীর ক্ষেত্রে অবশ্য এই নিয়ম চলত না। (তুলনীয় 'সিলেক্টেড ডকুমেন্টস্ অফ শাহ্‌জাহানস্ রেইন', পৃ. ৭৯-৮০)।

১১. মোরল্যাণ্ড : 'র‍্যাঙ্ক (মনসব) ইন দ্য মুঘল স্টেট সার্ভিস', জার্নাল অফ রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৩৬, পৃ. ৬৪১-৬৫।

১২. 'বাদশাহ্‌নামা' II, পৃ. ৭১৫.

১৩. তত্রত্য, II, পৃ. ৭০৯.

১৪. সারণি 'ক' দ্রষ্টব্য।

১৫. সারণি 'খ' দ্রষ্টব্য।

১৬. একমাত্র ৯০০ জাঠ পদাধিকারীর ক্ষেত্রটি ছাড়া। সেখানে ঐ ব্যয় ছিল ৬৭·৬ শতাংশ।

৭

মুঘল চিত্রকলায় বিচিত্র-র অবদান

সোমপ্রকাশ বর্মা

মুঘল চিত্রকলার যাত্রাশুরু হয়েছিল আকবর-এর রাজত্বকালে; জাহাঙ্গীর-এর আমলে তা বিকশিত হতে থাকে, এবং ১৭শ শতাব্দীতে বিকাশের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছয়। মুঘলরীতির বিকাশ মূলত পাণ্ডুলিপি অঙ্কনকলা ধরেই হয়েছে। ইরানি এবং পাশ্চাত্য অঙ্কনরীতির (আকবর-এর রাজত্বকালের শেষদিক থেকেই যার প্রভাব চোখে পড়ছিল) প্রভাবে মুঘল চিত্রকরদের মধ্যে প্রতিকৃতি অঙ্কনের ঝোঁক দেখা দেয়। সাধারণভাবে এ-রেওয়াজ আকবর-এর আমলেও ছিল। নিজস্ব চিত্রকরদের দিয়ে তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতিকৃতি আঁকিয়েছিলেন, এবং একটি কলাভবনও নির্মিত হয়েছিল।[১] নিজের ছবির উপযুক্ত দেহভঙ্গি তিনি নিজেই দিতেন, সশরীরে চিত্রকরের সামনে বসে বা দাঁড়িয়ে।[২] তাঁর দরবারের চিত্রকরদের মধ্যে বসাওয়ন ছিলেন প্রতিকৃতি-অঙ্কনে অগ্রগণ্য। 'আইন-ই-আকবরী'তে আবুল ফজল এই চিত্রকরের কুশলতা ও ক্ষমতা সম্পর্কে বলেছেন যে, পটভূমির চিত্রণ ও মুখাবয়বের রেখাঙ্কন, রঙের বিস্তার ও বিভাজনক্রম, এবং প্রতিকৃতি-অঙ্কন ও অন্যান্য উপাঙ্গে বসাওয়ন সর্বাধিক দক্ষ ছিলেন।[৩] আকবর-এর অন্য চিত্রকরদের মধ্যে দসওয়ন্ত, মধু, লাল, কান্‌হা, মিস্কিন, সাম্বলা, তারা, নান্‌হা, ভগবান ও কেসু-র নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ১৬শ শতাব্দীতে চিত্রিত মুঘল পাণ্ডুলিপিগুলির অধিকাংশ প্রতিকৃতিই এঁরা করেছেন।[৪]

বর্তমান নিবন্ধে মুঘল আমলের যে চিত্রকরটিকে নিয়ে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি তাঁর নাম বিচিত্র। ১৭শ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় চতুর্থাংশই তাঁর কার্যকাল ছিল বলে মনে হয়। তাঁর যে-সমস্ত কাজ পাওয়া গেছে তাতে বলা যায়, জাহাঙ্গীর-এর আমলেই তিনি পূর্ণপ্রতিভাত হয়েছিলেন। 'শাহ্‌জাহাননামা' (১৬৫৭)-তে বিচিত্র-র কাজগুলি (পরিশিষ্ট, চিত্র নং ১৫) থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, তাঁর কার্যকাল শাহ্‌জাহান-এর রাজত্বকালের (১৬২৮-৫৮) অন্তিম চতুর্থাংশ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছিল।[৫]

বিচিত্র-র জীবনী বিষয়ে কিছু জানা যায় না। চিত্রকরদের কাজ ও ক্ষমতার দিকে জাহাঙ্গীর-এর সদাজাগ্রত দৃষ্টি ছিল, এবং আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী'তে তিনি অব্দুল সামাদ, অবুল হাসান, আকা রিজা, ফারুখ বেগ,

অনুসুর এবং বিশনদাস প্রমুখ চিত্রকরদের নাম উল্লেখ করেছেন।[৬] বিচিত্র, গোবর্ধন, মনোহর, হাশিম, দৌলত ও পিদারথ-এর মতো চিত্রকরদের নাম তদানীন্তন সাহিত্যে পাওয়া যায় না, যদিও নিজ নিজ ক্ষেত্রে এ'রা যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। ওয়াশিংটন-এর ফ্রিয়ার গ্যালারি অফ আর্ট-এ রক্ষিত 'জাহাঙ্গীর বিদ্বানকে মান্যতা দিচ্ছেন' (পরিশিষ্ট, চিত্র নং ৩)-শীর্ষক চিত্রটির ডানদিকে একটি-ছবি-হাতে এক যুবকের প্রতিকৃতিটিকে ইটিংসন বলেছেন—সম্ভবত বিচিত্র-র আত্মপ্রতিকৃতি।[৭] কিন্তু এর সপক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

'শাহ্‌জাহাননামা' পাণ্ডুলিপির একটি চিত্রে বর্ণিত আখ্যানমতে মকরা ছিলেন বিচিত্র-র পুত্র। পিতাপুত্র উভয়েই শাহ্‌জাহান-এর দরবারে নিযুক্ত ছিলেন, এবং উল্লিখিত পাণ্ডুলিপিটিতে উভয়েরই কাজ রয়েছে।[৮] জাহাঙ্গীর-এর আমলের কোনো রচনাতে মকরা-র নামোল্লেখ পাওয়া যায় না।

১৭শ শতাব্দীর মুঘল অঙ্কনরীতিতে বিভিন্ন বিষয়ের অভিব্যক্তি ও তার স্বচ্ছন্দ স্বরূপ মেলে। পাণ্ডুলিপির প্রসঙ্গচিত্র থেকে শুরু করে প্রতিকৃতি অঙ্কন চিত্রকরদের বিষয় ও আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে ওঠে যার মধ্যে রাজপুরুষ, বিশিষ্ট ব্যক্তি, সন্ত, গায়ক, শিল্পী এবং অন্যান্য শ্রেণীব মানুষের ছবিও ছিল। এর অনেকগুলিতে পশু-পাখি-ফুল বিষয়ক অধ্যয়নের ছাপ দেখা যায়। বিষয়-বৈভিন্ন্যের মধ্য দিয়ে ভাববৈভিন্ন্য ফুটিয়ে তোলার জ্বলন্ত উদাহরণ হল মুঘলরীতির এই রূপকাত্মক চিত্রগুলি। প্রাক্‌মুঘল যুগেও ভারতীয় চিত্রকলায় এই রূপকধর্মিতা চোখে পড়ে না। এর সমতুল রূপকধর্মী ইরানি চিত্রকলাতেও দুর্লভ। আকবর-এর রাজত্বকালের শেষদিক (১৬০০-৫) থেকেই এ-ধরনের চিত্রাঙ্কন শুরু হয়ে গিয়েছিল। বসাওয়ন-এর একটি কাজ 'দৈত্যের মাথার উপর দাঁড়ানো নারী' এর উত্তম উদাহরণ।[৯] একথা জোর দিয়েই বলা যায় যে, জাহাঙ্গীর-এর চিত্রকর বিচিত্র এবং অবুল হাসান-এর মৌলিক প্রয়াসের ফলেই রূপকধর্মী চিত্রকলার দ্রুত বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। এদিক থেকে দেখলে বিচিত্র-র কাজ 'জাহাঙ্গীর বিদ্বানকে সম্মান দিচ্ছেন' (সংরক্ষিত চিত্র নং ৩) একটি অপূর্ব কীর্তি। চিত্রটিতে জাহাঙ্গীরকে বালিঘড়ির সাংকেতিক আসনে অধিষ্ঠিত দেখানো হয়েছে। সম্রাটের প্রভুসত্তার ধারণা হিসাবে রূপকটি যথেষ্ট সফল। ইংল্যাণ্ডের সমসাময়িক সম্রাট প্রথম জেম্‌স এবং তুরস্কের সুলতানের (এই দুজনকে ছবির ডানদিকে আঁকা হয়েছে) প্রতি জাহাঙ্গীর-এর সদম্ভ দৃষ্টিপাত—যাতে তিরস্কারের ভাব ফুটে উঠেছে—ঐ ধারণাই দৃঢ় করে। বিচিত্র-র একই ধরনের আরেকটি কাজ 'শাহ্‌জাহান ভূমণ্ডলে দণ্ডায়মান' (পরিশিষ্ট, চিত্র নং ৭)। এই ছবিতে শাহ্‌জাহানের পদানত ভূমণ্ডল এবং শার্দূলের মুখলেহনরত মেষ চিত্রিত হয়েছে। এই রূপকদুটির মধ্য দিয়ে সম্রাটের অসীম প্রতিপত্তি এবং তাঁর দ্বারা শরণাগত দুর্বলজনের নিশ্চিন্ত

সুরক্ষার আশ্বাসটিই প্রকট হয়ে ওঠে। রূপকধর্মী চিত্রাবলীর মধ্যে অবুল হাসান-এর কাজ 'জাহাঙ্গীর ভূমণ্ডলে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তির মস্তকনিশানা অভ্যাস করছেন'[১০] এবং 'জাহাঙ্গীর ও শাহ্ আব্বাস-এর স্বপ্নাত্মক স্বীকৃতি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১১] রূপকধর্মী চিত্রগুলি সম্রাটের চিন্তাভাবনা সম্পর্কে চিত্রকরের প্রতিক্রিয়ার সূচক, এবং এগুলিতে তাঁর কল্পনাশক্তি ও সংযোজন প্রতিভার বিশেষ স্ফুরণ পরিলক্ষিত হয়। এ-দিক থেকে এই চিত্রগুলি মুঘল অঙ্কনরীতিতে মৌলিক।

রূপকধর্মী চিত্রাঙ্কনে বিচিত্র যেমন স্বতন্ত্র প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনই, পাশ্চাত্যরীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েও জ্যোতির্মণ্ডল চিত্রণে তিনি মৌলিক ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন (চিত্র নং ৩)। সূর্য ও চন্দ্রের সুসংগঠিত আকার এবং মধ্যের বিকীর্ণ পরিসর—যা তেজের প্রতীক—জ্যোতির্মণ্ডলের এই রূপটি ভারতীয় চিত্রকলায় এর আগে দেখা যায়নি। ইরানি এবং পাশ্চাত্য চিত্রকলাতেও এই রূপটি মেলে না। মুঘল চিত্রকলায় এটির সমতুল দৃষ্টান্ত অবুল হাসান-এর কাজ 'শাহ্‌জাহান-এর প্রতিকৃতি'।[১২]

জ্যোতির্মণ্ডল চিত্রণের প্রাচীনতম নজিরটি ভারতীয়। এটি পাওয়া গেছে গান্ধার স্থাপত্যকলায় (১ম-৩য় শতাব্দীর বুদ্ধমূর্তিগুলিতে)।[১৩] পরবর্তীকালে, দেবপ্রতিমার সঙ্গে জ্যোতির্মণ্ডলের রূপচিত্রণ মহাযান এবং জৈন কলায় ব্যাপক প্রচলিত হয়ে ওঠে। দৈব চিত্রাবলীতে জ্যোতির্মণ্ডলের সন্নিবেশ ভারতীয় কলায় একটি প্রথা হয়ে দাঁড়ায়, এবং এর কিছুটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নগ্নজীত-এর 'চিত্রলক্ষণম্' (৬ষ্ঠ–৭ম শতাব্দী) পাণ্ডুলিপিতে।[১৪] ৫ম শতাব্দীর পরে (বাইজ্যান্টাইন কলায়) জ্যোতির্মণ্ডল চিত্রণের দৃষ্টান্ত মেলে পাশ্চাত্যেও, রূপ এবং আকৃতির দিক থেকে যা গান্ধার শিল্পকলার সমতুল। এ-থেকে এটা বোঝা যায় যে, পাশ্চাত্য শিল্পকলায় জ্যোতির্মণ্ডলের সন্নিবেশ ভারতীয় শিল্পকলা দ্বারা অনুপ্রেরিত এবং প্রভাবিত। জ্যোতির্মণ্ডলের এই ঐতিহ্যময় বৃত্তটি ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্ব চিত্রকলায় একটি বহুল ব্যবহৃত আঙ্গিক হিসাবে সুপরিচিত ছিল। ঐ শতকের পরে ইরানি চিত্রকলায় জ্যোতির্মণ্ডলের এই বিশিষ্ট রূপটি প্রতিস্থাপিত হয় 'জ্যোতির্ময় কিরীট' দ্বারা, এবং তারপরই জ্যোতির্মণ্ডল চিত্রণের প্রথাটি ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে থাকে।[১৫]

এ-কথা ঠিক যে, প্রারম্ভিক মুগল চিত্রকলায় জ্যোতির্মণ্ডল চিত্রিত হত না, এবং ১৬শ শতাব্দীর প্রতিকৃতিগুলিতেও এটির সন্নিবেশ তেমন চোখে পড়ে না। এই সন্নিবেশ পুনর্লক্ষিত হয় জাহাঙ্গীর-এর আমল থেকে। তার আগের অনেক ছবিতেই প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতির সমতুল জ্যোতির্মণ্ডল এবং তার ঐতিহ্যময় বৃত্তটি চিত্রিত হয়েছে।[১৬] অতঃপর এটা বলা অসংগত হবে না যে, পাশ্চাত্য চিত্রকলার মাধ্যমেই মুঘল অঙ্কনরীতিতে ভারতীয় কলায় জ্যোতির্মণ্ডল চিত্রণের পুনরুত্থান হয়েছিল।[১৭] ভারতীয় কলায় জ্যোতির্মণ্ডল

চিত্রণের স্বাভাবিক রূপটি ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত পাওয়া গেছে। 'কল্পসূত্র' পাণ্ডুলিপির (১৫শ শতাব্দী) চিত্র থেকেও তা প্রমাণিত হয়।[১৮] জ্যোতির্মণ্ডলের 'বিকীর্ণ', 'প্রকাশপুঞ্জ' বা 'উদিতসূর্য' ধরনের রূপচিত্রণ নিশ্চিতভাবেই পাশ্চাত্য শিল্পকলার দ্বারা প্রভাবিত।[১৯] এই ধরনগুলি জাহাঙ্গীর-পূর্ব ভারতীয় শিল্প-কলায় অনুপস্থিত। বিচিত্র-র কাজ 'শাহ্‌জাহান—এক আমীরের সঙ্গে' (পরিশিষ্ট, চিত্র নং ১২)-তে জ্যোতির্মণ্ডলের চিত্রণ পাশ্চাত্য কলার (সম্ভবত একজন ডাচ চিত্রকরের) সরল অনুকৃতি। জ্যোতির্মণ্ডলের এই রকম রূপচিত্রণ দেখা যায় বিচিত্র-র আরেকটি কাজ 'শাহ্‌জাহান ভূমণ্ডলে দণ্ডায়মান' (পরিশিষ্ট, চিত্র নং ৭)-এ। 'জাহাঙ্গীর' (পরিশিষ্ট, চিত্র নং ১), 'শাহ্ দৌলত' (পরিশিষ্ট, চিত্র নং ৫), 'শাহ্‌জাহান' (পরিশিষ্ট, চিত্র নং ১০) ইত্যাদি চিত্রে জ্যোতির্মণ্ডলীয় বৃত্ত বিকীর্ণ ধরনে চিত্রিত হয়েছে, যা পাশ্চাত্য কলার সমতুল। কিন্তু সাদামাটা পটভূমির জন্য এই চিত্রগুলিতে জ্যোতির্মণ্ডলের রূপচিত্রণ যেন কিছুটা জড়তাগ্রস্ত। অবুল হাসান, মনোহর, বিশনদাস, গোবর্ধন এবং কালচন্দ্রের কাজগুলিতেও জ্যোতির্মণ্ডলের বিবিধ রূপচিত্রণ চোখে পড়ে।[২০]

মুঘলরীতিতে মূলত সম্রাটের প্রতিকৃতি অঙ্কনের মধ্যেই জ্যোতির্মণ্ডল চিত্রণ সীমিত ছিল। কখনো কখনো বিশিষ্ট সন্ত এবং যুবরাজদের প্রকৃতিতেও এটি চিত্রিত হত। বিচিত্র-র কাজ 'শাহ্ দৌলত' (পরিশিষ্ট, চিত্র নং ৫)-এ তার নিদর্শন মেলে।

মুঘল চিত্রাবলীতে দেবদূত অঙ্কনের প্রথাটি ভারতীয় স্থাপত্য ও চিত্রকলায় দেবদূত (গন্ধর্ব) অঙ্কনের ঐতিহ্যগত রীতিটির প্রভাব বহির্ভূত হয়। অজন্তা-র গুহাচিত্রে গন্ধর্বদের ব্যোমচর হিসেবে দেখানো হয়েছে।[২১] গন্ধর্ব-মূর্তির অনেক নজির ৫ম শতাব্দীর পরবর্তী স্থাপত্যকলায় চোখে পড়ে। অতঃপর এ-কথা বলা অসংগত হবে না যে, ভারতীয় চিত্রকলায় দেবদূতের স্থান মৌলিক এবং ঐতিহ্যগত।[২২] মুঘলরীতিতে এই প্রভাব 'রজ্‌মনামা' পাণ্ডুলিপির চিত্রগুলিতেও স্পষ্ট।[২৩] কিন্তু সাধারণভাবে মুঘলরীতিতে দেবদূতের চিত্রণ যে-স্বরূপ ও পটভূমিতে হয়েছে, তাতে পাশ্চাত্য কলার প্রভাবই প্রকট।[২৪] এগুলিকে সাধারণভাবে পাশ্চাত্য কাজগুলির অনুকৃতি বললেও ভুল বলা হয় না। চিত্রগুলিতে দেবদূত, সন্ত ইত্যাদির অঙ্গসংস্থান ও শৃঙ্গার, ভাবভঙ্গিমা প্রদর্শনে ছায়ার ব্যবহার, এবং বস্ত্রাদি ও বেশভূষা প্রায় সর্বাংশে পাশ্চাত্য-অনুকারী। যীশু এবং সন্তগণের নভোমণ্ডলস্থ চিত্রণও পাশ্চাত্য শিল্পকলারই অনুকৃতি। পাশ্চাত্য কলার দ্বারা প্রভাবিত দেবদূত চিত্রণের—'ঐশী বালক'-রূপে—সর্বপ্রথম নজির মেলে আকবর-এর আমলে চিত্রিত 'রজ্‌মনামা' (১৫৮০-৫ নাগাদ) পাণ্ডুলিপিতে।[২৫] 'রজ্‌মনামা'র আরেকটি প্রতিলিপি (১৫৯৮) থেকে পাওয়া অন্য দুটি চিত্রে পরীদের আঁকা হয়েছে পাশ্চাত্য-

রীতিতেই।[২৬] কিন্তু তাদের ডানাগুলিতে মুঘলরীতির ছাপ সুস্পষ্ট। দেবদূত এবং পরীদের এই চিত্রণে পাশ্চত্য ও মুঘলরীতির সমন্বয়, এবং চিত্রকরের মৌলিকতার পরিচয় মেলে।[২৭] ১৬শ শতাব্দীতে পরী চিত্রণের সর্বোত্তম উদাহরণ 'খমসা' (১৫৯৫ নাগাদ) পাণ্ডুলিপিতে মনোহর-এর কাজ। এতে পাশ্চত্য ও মুঘলরীতির উৎকৃষ্ট সমন্বয় হয়েছে, এবং পরীদের ভাবভঙ্গিমায় ইরানি চিত্রকলার (সেফেবিদ) ছাপও স্পষ্ট।[২৮]

জাহাঙ্গীরের আমলের চিত্রগুলিতে পরী চিত্রণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।[২৯] এই সময়ে এবং পরবর্তীকালে কেবলমাত্র দেবদূত (বিশেষত ঐশী বালকের রূপে) ও সন্তগণের নভোমণ্ডলস্থ চিত্রণ দেখতে পাই। 'জাহাঙ্গীর বিদ্বানকে সম্মান দিচ্ছেন' (পরিশিষ্ট, চিত্র নং ৩), 'আসফ খাঁ' (পরিশিষ্ট, চিত্র নং ১১) এবং 'শাহ্‌জাহান—এক আমীরের সঙ্গে' (পরিশিষ্ট, চিত্র নং ১২) —বিচিত্র-এর এই কাজগুলিতে ঐশী বালকরূপী দেবদূতের চিত্রণ পাশ্চাত্যরীতি (সম্ভবত ১৬শ শতাব্দীর ডাচ ঘরানা)-র উৎকৃষ্ট নিদর্শন। চিত্র নং ১২-তে যীশুর ছবি সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। এখানে একথা উল্লেখ করাও অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ঐ চিত্রগুলিতে পটভূমি সম্পাদনও (যাতে চঞ্চল বাদলরাজি অঙ্কিত হয়েছে) পাশ্চাত্যরীতিরই অনুকরণ।

বিচিত্র-র অন্য কাজগুলিতে (পরিশিষ্ট, চিত্র নং ৩-৫, ৮, ১০, ১৩, ১৬) পটভূমি অঙ্কিত হয়েছে সাদামাটা, গাঢ় অথবা হাল্কা রঙে—মূল চিত্রের রঙ সংযোজনের স্পষ্ট বৈপরীত্যে। এই প্রথাটি মূলত ইরানি চিত্রকলার, কিন্তু ভারতীয় চিত্রকলাতেও এর অল্পবিস্তর চলন ছিল। মুঘলরীতিতে পটভূমি সাধারণত সাদামাটা এক রঙে অঙ্কিত হত। বিচিত্র-র একটি কাজ 'শাহ দৌলত' (পরিশিষ্ট, চিত্র নং ৫) এর উৎকৃষ্ট নমুনা। এর ফলে পটভূমি থেকে ঊর্ধ্ব-অধোভাগ কিংবা অম্বরতলের আভাস মিলত না, কিন্তু এই ধারাটি মুঘলরীতিতে শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। এ-রকম পটভূমি অঙ্কনের অন্যান্য দৃষ্টান্ত অবুল হাসান, হাশিম, গোবর্ধন, অনূপছত্র, অমীচন্দ্র, দিলবরাং, হুনর, মনোহর, মনসুর প্রমুখ চিত্রকরদের কাজেও মেলে।[৩০]

পটভূমিতে ভূদৃশ্য চিত্রণ—যা সপ্তদশ শতাব্দীর মুঘল চিত্রাবলীতে কখনো কখনো দেখা যায়—পাশ্চাত্য কলার প্রভাবসূচক।[৩০] কিন্তু নিজস্ব গুণপনার পরিধিতে পাশ্চাত্যরীতির সমাবেশ করতে পারাটাই মুঘল চিত্রকরদের মৌলিকত্ব। এ-দিক থেকে বিচিত্র-র কাজ 'আসফ খাঁ' (পরিশিষ্ট, চিত্র নং ১১) বিশেষ উল্লেখ্য। চিত্রটির পটভূমিতে পাহাড়তলীর নগরভবনগুলি অঙ্কিত হয়েছে—উড়ন্ত পাখি যেমন একনজরে নিচের জিনিস দেখে—সেইভাবে। পাশ্চাত্য কলার 'দৃশ্য ভূমিকা' এবং ইরানি কলার 'পক্ষীদৃষ্টি' উভয় প্রবণতারই সমাবেশ হয়েছে চিত্রটিতে। এই সমাবেশই মুঘলরীতির বিশিষ্ট রূপ। অবুল হাসান-এর কাজ 'শাহ্‌জাহান-এর প্রতিকৃতি'[৩২] এবং আরেকটি অস্বাক্ষরিত কাজ

'বিচারমগ্ন সন্ত'[৩৩]-এ পটভূমির ঈদৃশ চিত্রণ রয়েছে। এ-দিক থেকে চিত্রগুলি মুঘলরীতিতে মৌলিক।

পটভূমি অঙ্কনের যে-বিবিধতা মুঘল চিত্রগুলিতে রয়েছে, পুরোভাগ সম্পাদনে তার যথেষ্ট অভাব চোখে পড়ে। পুরোভাগ সাধারণত একরঙা হত। প্রথাটি ইরানি শিল্পকলা থেকে গৃহীত। পুষ্পিত চারাগাছের ইতস্তত চিত্রণ কোনো-কোনো ছবিতে দেখা গেছে, এবং এটিও সম্ভবত ইরানি অবদান। পুরোভাগ চিত্রণের ঈদৃশ নজির মেলে ১৬শ শতাব্দীর মুঘল পাণ্ডুলিপিগুলিতে।[৩৪] প্রতিকৃতি অঙ্কনেও এই ঝোঁক চোখে পড়ে। বিচিত্র র কাজ 'শাহ্‌জাহান' (পরিশিষ্ট, চিত্র নং ১০)-এ ঐ প্রভাব স্পষ্ট। পুরোভাগ চিত্রণের এই ঝোঁকটির ব্যাপকতার পরিচয় মেলে অবুল হাসান, বালচন্দ, দৌলত (প্রথম), ফকির-উল্লা খান, গোবর্ধন, হুনর, মনোহর এবং সূর প্রমুখ চিত্রকরদের কাজ থেকে।[৩৫] পুরোভাগে 'দৃশ্য ভূমিকা'র মধ্য দিয়ে রঙের ক্রমিক প্রদর্শনের ধরনটিও পাশ্চাত্য প্রভাবমুক্ত নয়। বিচিত্র-র কাজে (পরিশিষ্ট, চিত্র নং ১-২, ৬, ৮, ১১-১২) এই প্রভাব স্পষ্ট।[৩৬]

মুঘল আমলের প্রতিকৃতি অঙ্কন মূলত ইরানি (সেফেবিদ ও তিমুরিদ) এবং মুঘলপূর্ব ভারতীয় কলা দ্বারা প্রভাবিত। প্রারম্ভিক মুঘলরীতির 'তিন-চতুর্থাংশ মুখচিত্রণ' জাহাঙ্গীরের আমলে প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়, এবং তার জায়গা নেয় 'অর্ধ মুখচিত্রণ'।[৩৭] এটিকে মুঘল চিত্রকলার ভারতীয়করণ বলা যেতে পারে। আকবর-এর রাজত্বকালের শেষদিক থেকেই এই পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যেতে থাকে।[৩৮] বিচিত্র কর্তৃক অঙ্কিত প্রতিকৃতিগুলিতে 'এক মুখ'-কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশনদাস ও অবুল হাসান-এর প্রতিকৃতি অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত হওয়ার কথা জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন।[৩৯] এ'দের অঙ্কিত প্রতিকৃতিগুলিতেও 'অর্ধ মুখচিত্রণ' পরিলক্ষিত হয়, এবং অন্যান্য মুঘল চিত্রকরদের অঙ্কিত প্রতিকৃতিগুলি সম্পর্কেও এ-কথা খাটে।[৪০]

পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতিতে পা-গুলি হত চ্যাপ্‌টা এবং একদিকে ঘোরালো (পরিশিষ্ট, চিত্র নং ১, ৪-৫, ৭-৮, ১০-১৪), এবং হাত সাধারণত থাকত খড়্গমুষ্টিবদ্ধ অথবা বিশ্রামভঙ্গিতে এলায়িত কিংবা রত্নালংকারজড়িত। এইসব এবং প্রস্ফুটিত পুষ্পধারক হস্তমুদ্রা (পরিশিষ্ট, চিত্র নং ১১, ১৪) ইরানি চিত্রকলা থেকে গৃহীত। অবশ্য (সম্রাট ও বিশিষ্ট সন্তগণের) প্রতিকৃতিতে হস্তধৃত ভূমণ্ডল-এর চিত্রণ মুঘলরীতিতে মৌলিক (পরিশিষ্ট, চিত্র নং ১, ৫)। কিন্তু আঙুলের মুদ্রায় ভারতীয় কলার ছাপ স্পষ্ট।[৪১] এই কারণেই হস্তমুদ্রা চিত্রণে যে-বিবিধতা মুঘল চিত্রকলায় চোখে পড়ে, ইরানি কলায় তা মেলে না। এ-দিক থেকে বিচিত্র-র কাজগুলি অতীব গুরুত্বপূর্ণ (বিশেষত পরিশিষ্ট, চিত্র নং ২-৩, ৬, ১২)।

মুখচিত্রণে হাবভাব ও মাংসপেশীর প্রদর্শন, ছায়া এবং প্রকরণ প্রয়োগে

পাশ্চাত্য কলার ছাপ স্পষ্ট (পরিশিষ্ট, চিত্র নং ১-৬, ১১-১২)। পরিধান ও বস্ত্রাদির অঞ্চল চিত্রণে মুঘল চিত্রকরেরা ঐ প্রকরণের সফল প্রয়োগ করেছেন। ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীর ইরানি চিত্রকলায় একরঙে মুখচিত্রণ হত। এর বিপরীতে, মুঘলপূর্ব ভারতীয় কলায় (স্মরণীয় অজন্তা-র গুহাচিত্র) চিত্রের উন্নত ভাগ প্রদর্শনের জন্য নিকটকে ছায়াবৃত্ত দেখানো হত। এর ফলে ছবি থেকে দৈর্ঘ্য-প্রস্থের ধারণা পাওয়া যায়। এই ধারণা জৈন চিত্রাবলী থেকে মেলে না।

প্রতিকৃতি অঙ্কনে মনোভাব ফুটিয়ে তোলার দিক থেকে বিচিত্র-র প্রয়াস সফল ও প্রশংসনীয়। তাঁর কাজ 'গায়ক, বাদক এবং অন্য' (পরিশিষ্ট, চিত্র নং ৬) এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ। গায়কের মুখভঙ্গি ও আলাপ ক্রিয়া, শিকারীর মন্ত্রমুগ্ধ ও বিভোর দশার চিত্রণ ছবিটিতে লয় ও গতির প্রতীক। সাধারণ মানুষের যথাযথ চিত্রণ[৪২] ভারতীয় কলায় মুঘল চিত্রকরদের বিশেষ অবদান। উল্লিখিত চিত্রটির পটভূমিতে বৃক্ষ, কুটির ও চরকা, এবং পুরোভাগে ক্লান্ত গ্রামবাসী (বিশ্রামরত) গ্রামীণ জীবনের পূর্ণ দৃশ্যগত প্রভাব সৃষ্টি করে। এর সমতুল দৃষ্টান্ত মুঘল চিত্রকলায় দুর্লভ। সাধারণ মানুষের কাজকর্মের সজীব চিত্রণের এটি এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্যমী লোকদের দৈনন্দিন জীবনের পটভূমি ও পরিসরে চিত্রণ জাহাঙ্গীর এবং শাহ্‌জাহান-এর আমলের চিত্রকরদের কাজের অচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। সাধারণ মানুষের এত বিশদ চিত্রণ মুঘলপূর্ব কিংবা মুঘল আমলের ভারতীয় কলায় আর দেখা যায়নি।[৪৩] তখনকার মুঘল চিত্রকলায় জনজীবনের প্রতিনিধিত্ব হয়েছিল বললে অত্যুক্তি হয় না।

বিচিত্র-র কাজগুলিতে বয়োলক্ষণেরও সফল চিত্রণ দেখা যায়। এটি স্পষ্ট বোঝা যায় তাঁর 'শাহ্‌জাহান-এর প্রতিকৃতি, চল্লিশ বছর বয়সে' (পরিশিষ্ট, চিত্র ১০) কাজটির সাথে অবুল হাসান-এর কাজ 'শাহ্‌জাহান (খুরম)'[৪৪]-এর তুলনা করলে। বিচিত্র-র অন্য কাজ 'শাহ্‌জাহান—এক আমীরের সঙ্গে' (পরিশিষ্ট, চিত্র নং ১২)-তে শাহ্‌জাহান-এর বয়স অপেক্ষাকৃত বেশি বলে বোধ হয়, এবং এটির সময়কাল ১৬৪৫-৫০। 'জাহাঙ্গীর বিদ্বানকে সম্মান দিচ্ছেন' (পরিশিষ্ট, চিত্র নং ৩) কাজটিতে জাহাঙ্গীর-এর প্রৌঢ়, দুর্বল ও শিথিল শরীর এবং মুখের স্থির ও অলস ভাব থেকে এটির সময়কাল ১৬২৫-২৮ বলেই মনে হয়। জাহাঙ্গীর-এর অধিক বয়সের অভিব্যক্তি একমাত্র এই ছবিটিতেই বিশ্বাসযোগ্যভাবে ফুটে উঠেছে। বিচিত্র-র অন্য একটি কাজ 'জাহাঙ্গীর' (পরিশিষ্ট, চিত্র নং ১) কিছু আগেকার, কিন্তু দুটি ছবিতেই তাঁর ব্যক্তিত্ব, আকৃতি এবং অভিলক্ষণের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। সংলক্ষণগত প্রতিকৃতি অঙ্কনে বিচিত্র স্পষ্টতই সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছিলেন। এই জাতের অন্যান্য চিত্রকরদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন অবুল হাসান, বিশনদাস, মনোহর, গোবর্ধন, হাশিম প্রমুখ।

মুখাকৃতির সজীবতা ও লক্ষণগত প্রবৃত্তির অভিব্যক্তিকে প্রতিকৃতি অঙ্কনে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। 'পূর্ণাবয়ব' অঙ্কনে শরীরের প্রান্তভাগ—পায়ের অবস্থান, হাতের ভঙ্গিমা, বক্ষস্থল প্রভৃতি—গতানুগতিকভাবে অঙ্কিত হত (পরিশিষ্ট, চিত্র নং ১, ৭-৮, ১০-১৪)। দ্বিতীয় ঝোঁকটি প্রথমটির বিপরীত, কিন্তু এই বৈপরীত্যের ফলে সঙ্গতির অভাব ঘটেনি।[৪৫] বেসিল গ্রে এবং ডগলাস ব্যারেট যথার্থই বলেছেন যে, মুঘল প্রতিকৃতিগুলিতে আদর্শীকরণকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।[৪৬]

বিচিত্র-র দুটি কাজ 'মহম্মদ রিজা কাশ্মিরী' (পরিশিষ্ট, চিত্র নং ৪) এবং 'শাহ্ দৌলত' (পরিশিষ্ট, চিত্র নং ৫)-এ ছবির পাড় চিত্রণে ১৭শ শতাব্দীর মুঘল অঙ্কনরীতির অভিনব ঝোঁকটি চোখে পড়ে। মূল ছবির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত পাড় চিত্রণের রেওয়াজ আকবর-এর আমল থেকেই ছিল। 'দেওয়ান-ই-হাফিজ' (রাজকীয় সংগ্রহালয়, রামপুর, ১৫৮৫ নাগাদ) পাণ্ডুলিপির অলংকৃত পাড়টিই 'পাড় চিত্রণে'র প্রথম দৃষ্টান্ত।[৪৭] পরবর্তীকালে চিত্রিত 'খম্‌সা' (ব্রিটিশ মু্যজিয়ম, ১৫৯৮) এবং 'বাবরনামা' (ব্রিটিশ মু্যজিয়ম, ১৬০০) পাণ্ডুলিপির পাড় চিত্রণ[৪৮] ঐ পদ্ধতিরই ক্রমবিকাশসূচক। আদি মুঘলরীতিতে ছবির পাড় চিত্রিত হত না। 'হম্‌জানামা', 'অনওয়ার-ই-সুহেলী', 'রজ্‌মনামা', 'রামায়ণ', 'জামীয়ুৎ তওয়ারিখ', 'তারিখ-ই-খানদান-ই-তিমুরিয়া' ইত্যাদি পাণ্ডুলিপিতে পাড় চিত্রণ চোখে পড়ে না। এই ঝোঁকটি এসেছে ইরানি চিত্রকলা থেকে। ১৫শ-১৬শ শতাব্দীর ইরানি (তিমুরিদ ও বুখারা) কলায় চিত্রিত পাড় ছবির দৃষ্টান্ত মেলে।[৪৯] অবশ্য মুঘলরীতিতে পাড় চিত্রণ অপেক্ষাকৃত উন্নত। জাহাঙ্গীর-এর আমলে এক পৃথক শাখার কলা হিসাবে পাড় চিত্রণের বিকাশ হয়, এবং আলংকারিকও জ্যামিতিক আকার ছাড়াও ভূদৃশ্য, পশু-পাখি-মানুষ, প্রতিকৃতি, পুষ্পিত লতা, পাশ্চাত্য কাজ ও ক্ষোদিত চিত্রাবলীর অঙ্কন অসাধারণ কদর পেতে থাকে।[৫০] শাহ্‌জাহান-এর আমলে প্রথাটি প্রভূত বিকশিত হয়, এবং প্রতিকৃতি অঙ্কন ও পাড় চিত্রণ অবিচ্ছেদ্য হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মুঘলরীতিতে পাড় চিত্রণের কাজটি মূল ছবির রূপকার কর্তৃক সম্পাদিত হত না। একটি পাণ্ডুলিপির ভিন্ন ভিন্ন চিত্রে (উদাহরণস্বরূপ, 'বাবরনামা' ও 'খম্‌সা') একই পাড় চিত্রণ থেকেও সে-কথাই মনে হয়। অবশ্যই পাড় চিত্রকরের নামোল্লেখ করা হত না। চিত্রিত পাড়ে স্বাক্ষর বা নামাঙ্কন মুঘল চিত্রকলায় দুষ্প্রাপ্য।[৫১]

মূল চিত্রেরও নামাঙ্কন হত দরবারি লিপিকার কর্তৃক। স্ব-নামাঙ্কিত চিত্রের সংখ্যা খুব বেশি নয়। অব্দুস সামাদ ও মীর সৈয়দ আলি-র কাজ এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।[৫২] কোনো কোনো চিত্রের মূল পটভূমিতে চিত্রকরের নামাঙ্কনকে তাঁর স্বহস্তলিপি বলে মেনে নেওয়া যায়। 'শাহ্‌জাহান—এক

আমীরের সঙ্গে' (পরিশিষ্ট, চিত্র নং ১২) এবং 'শাহ্ দৌলত' (পরিশিষ্ট, চিত্র নং ৫) কাজ দুটির পটভূমিতে চিত্রকরের নামঙ্কন সম্ভবত তাঁর (বিচিত্র-র) স্বহস্তলিখিত।

চিত্রের সঙ্গে চিত্রকরের নামাঙ্কনের প্রথাটি ভারতীয় কলায় মুঘলরীতির অবদান। মুঘলপূর্ব ভারতীয় কলায় নামাঙ্কিত বা স্বাক্ষরিত চিত্রের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। মুঘলরীতির উদ্ভবকালেও এই প্রথার চল ছিল না। 'হমজানামা', 'অনওয়ার-ই-সুহেলী' (স্কুল অফ ওরিয়েণ্টাল অ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ, ইউনিভার্সিটি অফ লণ্ডন, ১৫৭০) থেকে তার নজির পাওয়া যায়। এই নজিরের পরিপ্রেক্ষিতে মুঘল কলায় চিত্রকরের নামাঙ্কনের প্রথাটি ইরানি চিত্রকলা (যেখানে ১৫শ শতাব্দী থেকেই নামাঙ্কিত চিত্রের প্রচলন) দ্বারা প্রভাবিত—একথাও বলা চলে না। বরং এ-রকম হওয়াই সংগত যে, মুঘল রাজদরবারে নিযুক্ত চিত্রকরদের কাজ নিরীক্ষা, কার্যকুশলতার ভিত্তিতে পদোন্নতি, পুরস্কার এবং উৎসাহদানের জন্যই কাজগুলিতে চিত্রকরের নাম থাকা আবশ্যক ছিল।[৫৩] মুঘল পাণ্ডুলিপির চিত্রগুলিতে চিত্রকরের নাম অধিকাংশতই এক হস্তলিপিতে লেখা দেখে মনে হয় এই বিশেষ কাজটির ভার ছিল দরবারি লিপিকারের হাতে।

বিচিত্র-র কাজ 'জাহাঙ্গীর বিদ্বানকে সম্মান দিচ্ছেন' (পরিশিষ্ট, চিত্র নং ৩) এবং 'মহম্মদ·রিজা কাশ্মিরী' (পরিশিষ্ট, চিত্র নং ৪)-এর পাড় চিত্রণে লিপির সংযোজন মুঘল চিত্রকলায় সুলিপি ও চিত্রণের সমন্বয়ের প্রতীক। সুলিপি ও চিত্রণের যে-অভিন্ন সম্বন্ধ প্রারম্ভিক মুঘল চিত্রকলায় চোখে পড়ে—ভারতীয় কলার প্রভাবে চিত্রে একরূপতাকে অধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে—তা কালক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসে। আকবর-এর রাজত্বকালের শেষদিকের কাজগুলিতে এই লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। 'আকবরনামা' পাণ্ডুলিপির (ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড অ্যালবার্ট ম্যুজিয়ম, লণ্ডন, ১৬০০-৫ নাগাদ) চিত্রগুলি তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।[৫৪] জাহাঙ্গীর-এর আমলের পাণ্ডুলিপির চিত্রগুলিতে সুলিপির চলন প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছিল, এবং প্রতিকৃতি অঙ্কনেও এটির সাক্ষাৎ মেলে না। পাড় চিত্রণে অবশ্য এটির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বিচিত্র-র উপরোক্ত কাজ দুটি ছাড়া মনসুর, পিদারথ, অবুল হাসান, বালচন্দ, ফরুখ বেগ, বিশনদাস, মীর হাশিম, নীনী প্রমুখের কাজেও[৫৫]এর নিদর্শন মেলে। সুলিপি ও চিত্রণের এই সম্বন্ধ ইরানি চিত্রকলা থেকে মুঘল অঙ্কনরীতিতে এসেছে, এবং প্রায় শেষ পর্যন্ত—সীমিত দশায় হলেও—টিকে থেকেছে।

জাঁ পুজি ম্যুজিয়ম, প্যারিস-এ সংরক্ষিত[৫৬] আরেক সমসাময়িক মুঘল চিত্রকর বিচিত্ররায়-এর দুটি কাজকে অঙ্কনরীতি ও কুশলতার দিক থেকে বিচিত্র-র সমতুল বলেই মনে হয়।

ভাব চিত্রণ ও সংযোজনে বিচিত্র-র মৌলিকতা স্পষ্ট, কিন্তু এটা কোনো

বিশেষ পদ্ধতি বা রীতির যোগসাধনে সহায়ক হয়নি বলেই মনে হয়। লক্ষণগত প্রবৃত্তি অঙ্কনের দিক থেকে বিচিত্র-র কাজগুলিতে মুঘল শৈলী-বহির্ভূত কিছুর আভাস মেলে না।

পরিশিষ্ট

চিত্র নং ১. 'জাহাঙ্গীর ডানহাতে ভূমণ্ডল ধরে আছেন'। সংগ্রহ—চেস্টার বেটি লাইব্রেরি ; ডাবলিন। প্রতিলিপি—আর্নল্ড অ্যাণ্ড উইলকিন্সন : 'এ ক্যাটালগ অফ ইণ্ডিয়ান মিনিয়েচারস্', খণ্ড ৩ (লণ্ডন, ১৯৩৬), প্লেট ৫৭।

২. 'যুবরাজ উদ্যানে মদিরাপান করছেন, বিদ্বান এবং গায়কদের মণ্ডলীতে'। সংগ্রহ—চেস্টার বেটি লাইব্রেরি, ডাবলিন। প্রতিলিপি—আর্নল্ড অ্যাণ্ড উইলকিন্সন, প্লেট ৫৮।

৩. 'জাহাঙ্গীর বিদ্বানকে সম্মান দিচ্ছেন'। সংগ্রহ—ফ্রিয়ার গ্যালারি অফ আর্ট, ওয়াশিংটন। প্রতিলিপি—এটিংহাউসেন : 'পেইন্টিংস অফ সুলতানস্ অ্যাণ্ড এম্পারারস্ অফ ইণ্ডিয়া ইন আমেরিকান কালেকশনস্' (দিল্লি, ১৯৬১), প্লেট ৫১।
এটিংহাউসেন-এর মতে প্রথম জেমস (ইংল্যাণ্ডের সম্রাট)-এর ছবিটি সম্ভবতঃ স্যার টমাস রো কর্তৃক আনীত মূল চিত্রের অনুকৃতি।

৪. 'মহম্মদ রিজা কাশ্মিরী'। সংগ্রহ—চেস্টার বেটি লাইব্রেরি, ডাবলিন। প্রতিলিপি—আর্নল্ড অ্যাণ্ড উইলকিন্সন, প্লেট ৬০।

৫. 'শাহ্ দৌলত'। সংগ্রহ—চেস্টার বেটি লাইব্রেরি, ডাবলিন। প্রতিলিপি—আর্নল্ড অ্যাণ্ড উইলকিন্সন, মলাটের প্লেট। এই সন্তের আরেকটি ছবিও এই সংগ্রহে রয়েছে যা দিলবরাৎ-এর কাজ। দুটি ছবির তফাৎ লক্ষণীয়।

৬. 'গায়ক, বাদক এবং অন্য'। সংগ্রহ—ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড অ্যালবার্ট ম্যুজিয়ম, লণ্ডন। প্রতিলিপি—শ্চুকিন : 'লা পঁাত্যুর অ্যাঁদিয়েন (প্যারিস, ১৯২৯), প্লেট ৪৪।
এই গায়কের আরেকটি প্রতিকৃতি গোবর্ধন-এর কাজ 'গায়ক এবং অন্য'-তে আছে (প্রকাশ—আর্নল্ড অ্যাণ্ড উইলকিন্সন, তৃতীয় খণ্ড, মলাটের প্লেট। দুটি ছবিতেই গায়কের চিত্রণ সমরূপ। ভাব-ভঙ্গিমার বিচারে গোবর্ধনের 'গায়ক'টিকে বিচিত্র-র 'গায়কে'র প্রতিকৃতি বলে মনে হয়।)
বিষয় ও সংযোজনের দিক থেকে এই ধরনের আরেকটি কাজ (অনামাঙ্কিত) লেনিনগ্রাদ সংগ্রহালয়ে রয়েছে। প্রতিকৃতির জন্য দেখুন

বানোবা অ্যাণ্ড আদারস্ : 'অ্যালবাম অফ ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড পার্শিয়ান মিনিয়েচারস্' (মস্কো, ১৯৭২), প্লেট ৬৮।

৭. 'শাহ্‌জাহান ভূমণ্ডলে দণ্ডায়মান'। সংগ্রহ—চেস্টার বেটি লাইব্রেরি, ডাবলিন। প্রতিলিপি—আর্নল্ড অ্যাণ্ড উইলকিন্সন, প্লেট ৬৩।
এই ছবির একটি অনামাঙ্কিত অনুকৃতি—যাতে পটভূমি চিত্রণে কিছু তফাৎ আছে—সম্ভবত বিচিত্র-রই কাজ। (প্রতিকৃতির জন্য দেখুন আর্নল্ড অ্যাণ্ড উইলকিন্সন, পূর্বোক্ত, প্লেট ৮৬)।

৮. 'তিন মুঘল সম্রাট—আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহ্‌জাহান'। সংগ্রহ—চেস্টার বেটি লাইব্রেরি, ডাবলিন। প্রতিলিপি—আর্নল্ড অ্যাণ্ড উইলকিন্সন, সংগৃহীত, প্লেট ৬৫।

৯. 'সন্তমণ্ডলী'। সংগ্রহ—চেষ্টর বেটি লাইব্রেরি, ডাবলিন। প্রতিলিপি মেলে না। বর্ণনার জন্য দেখুন আর্নল্ড অ্যাণ্ড উইলকিন্সন, খণ্ড ১, পৃ. ৩৪।

১০. 'শাহ্‌জাহান প্রার্থনা করছেন'। পটভূমিতে সম্রাট শাহ্‌জাহান-এর স্বহস্তলিপি : 'আমার চল্লিশ বছর বয়সের একটি সুন্দর ছবি। বিচিত্র-র কাজ।' সংগ্রহ—মিণ্টো অ্যালবাম, ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড অ্যালবার্ট মুাজিয়ম, লণ্ডন। প্রতিলিপি—ওয়েলশ্ : 'দি আর্ট অফ মুঘল ইণ্ডিয়া' (নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৩), প্লেট ৪৩।

১১. 'আসফ খাঁ'। সংগ্রহ—ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড অ্যালবার্ট ম্যুজিয়ম, লণ্ডন। প্রতিলিপি—শ্চুকিন, প্লেট ৩৮।

১২. 'শাহ্‌জাহান—এক আমীরের সঙ্গে'। সংগ্রহ—ভেভের কালেকশনস্, প্যারিস। প্রতিলিপি—শ্চুকিন, প্লেট ৩৯।

১৩. 'মহম্মদ জাম কুদসী' (শাহ্‌জাহান-এর সভাকবি)। সংগ্রহ—আর্ট গ্যালারি, রয়্যাল ম্যুজিয়ম, কলকাতা। প্রতিলিপি—হ্যাভেল : 'দি আর্ট হেরিটেজ অফ ইণ্ডিয়া' (বোম্বাই, ১৯৬৪)। প্লেট ৫৬।

১৪. 'এৎওয়ার খান'। সংগ্রহ—মার্তো কালেকশনস্, দ্য ল্যুভ্র ম্যুজিয়ম, প্যারিস। প্রতিলিপি—শ্চুকিন : 'লে মিনিয়াত্যুর অ্যাঁদিয়েন দ্য এপক দে গ্রাঁদ্ মোগ্যুল', দ্য ল্যুভর ম্যুজিয়ম, (প্যারিস, ১৯২৯), প্লেট ৯।
সংযোজনের দিক থেকে এটির সঙ্গে চিত্র নং ১১-র সাদৃশ্য আছে।

১৫. 'শাহ্‌জাহান-এর দরবার'। 'শাহ্‌জাহাননামা' পাণ্ডুলিপির প্লেট ৫০। সংগ্রহ—রাজন্য সংগ্রহ, উইন্সর ক্যাসেল, লণ্ডন।
প্রতিলিপি—গ্যাসকোইন : 'দ্য গ্রেট মুঘলস' (লণ্ডন, ১৯৭১), ১৪৫ পৃষ্ঠার প্লেট।

১৬. 'যুবরাজ শাহ্‌সুজা মেবারের রাজা গজসিংহ-এর সাথে'। সংগ্রহ—কালেকশনস্ অফ অ্যালিস অ্যাণ্ড নেসলি হীরামানেক, নিউইয়র্ক।

প্রতিলিপি—ওয়েল্‌শ্, প্লেট ৪৪। লেখক এটিকে বিচিত্র-র কাজ বলে দাখিল করেছেন।

এই চিত্র এবং পূর্বোক্ত চিত্র নং ৩-এর ঐশী বালক, পটভূমি, অলংকারিক আলেখন এবং রঙ সংযোজনে সাদৃশ্য আছে।

১৭. 'আলমগীর (অওরঙজেব) শিকার করছেন'। সংগ্রহ—চেস্টার বেটি লাইব্রেরি, ডাবলিন। প্রতিলিপি—ওয়েল্‌শ্: 'ইম্পিরিয়াল মুঘল পেইণ্টিং' (লণ্ডন, ১৯৩৮), প্লেট ৩৮। লেখক এটিকে বিচিত্র-র কাজ বলে দাখিল করেছেন।

টীকা

১. 'আইন-ই-আকবরী', ব্লকম্যান অনূদিত (রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, কলকাতা, ১৯৬৫), খণ্ড ১, পৃ. ১১৫।
২. ওখানেই, পৃ. ১১৫।
৩. ওখানেই, পৃ. ১১৪।
৪. উদাহরণস্বরূপ, 'তারিখ-ই-খানদান-ই-তিমুরিয়া' (ওরিয়েণ্টাল পাব্লিক লাইব্রেরি, পাটনা, ১৫৮৪-৮৬ নাগাদ)। 'জামীয়ুৎ তওয়ারিখ' (ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, তেহ্‌রান, ১৬০০ নাগাদ) এবং 'আকবরনামা' (ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড অ্যালবার্ট ম্যুজিয়ম, লণ্ডন, ১৬০০-০৫ নাগাদ) পাণ্ডুলিপির অনেক চিত্রে মুখাকৃতি অঙ্কন করেছেন লাল, মধু, কেসু, কান্‌হা, ভগবান এবং নান্‌হা।
৫. 'শাহ্‌জাহাননামা' (১৬৫৭), রাজন্য সংগ্রহ, উইন্সর ক্যাসেটল, লণ্ডন, প্লেট ৫০। প্রতিলিপি—গ্যাসকোইন: 'দ্য গ্রেট মুঘলস্' (লণ্ডন, ১৯৭১), ১৪৫ পৃষ্ঠার প্লেট।
৬. 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী', রজার্স অনূদিত, বেভারিজ সম্পাদিত (লণ্ডন, ১৯০৯, ১৯১৪); খণ্ড ১, পৃ. ১৫ (অব্দুস সামাদ), পৃ. ১৫৯ (ফারুখ বেগ); খণ্ড ২, পৃ. ২০ (অবুল হাসান, আকা রিজা), পৃ. ২০, ১৪৫ (মনসুর), পৃ. ১১৬-৭ (বিশনদাস)।
৭. এটিং হাউসেন: 'পেইন্টিংস্ অফ সুলতানস্ অ্যাণ্ড এম্পারারস্ অফ ইণ্ডিয়া ইন আমেরিকান কালেকশনস্' (দিল্লি, ১৯৬১), প্লেট ১৪।
এস. পি. বর্মা: 'ইন্ট্রোডাকশন অফ সেল্ফ পোর্ট্রেট পেইন্টিং ইন ইণ্ডিয়া', প্রসিডিংস্ অফ ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস (ভুবনেশ্বর, ১৯৭৭), পৃ. ৩০০, পাদটীকা ২৯।
৮. তদনুসারে, ব্যারেট অ্যাণ্ড গ্রে: 'পেইন্টিং অফ ইণ্ডিয়া' (ওহিও, ১৯৬৩), পৃ. ১২।
৯. চিত্রটি দ্য ল্যুভ্‌র ম্যুজিয়ম, প্যারিস-এ সংগৃহীত। প্রতিকৃতির জন্য দেখুন বুসাগলি: 'ইণ্ডিয়ান মিনিয়েচারস্' (লণ্ডন, ১৯৬৯), প্লেট ৬১। বর্ণনার জন্য শ্চুকিন: 'লে মিনিয়াত্যুর অ্যাঁদিয়েন দ্য এপক দে গ্রাঁদ্ মোগ্যল', দ্য ল্যুভ্‌র ম্যুজিয়ম, (প্যারিস, ১৯২৯), পৃ. ১৫, ক্রমিক নং ৮।
১০. চেস্টার বেটি লাইব্রেরি, ডাবলিন। প্রতিলিপি—আর্নল্ড অ্যাণ্ড উইলকিন্সন:

'এ ক্যাটালগ অফ ইণ্ডিয়ান মিনিয়েচারস্', খণ্ড ৩ (লণ্ডন, ১৯৩৬), প্লেট ৬২।
১১. ফ্রিয়ার গ্যালারি অফ আর্ট, ওয়াশিংটন। প্রতিলিপি—এটিংহাউসেন, প্লেট ১২।
১২. লেনিনগ্রাদ ম্যুজিয়ম, মস্কো। প্রতিলিপি—বানোবা অ্যাণ্ড আদারস্ (সম্পাদিত): 'অ্যালবাম অফ ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড পার্শিয়ান মিনিয়েচারস্ (মস্কো, ১৯৬২), প্লেট ১০।
১৩. প্রতিলিপির জন্য বুসাগলি ও শিবরাম মূর্তি; 'আর্ট অফ ইণ্ডিয়া' (নিউ ইয়র্ক), প্লেট ৮০, ৮৪। পরবর্তীকালের অন্য দৃষ্টান্ত—গুপ্তবংশের (৪র্থ শতাব্দী) মুদ্রাতে জ্যোতির্মণ্ডলের অঙ্কন (প্রতিলিপি—বুসাগলি: প্রাগুক্ত, প্লেট ১৪৭-৯); অজন্তা-র গুহাচিত্র (ক্রমাংক ১, ২, ৯, ১০, ১৭, ১৯, ৪র্থ-৭ম শতাব্দী নাগাদ) জ্যোতির্মণ্ডলের সঙ্গে মহাত্মা বুদ্ধ এবং অন্যান্যদের প্রতিকৃতি (প্রতিলিপি—বুসাগলি: প্রাগুক্ত, প্লেট, ১৯, ২১); মনজিৎসিংহ: 'ইণ্ডিয়ান পেইন্টিং ফ্রম অজন্তা' (নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৪), প্লেট ৭, ১৩, ১৪, ২৯।
১৪. নগ্নজীত: 'চিত্রলক্ষণম্'। অনুবাদ—গোস্বামী ও ডাহেনডেল্লাপীকোলা; 'অ্যান আর্লি ডকুমেন্ট অফ ইণ্ডিয়ান আর্ট', দিল্লি, ১৯৭৬), পৃ. ১০০।
১৫. ব্রাউন: 'ইণ্ডিয়ান পেইন্টিং আণ্ডার দ্য গ্রেট মুঘলস্', ২য় সংস্করণ (নিউ ইয়র্ক, ১৯৭৫), পৃ. ১৭৩।
১৬. ব্রাউন: প্রাগুক্ত, প্লেট ৪৩। শ্চুকিন; প্রাগুক্ত, প্লেট ১৭। ক্লার্ক: 'থার্টি মুঘল পেইন্টিংস্ অফ দ্য স্কুল অফ জাহাঙ্গীর (লণ্ডন, ১৯২২), প্লেট ১০।
১৭. ব্রাউন: প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩।
১৮. 'কল্পসূত্র' (জৈন পাণ্ডুলিপি, আনুমানিক ১৫শ শতাব্দী), ন্যাশনাল ম্যুজিয়ম, দিল্লি। একটি প্লেট-এর প্রতিলিপি—বুসাগলি: প্রাগুক্ত, প্লেট ২৬১।
১৯. ব্রাউন: প্রাগুক্ত, প্লেট ২০। ক্লার্ক: প্রাগুক্ত, প্লেট ৫, শ্চুকিন: 'লা প্যাঁত্যুর অ্যাঁদিয়েন্ (প্যারিস, ১৯২৯), প্লেট ৩২-৩, ৩৯।
২০. প্রতিলিপির জন্য দেখুন শ্চুকিন: প্রাগুক্ত, প্লেট ৩২-৩, ৩৬। ক্লার্ক: প্রাগুক্ত, প্লেট ৯। ওয়েল্শ্: 'দি আর্ট অফ মুঘল ইণ্ডিয়া' (নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৩), প্লেট ২৯, ৪২।
২১. অজন্তা-র, গুহাচিত্র (ক্রমাংক ১৭)। প্রতিলিপি—বুসাগলি: প্রাগুক্ত, প্লেট ১৩৫।
২২. প্রতিলিপির জন্য বুসাগলি: প্রাগুক্ত, প্লেট ১৪০, ২৬৫, ২৯২।
২৩. 'রজ্‌মনামা' (আনুমানিক ১৫৮৩-৮৫), রাজকীয় সংগ্রহালয়, জয়পুর, প্লেট ৯২, ১৩১, ১৩৯, প্রতিলিপি—হেণ্ডলি: 'মেমোরিয়াল অফ দ্য জয়পুর একজিবিশন', খণ্ড ৪, ১৮৮৩, প্লেট ৯২, ১৩১, ১৩৯।
২৪. পাশ্চাত্য কলায় দেবদূতের চিত্রণে 'ডানাওয়ালা মানুষ' অঙ্কিত হত, এবং এটি ভারতীয় প্রথা থেকে মূলগতভাবে ভিন্ন।
২৫. 'রজ্‌মনামা' (১৫৮৩-৮৫), রাজকীয় সংগ্রহালয়, জয়পুর, প্লেট ১৬,। প্রতিলিপি—হেণ্ডলি: প্রাগুক্ত, প্লেট ১৬। বর্ণনা—সোমপ্রকাশ বর্মা: 'আর্ট অ্যাণ্ড মেটিরিয়াল কালচার ইন দ্য পেইন্টিংস অফ আকবরস্ কোর্ট' (দিল্লি, ১৯৭৮), পৃ. ৩৩।
২৬. 'রজ্‌মনামা' (১৯৫৮), রাজকীয় সংগ্রহালয় এবং কলা বীথি, বরোদা, প্লেট ১৯-২০। প্রতিলিপি—গাঙ্গুলি: 'ক্রিটিকাল ক্যাটলগ অফ মিনিয়েচার পেইন্টিংস্ ইন দ্য বরোদা ম্যুজিয়ম' (বেরোদা, ১৯৬১)। বর্ণনা—সোমপ্রকাশ বর্মা: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

২৭. সোমপ্রকাশ বর্মা : প্রাগুক্ত।
২৮. 'খম্‌সা' (১৫৯৫ নাগাদ), মেট্রোপলিটান ম্যুজিয়ম অফ ফাইন আর্ট।
২৯. নীহাররঞ্জন রায় : 'মুঘল কোর্ট পেইন্টিং' (কলকাতা, ১৯৭৫), প্লেট ১৮।
৩০. শ্চুকিন : প্রাগুক্ত, প্লেট ২৯, ৩১-২। ওয়েলশ্‌ : প্রাগুক্ত, প্লেট ৩১, ৪৫। মার্টিন : 'মিনিয়েচার পেইন্টিং অ্যাণ্ড পেইন্টারস্‌ অফ পার্শিয়া, ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড টার্কি', খণ্ড ২ (লণ্ডন, ১৯১২), প্লেট ১৯২-?, ১৯৭। আর্নল্ড অ্যাণ্ড উইলকিন্সন : প্রাগুক্ত, প্লেট ৬১-২, ৬৭, ৭২, ৭৬।
৩১. শ্চুকিন : সংগৃহীত, প্লেট ৩৩, ৩৬, ৪০।
৩২. উপরোক্ত টীকা নং ১২।
৩৩. প্রতিলিপি—ব্যারেট অ্যাণ্ড গ্রে : প্রাগুক্ত, ১১১ পৃষ্ঠার প্লেট।
৩৪. 'তারিখ-ই-খানদান-ই-তিমুরিয়া', ওরিয়েন্টাল পাব্লিক লাইব্রেরি, পাটনা, প্লেট ২৪৮-৬৯।
'বাবরনামা', ব্রিটিশ ম্যুজিয়ম, লণ্ডন, প্লেট ১৩৩, ২৫২, ২৯৫, ৪৯২।
৩৫. শ্চুকিন : প্রাগুক্ত, প্লেট ৩৬। ক্লার্ক : প্রাগুক্ত, প্লেট ৬, ৯, ১৭। ব্রাউন : প্রাগুক্ত, প্লেট ১৭, ২৬। মার্টিন : প্রাগুক্ত, প্লেট ১৯২-৩।
৩৬. আর্চার : 'ইণ্ডিয়ান মিনিয়েচারস্‌' (গ্রিনউইচ, ১৯৬০), প্লেট ২৭-এর বিবরণ।
৩৭. মোতিচন্দ্র : 'দ্য টেকনিক অফ মুঘল পেইন্টিং' (লখ্‌নউ, ১৯৪৬), পৃ. ৫৭, ৬২। ব্রাউন : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯।
৩৮. সোমপ্রকাশ বর্মা : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০। পাণ্ডুলিপি (ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড অ্যালবার্ট ম্যুজিয়ম এবং চেস্টার বেটি লাইব্রেরি, ডাবলিন-এ সংরক্ষিত, ১৬০০-৫ কালীন) এবং 'আকবরনামা'-য় আকবর-এর প্রতিকৃতিতে অর্ধ মুখচিত্রণের দৃষ্টান্ত। সোমপ্রকাশ বর্মা : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮, পাদটীকা ১২।
৩৯. 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী', প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃ ২০, ১১৬-৭।
৪০. শ্চুকিন : প্রাগুক্ত, প্লেট ২০, ২৯-৩১, ৩৩-৪, ৩৬-৭, ৪০। ওয়েলশ্‌ : প্রাগুক্ত, প্লেট ২৯।
৪১. মোতিচন্দ্র : প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩। সোমপ্রকাশ বর্মা : প্রাগুক্ত, প্লেট ২৬, পৃ. ৩৩।
৪২. হ্যাভেল : 'দি আর্ট হেরিটেজ অফ ইণ্ডিয়া' (বোম্বাই, ১৯৬৪), প্লেট ৬১, পৃ. ৯১।
৪৩. ক্লার্ক : প্রাগুক্ত, প্লেট ২০। শ্চুকিন : 'লে মিনিয়াত্যুর অ্যাঁদিয়েন দ্য এপক দে গ্রাঁদ মোগ্যুল', দ্য ল্যুভ্‌র ম্যুজিয়ম, প্লেট ১১, ১৩-৫। ব্রাউন : প্রাগুক্ত, প্লেট ১৭, ২০, ২৭, ৩১, ৩৩, ৩১, ৩৩, ৪৮, ৫১-২, ৫৯, ৬৮। শ্চুকিন : প্রাগুক্ত, প্লেট ৫০। সোমপ্রকাশ বর্মা : প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪-২৩, প্লেট ৭২-৮।
৪৪. ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড অ্যালবার্ট ম্যুজিয়ম-এ সংরক্ষিত। প্রতিলিপি—শ্চুকিন : প্রাগুক্ত, প্লেট ৩২।
৪৫. হ্যাযেক : 'ইণ্ডিয়ান মিনিয়েচারস্‌ অফ দ্য মুঘল স্কুল' (লণ্ডন, ১৯৬০), পৃ. ৩২।
৪৬. ব্যারেট অ্যাণ্ড গ্রে : প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।
৪৭. সোমপ্রকাশ বর্মা : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭, ৪৪, প্লেট ৫-৬, ২৮।
৪৮. প্রতিকৃতির জন্য দেখুন ব্রাউন : প্রাগুক্ত, প্লেট ১৮, ৩৭। সুলেমান : 'মিনিয়েচারস্‌ অফ বাবরনামা' (তাসখন্দ, ১৯৬০), প্লেট ৪-১৪, ৩৬-৪৭।
৪৯. কুহ্‌নেল অ্যাণ্ড গেৎজ্‌ : 'ইণ্ডিয়ান বুক পেইন্টিং' (লণ্ডন ১৯২৬), পৃ. ৪৫।

প্রতিকৃতির জন্য দেখুন বিনিয়ন, উইলকিন্সন অ্যাণ্ড গ্রে : 'পার্শিয়ান মিনিয়েচার পেইন্টিং' (লণ্ডন, ১৯৩৩), প্লেট '৪৭, ৬৫, ৬৭, ৭১। গ্রে : 'পার্শিয়ান পেইন্টিং (ওহিও, ১৯৬১), প্লেট ৭৪।

৫০. কুহ্নেল অ্যাণ্ড গোয়েৎজ : প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৮, প্লেট ১১-৩০, ৪২। হ্যাযেক : প্রাগুক্ত, প্লেট ৮। ওয়েল্শ্ : প্রাগুক্ত, প্লেট ২৭। ক্লার্ক : প্রাগুক্ত, প্লেট ৩-৪, ৬-১০, ১৩, ১৬, ১৮-৯, ২১। আর্নল্ড অ্যাণ্ড উইলকিন্সন : প্রাগুক্ত, প্লেট ৫৯-৬০, ৬৬-৮, ৭০-১.।

৫১. মুখলিস, খেম ও বালচন্দ্র কর্তৃক চিত্রিত পাড়ের বর্ণনার জন্য দেখুন ব্যারেট অ্যাণ্ড গ্রে : প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২। গোবর্ধন ও বালচন্দ্র কর্তৃক চিত্রিত পাড়ের বর্ণনা ও পুনঃ প্রস্তুতির জন্য কুহ্নেল অ্যাণ্ড গোয়েৎজ্। প্রাগুক্ত, প্লেট ৩৮, অবতরণ পৃ. ৪৯, যেখানে অন্য পাড়ের চিত্রণ ঐ চিত্রকরদের কাজ বলে দাখিল করা হয়েছে। দৌলত কর্তৃক চিত্রিত পাড়ের বর্ণনা ও পুনঃপ্রস্তুতির জন্য গডার্ড : 'লেস মার্গেস ডু মুরক্কা-ই গুলশন', আত্হার-ই-ইরাম, (হারলেম, ১৯৩৬), খণ্ড ১, পৃ. ২৩, প্রতিলিপি নং ১৩।

৫২. স্বাক্ষরিত চিত্র (অব্দুস সামাদ) 'মুরক্কা-ই-গুলশন', 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, তেহ্রান, প্লেট ৬৩, ২০৬। বর্ণনার জন্য আটাবাই: 'ফহরিৎ-ই-মুরক্কাৎ-ই-কিতাবখানা-ই-সল্তনতী' (তেহরান, ১৩৫৩), পৃ. ৩৫১-২।
স্বাক্ষরিত চিত্র (মীর সৈয়দ আলি) 'মীর মুসব্বির', দ্য ল্যুভ্র ম্যুজিয়ম, প্যারিস। প্রতিলিপির জন্য শচুকিন : প্রাগুক্ত, প্লেট ২, অবতরণ পৃ. ১১-২।

৫৩. 'আইন-ই-আকবরী', সংগৃহীত, পৃ. ১১৩।

৫৪. সোমপ্রকাশ বর্মা : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫ (প্রস্তাবনা)।

৫৫. ক্লার্ক : প্রাগুক্ত, প্লেট ৩-৪, ৬, ১৪-৫, ১৭-২১। শচুকিন: প্রাগুক্ত, প্লেট ২৮, ৬২। আর্নল্ড অ্যাণ্ড উইলকিন্সন : প্রাগুক্ত, প্লেট ৫৩-৬৪।

৫৬. জাঁ পুডি : 'মিনিয়াত্যুক অ্যাঁদিয়েন দে এদিশিয়ঁ দু চেনা (প্যারিস, ১৯৫০), প্লেট ৪।

৮

সাম্রাজ্যের অবসান : মুঘল প্রসঙ্গ

এম. আত্‌হার আলি

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন নিয়ে অনেক ব্যাখ্যা এ-পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, এবং ঐ ব্যাখ্যাকারদের সুদীর্ঘ তালিকায় স্বনাম সংযোজনের ব্যাপারে আমার দ্বিধা ছিল। আরভিন বা সরকার-এর মতো ইতিহাসবিদ্‌রা এই পতনের সম্ভাব্য কারণ হিসেবে বলেছেন রাজা ও আমীরদের ব্যক্তিগত চরিত্রাবনতির কথা। 'হারেম' চর্চা বেড়ে ওঠে এবং কোনো এক দুর্বোধ্য কারণে নারীকে সর্বক্ষেত্রে অমঙ্গলসূচক বলে ধরে নেওয়া হতে থাকে। রাজা এবং আমীরেরা বিলাসপ্রিয় হয়ে পড়েন, যদিও এখনো পর্যন্ত এমন কোনো নজির পাওয়া যায়নি যা থেকে বলা যেতে পারে যে, ১৬শ এবং ১৭শ শতাব্দীর মুঘলরা তাঁদের ১৮শ শতাব্দীর উত্তরসূরীদের চেয়ে কোনো অংশে কম বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন।[১] সরকার তাঁর গ্রন্থ 'হিস্ট্রি অফ অওরঙজেব'-এ বহুকাল ধরে মেনে-আসা কারণটির—অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান বিভেদের—বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, অওরঙজেব-এর ধর্মীয় নিয়মনীতির হিন্দু প্রতিক্রিয়াশীলতাকে উসকে দিয়েছিল, এবং তারই ফলে সাম্রাজ্যের সংহতি বিনষ্ট হয়, যে সংহতি তাঁর পূর্বসূরীরা বহুক্লেশে গড়ে তুলেছিলেন।[২]

আরো মৌলিক গবেষণার কাজ সম্প্রতি শুরু হয়েছে। সতীশ চন্দ্র মুঘল পতনের কারণটির অনুসন্ধান করেছেন মনসব ও জাগির-ব্যবস্থা বজায় রাখার ক্ষেত্রে মুঘলদের ব্যর্থতার মধ্যে। তাঁর মতে ঐ ব্যবস্থার সুদক্ষ কার্যকারিতার উপরেই একটি কেন্দ্রশাসিত রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসাবে—সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন নির্ভরশীল ছিল।[৩] অন্যদিকে ইরফান হবিবের মতে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল ঐ বিশেষ ব্যবস্থাটির ফলেই। তাঁর মতে জাগির-হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে শোষণ তীব্রতর হয়েছিল, এবং তারই প্রতিক্রিয়া ছিল জমিন্‌দার ও কৃষকশ্রেণীর বিদ্রোহ।[৪] রীজ্‌নার প্রমুখ সোভিয়েত গবেষকরা আরো একটি বিষয়ের উল্লেখ করেন—বিভিন্ন 'জাতিসত্তা'র উন্মেষ—যা সাম্রাজ্যের ঐক্য ও সংহতিকে বিপন্ন করেছিল। ভারতীয় মার্কসবাদী লেখকদের একটি প্রখ্যাত মহলে তত্ত্বটি যথেষ্ট আদৃত, এবং ১৮শ শতাব্দীতে উদ্ভূত আঞ্চলিক ক্ষমতা-গোষ্ঠীগুলির সুলুক যাঁরা পেয়েছেন সেই নব্য আমেরিকান গবেষকদের কাজ থেকেও উপরোক্ত তত্ত্বটি সমর্থিত হয়।[৫]

এই সমস্ত ঘটনার জটলায় খেই হারিয়ে ফেলা অসম্ভব নয়। একটি অনন্য কারণের খোঁজ ছেড়ে দিয়ে কারণ-পরিণতি-কারণের এক সূত্র দাখিল করাও হয়ত সম্ভব, যা-দিয়ে অন্তর্বিরোধগুলি দূর করা যাবে। এই ধরনের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা এখনো কেউ করেন নি, এবং আমিও সে-উচ্চাশা পোষণ করি না। আমি শুধু চাই উপস্থিত পাঠ্যাংশটিকে যথাযথ প্রসঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে।

মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙন সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা যত পড়েছি ততই আশ্চর্য হয়েছি এগুলির সংকীর্ণতা দেখে। ১৮শ শতাব্দীর প্রথমভাগে শুধু মুঘল সাম্রাজ্যই ভেঙে পড়েনি—সফাবিদ সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে, উজবেক-এর খানসাম্রাজ্য খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেছে, অটোমান সাম্রাজ্যের ধীর অথচ নিশ্চিত ভাঙন শুরু হয়েছে। এ সব কি নিছকই কাকতালীয়? ভারত এবং ইসলামি দুনিয়ার বড় বড় সাম্রাজ্য একই সময়ে ভেঙে পড়ল অথচ কারণগুলি একেক ক্ষেত্রে একেক রকম (এবং বহুবিধ)—এটা আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। আমাদের অবশ্যই অনুসন্ধান শুরু করা উচিত (যদি শেষ পর্যন্ত খুঁজে না-ও পাওয়া যায় তবু) যাতে কোনো একটি সাধারণ কারণ খুঁজে পাওয়া যায়, যার দরুন ঐ কমবেশি-স্থায়ী সাম্রাজ্যগুলির পতন এবং নতুন রাজনৈতিক কাঠামোর—যেমন, নাদির শাহ্-র সাম্রাজ্য, আফগান (দুরানি) সাম্রাজ্য বা মারাঠা মিত্রসঙ্ঘের—উত্থানের শর্ত তৈরি হয়েছিল, এবং সেগুলি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খণ্ড খণ্ড হয়ে গিয়েছিল।

এছাড়াও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে, পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির—বিশেষত ব্রিটেন ও রাশিয়ার—সশস্ত্র আক্রমণের আগেই প্রাচ্যের সাম্রাজ্যগুলির পতন ঘটেছিল; কিন্তু দুটি ঘটনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান এত কম যে, পাশ্চাত্যের উত্থান কোনো-না-কোনোভাবে প্রাচ্যের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছিল কিনা (উন্নততর সামরিক ক্ষমতাসহ বাস্তবিক আক্রমণের আগেই)—এই প্রশ্নটা স্বভাবতই উঠে পড়ে।

মধ্যপ্রাচ্য এবং ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস অধ্যয়নের যে-ঘাটতি আমাদের রয়ে গেছে তা হল, ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে নতুন বাণিজ্যের ফলে পূর্বোল্লিখিত দেশগুলির ব্যবসা ও বাজারের ধাঁচে কী কী পরিবর্তন এসেছিল তার বিশদ কোনো বিশ্লেষণের চেষ্টা কেউ করেননি। ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীর প্রাচ্য অর্থনীতিতে যে বিপুল বাণিজ্যিক বিকাশ হয়েছিল তার তাৎপর্য কমিয়ে দেখানোর একটা ঝোঁক প্রায়শই চোখে পড়ে। এর একটা কারণ হয়ত ঐ সময়ের আন্তর্জাতিক ও দূরান্ত বাণিজ্যে প্রাচ্য পণ্যসামগ্রীর স্বল্পতা। কিন্তু বাস্তব প্রশ্নটি পরিমাণগত নয়, মূল্যগত। মূল্যের হিসাবে, আলোচ্য দেশগুলির অর্থনীতিতে মোট জাতীয় উৎপন্নের একটা বড় অংশই ছিল দূরান্ত বাণিজ্যের।

১৫০০ থেকে ১৭০০-র মধ্যবর্তী সময়ে গুরুতর ঘটনা ছিল বিশ্ববাণিজ্যের

কেন্দ্ররূপে ইউরোপের উত্থান, নতুন দুনিয়া ও সাগরপারে প্রাধান্য বিস্তার, এবং উত্তমাশা অন্তরীপের পূর্ণ একাধিকার গ্রহণ। সাম্প্রতিক পরিগণনায় দেখা গেছে ইউরোপের জনসংখ্যা ১৪৫০-এ ৫ কোটি থেকে ১৭০০-তে বেড়ে দাঁড়ায় ১২ কোটি।[৬] জার্মানিতে ত্রিংশতিবর্ষ যুদ্ধের দরুন লোকক্ষয়, এবং স্পেনে জনসংখ্যার ক্রমহ্রাসের পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত বৃদ্ধির তাৎপর্য অপরিসীম। এশিয়ার অনুরূপ কোনো হিসাব পাওয়া যায় না। কিন্তু বিভিন্ন তথ্যাদি থেকে মনে হয় ১৬০০-১৮০০ পর্যায়ে ভারতে জনসংখ্যা মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল। ১৬০০-য় ভারতের জনসংখ্যা ১০ কোটি ছিল—মোরল্যাণ্ড-এর এই হিসাব প্রশ্নাতীত নয়, এবং সঠিক সংখ্যাটি সম্ভবত ১৫ কোটির কাছাকাছি।[৭] ১৮৬৮-৭২ আদমসুমারিতে সংখ্যাটি হয়েছে ২৫ কোটিরও কম। অর্থাৎ, ২৭০ বছরে ভারতের জনসংখ্যা বেড়েছে মাত্র ৬৬ শতাংশ, যেখানে ইউরোপের জনসংখ্যা ২৫০ বছরে বেড়েছে ১৪০ শতাংশ। জনসংখ্যাবৃদ্ধির এই বৈষম্য থেকে মনে হয় ১৭শ শতাব্দীর শেষাশেষি ইউরোপ ও এশিয়ার অর্থনৈতিক ভারসাম্যের একটা বড়সড় পরিবর্তন হয়।

এই পরিবর্তনের বাস্তব প্রতিক্রিয়া চোখে পড়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে। উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কার ছিল নিঃসন্দেহে একটি গুরুতর ঘটনা, এবং ভারতে পৌঁছনোর এই সোজা ও সুগম জলপথটি আবিষ্কৃত হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ফলাফল দেখা গিয়েছিল ১৮শ শতাব্দীতে। কিন্তু অর্থনৈতিক ঐ বড় পরিবর্তনের সূচক কেবলমাত্র নতুন জলপথই ছিল না (কারণ, বাস্তবিকপক্ষে, লোহিত সাগরের পুরনো পথটি ১৭শ শতাব্দীর পরেও কিছুকাল পর্যন্ত উত্তমাশা অন্তরীপের জলপথটির মতোই গুরুত্বপূর্ণ ছিল) : সর্বোপরি, এর ফলে তাবৎ বিশ্বের বিলাস ও শিল্পদ্রব্যের বাজার হিসাবে ইউরোপের উত্থান ঘটে। অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ্‌রা এ-পর্যন্ত ইউরোপের সমস্যাবলী নিয়েই মূলত গবেষণাদি করেছেন, এবং এই দৃষ্টিবদ্ধতা তাঁদের এসেছে সে যুগের বণিক-বৃত্তিবাদী বাগবিতণ্ডা থেকে। অন্যান্য প্রসঙ্গিক বিষয়, যেমন, উল্লিখিত পণ্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য বাজারে তার প্রভাব—এই সব তাঁদের নজর বা মনোযোগ এড়িয়ে গেছে। অর্থাৎ, ইউরোপ থেকে প্রাচ্যে সোনা ও রূপার (বিশেষত পরেরটি) বিপুল রপ্তানিই শুধু নয়, আরো যে-বিষয়টি আমাদের অধ্যয়ন করতে হবে তা হল—প্রাচ্যের বিলাসদ্রব্য ও অন্যান্য দামী উৎপন্নের একটা বড় অংশই তখন এতদিনকার 'বাঁধাধরা' বাজারের বদলে, ইউরোপে রপ্তানি হচ্ছিল। পূর্ণাঙ্গ তদন্তের অভাব, এবং তথ্যাদির স্বল্পতার জন্য এই পরিবর্তনের পরিমাণগত হিসাব পাওয়া যায় না। কিন্তু ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে এশিয়ার সর্বত্র ইউরোপীয় বাজারের এই চাহিদা বিদ্যমান ছিল—কোথাও কম কোথাও বেশি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে।

নীল, গোলমরিচ ও ছিটকাপড়ের মতো ভারতীয় পণ্যের মূল বাজার

হিসাবে ইরানের এবং রেশম ও পোর্সেলিন-এর মতো চিনা রপ্তানি দ্রব্যের মূল বাজার হিসাবে ইরান ও ভারতের টিকে থাকতে না-পারার ঘটনাটি ঐ দুই দেশের অর্থনৈতিক পড়ন্তদশারাই সূচক। এই পড়ন্তদশা কেবলমাত্র আপেক্ষিক ছিল না, আবার এটিকে অনপেক্ষ বলাও ভুল। বাংলায় উৎপন্ন রেশমের এক-তৃতীয়াংশ ইতিমধ্যেই রপ্তানি হচ্ছিল ডাচ ও ইংরেজদের মাধ্যমে —১৬৬৭-র আগেই—এবং আর এক-তৃতীয়াংশ আর্মেনিয়ান ও পার্সিদের মাধ্যমে (এরা সম্ভবত বেশির ভাগটাই চালান করছিল স্থলপথে ভূমধ্যসাগরীয় বন্দরগুলিতে, এবং সেখান থেকে ইউরোপে) ; বাকিটুকু ভারতীয় বাজারের জন্য পড়ে থাকছিল।[৮] ইউরোপের কোম্পানিগুলি পশ্চিম উপকূলে গোলমরিচের একচেটিয়া ক্রেতা হয়ে ওঠে, এবং ভারতের সর্বোত্তম ছিটকাপড় 'মসুলিপট্টম্'-এর মূল ক্রেতা হয়ে দাঁড়ায়। ইউরোপীয় বাজারের এই ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উৎপাদন বেড়েছিল এমনটা মনে হয় না। অন্যান্য বাজারের যোগান কমিয়ে দিয়েই সম্ভবত ঐ চাহিদা মেটানো হত। যদি উৎপাদন সত্যিই বাড়ানো হত তবে. তৎকালীন স্থিতিশীল প্রযুক্তির বাস্তব শর্তাদিতে, উৎপাদন ও বিক্রয়-মূল্যও নিশ্চয়ই—সাধারণ মূল্যসূচকের সাপেক্ষে—বেড়ে যেত।

আমার ধারণা, ঐ ঘটনা পরম্পরায় প্রাচ্য দেশগুলির অর্থনীতি গুরুতরভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল, এবং শাসকশ্রেণীগুলি তীব্র আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়েছিল। গ্রেট সিল্ক রোড দিয়ে সারবন্দী মালগাড়ির যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেল. এবং মধ্য এশিয়া (উজবেক খানসাম্রাজ্য) নিশ্চিতভাবেই দরিদ্র হয়ে পড়ল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভারত ও ইরানে বিলাসদ্রব্যের দাম বাড়ল, এবং শাসকশ্রেণীর লোকদের কাছে বেঁচে থাকার অর্থই দাঁড়াল চূড়ান্ত বিলাসিতা। আগেকার আয়ে আর কুলিয়ে উঠছিল না, আর এটি ছিল—কৃষকশোষণের মাত্রাবৃদ্ধির অন্যতম কারণ ; এবং যখন সেটা ব্যর্থ হল, অথবা বলা যায়, ব্যক্তিগত স্বার্থপ্রণোদিত বেপরোয়া গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে যখন শোষণ বাড়িয়েও উৎপাদন বাড়ানো গেল না, তখন থেকে শুরু হওয়া অবিরাম গৃহযুদ্ধেরও কারণ তাই। এ-ধরনের পরিস্থিতি সাম্রাজ্যের পতনকে অবশ্যই ত্বরান্বিত করে।

এ-পর্যন্ত যা-বলেছি তা আমার ধারণাপ্রসূত এবং নিবিড়তর তদন্তসাপেক্ষ হলেও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বিষয়ের কথা আমি বলতে চাই. যেটির খোঁজ মিলেছে ইউরোপ-এশিয়া সম্পর্কের পর্যালোচনা করতে গিয়ে। প্রাচ্যের আমদানি দ্রব্যের দাম ইউরোপ দিত প্রধানত সোনা ও রূপায় ; এবং এগুলি, বিশেষত রূপা, প্রচুর পরিমাণে আসত দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি থেকে। কিন্তু আমদানি দ্রব্যগুলির ইউরোপে এত চাহিদা হওয়ার কারণ ছিল—যত না তাদের অর্থবল, তার চেয়ে বেশি—সেখানকার কারিগরি উৎপাদনে একটি স্পষ্ট গুণগত ও পরিমাণগত বিকাশ। ফলে. অর্থনীতির সর্বাঙ্গীন সমৃদ্ধি এবং শহরগুলির লক্ষণীয় সম্প্রসারণ ঘটেছিল। ১৭শ শতাব্দীর প্রথম দিকে লাহোর

বা আগ্রার মতো শহরের তুলনায় ইউরোপীয় শহরগুলি ছিল নিতান্তই অনুল্লেখ্য ও গুরুত্বহীন'। ঐ শতাব্দীর শেষ নাগাদ লণ্ডন ও প্যারিস-এর মতো ইউরোপীয় শহরের জনসংখ্যা (৫ লক্ষাধিক) ভারতের সবকটি শহরকে—সম্ভবত আগ্রা বাদে—ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ডীন ও কোল-এর হিসাব অনুযায়ী ১৭০১ নাগাদ ইংল্যাণ্ড এবং ওয়েল্‌স-এর মোট জনসংখ্যার ১৩ শতাংশই ছিল শহরবাসী, এবং ঐ শহরগুলির জন্যসংখ্যা ছিল ৫০০০ ও ততোধিক।[৯] শহরবাসী জনসংখ্যার এই আনুপাতিক হার ভারতে ১৯০১ পর্যন্ত হয়নি।

শহরের এই বৃদ্ধিবেগের মূলে ছিল বিজ্ঞান ও নতুন প্রযুক্তি, যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটু একটু করে এগোচ্ছিল, এবং এর সম্মিলিত ফল ছিল বিস্ময়কর। এশিয়া, বিশেষত ভারতের পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। ভারত ও ইসলামি প্রাচ্যে কারিগরি উদ্ভাবনের (এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার) এমন কোনো সচেতন প্রয়াস ছিল না যা—১৭শ শতাব্দীর ইউরোপীয় সমাজের এক বৃহদংশকে বেগবান করে রাখা উদ্দীপনার সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। এটা স্বীকার করার জন্য 'সনাতন ভারতীয় সমাজের অপরিবর্তনশীলতা'র মার্কসীয় তত্ত্বের অনুগামী হওয়ার দরকার পড়ে না। অবশ্য এ-থেকে এমন ভাবারও কোনো কারণ নেই যে, ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে যান্ত্রিক উদ্ভাবনগুলির প্রাচ্যমুখী প্রসার বা বিস্তার হয়নি। সাধারণভাবে এ-রকম কিছু-না-কিছু নিশ্চয়ই হয়েছিল।[১০] কিন্তু আমাদের বিবেচ্য হল এটির গতি ও প্রয়োগ। গতি ছিল অত্যন্ত ধীর, এবং প্রয়োগ ভীষণভাবে সীমিত। এর বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় ভারতীয় সাহিত্যকর্মে ইউরোপীয় নব্যপ্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবনগুলির (যেমন ঘড়ি. দূরবীক্ষণ. গাদাবন্দুক) বর্ণনার অনুল্লেখ থেকে।

ভারতীয় ও ইসলামি সমাজের কোনো গঠনগত ত্রুটি যার মধ্য দিয়ে মানসিক ও কায়িক শ্রমের পরস্পর বিচ্ছিন্নতা বেড়েছিল ও টিঁকে রয়েছিল, অথবা ইসলামি ও হিন্দু ভাবাদর্শে বিজ্ঞানের প্রতি অদ্ভুত অনীহা—এই দুইয়ের কোন্‌টি যে উপরোক্ত অপরিবর্তনশীলতার জন্য দায়ী ছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। বুদ্ধিচর্চার দৈন্য ছিল স্পষ্ট; তার কারণগুলি স্পষ্ট ছিল না।

এই দৈন্য আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ফলাফলের জন্য। প্রযুক্তি উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শহরের বৃদ্ধিবিকাশ হতে থাকার অর্থ ছিল এই যে, কৃষিতে সংকট দেখা দিলে ঐ শহরগুলি রক্ষাকবচের কাজ করবে। যেহেতু এ-জিনিস ভারতে বা অন্যান্য প্রাচ্য দেশগুলিতে ঘটেনি. এই রক্ষাকবচও তাই সে-সব দেশে অনুপস্থিত ছিল। ভারতীয় শহরবাসীরা ছিল পরজীবী, কৃষিজ উদ্‌বৃত্ত আত্মসাৎ করেই এদের চলত।[১১] ঐ উদ্‌বৃত্ত ঠিকমতো আত্মসাৎ করা না গেলে শহরের কাজকর্মেও সংকট দেখা দিত। অর্থাৎ, কারিগরি উৎপাদন যতদিন না স্বনির্ভর হয়ে উঠল—

ইউরোপে যে-ঝোঁক শুরু হয়েছিল ১৬শ শতাব্দী থেকেই—ততদিন পর্যন্ত ঐ শহরগুলির পক্ষে কৃষিক্ষেত্রে সংকট বা বিক্ষোভের ধকল সামলানো অসম্ভব ছিল। সে-অর্থে, অত্যুৎকৃষ্ট পেশাদার সৈন্যবল থাকা সত্ত্বেও মুঘল সাম্রাজ্য আশ্চর্যরকম অরক্ষিত ছিল—অস্ত্রসজ্জায় নগণ্য কিন্তু সংখ্যায় অগণ্য কৃষক-বিদ্রোহী ও জমিন্‌দার-দের দিক থেকে।[১২]

সেনাবাহিনীর কথা বলতে গেলে, প্রযুক্তির বিশ্বব্যাপী রূপান্তরের প্রভাবে সবচেয়ে দ্রুতহারে যা প্রভাবিত হয়েছিল তা হল সেনাবাহিনী। কামান-নির্মাণ ছিল সে-যুগের 'ভারী শিল্প'। ইউরোপে ১৬শ শতাব্দী থেকেই বিজ্ঞানী এবং গণিতজ্ঞদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা এ-কাজে নিয়োজিত হয়েছিল। কিন্তু কেউ যদি ইউরোপ থেকে পূর্বাভিমুখে রওনা হত তাহলে, যতই সে যেত ততই দেখত ঐ প্রভাব ক্রমশ মন্দগতি হয়ে আসছে। নতুন ধরনের গোলন্দাজি অস্ত্র বানানোর চেষ্টা ভারতে সচেতনভাবে হয়নি : বন্দুক ও গাদাবন্দুক নির্মাণের কাজ বলতে গেলে হস্তশিল্পের স্তরেই থেকে গিয়েছিল, বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির পরশ তাতে লাগেনি ; এবং ফলত, ১৭০০ নাগাদ ঐ অস্ত্রগুলি পুরোপুরি সেকেলে হয়ে গিয়েছিল। মুঘলদের তখন একমাত্র ভরসা অসিচালক ঘোড়সওয়ারবাহিনী, কিন্তু তাদের সুদিন অনেক আগেই অস্তগত। সম্ভবত এটিই ছিল নাদির 'শাহ্‌-র হাতে (কারনাল, ১৭৩৯) মুঘলবাহিনীর জঘন্য পরাজয়ের কারণ। নাদির শাহ্‌-র কামানগুলি ছিল উন্নততর ইউরোপীয় এবং অটোমান-দের অনুকরণে তৈরি।[১৩]

আমার তাই মনে হয়, মুঘল সাম্রাজ্যের পতন মূলত এসেছিল সাংস্কৃতিক পশ্চাদ্‌বর্তিতা থেকে, যা সমগ্র ইসলামি দুনিয়া জুড়েই ছিল। প্রাচ্যের এই ব্যর্থতাই অর্থনৈতিক ভারসাম্যকে ইউরোপের পক্ষে নিয়ে গিয়েছিল—ভারত এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলি ইউরোপীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক উপনিবেশ, আশ্রিত রাজ্য বা প্রভাবাধীন অঞ্চলে পর্যবসিত হওয়ার বহুদিন আগেই। সাংস্কৃতিক এই ব্যর্থতার জন্য সাম্রাজ্যগুলি পারেনি কৃষিসংকটের মোকাবিলা করে উঠতে। এই যুগ্ম অর্থনৈতিক কারণেই সামরিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটেছিল ; কিন্তু, যেমন আমরা একটু আগেই দেখলাম, বুদ্ধিচর্চার স্থিতাবস্থা থেকে এমন-কী সামরিক দুর্বলতাও আসতে পারে, এবং প্রাচ্য দুনিয়া সে-সময় এরই কবলে পড়েছিল বলে মনে হয়।

অবশ্য, স্থিতাবস্থা শব্দটি আপেক্ষিক। ইউরোপে সে-সময় কী ভাবা ও লেখা হচ্ছিল তা নিয়ে যদি আমাদের মাথা না-ঘামালেও চলত তাহলে অনায়াসেই আমরা বলতে পারতাম যে, ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে ভারত ও ইসলামি প্রাচ্যে যথেষ্ট উন্নতমানের সাহিত্য ও যুক্তিবাদী বিজ্ঞানচর্চা হত। কিন্তু হাফিজ্‌-এর কবিতা, আবুল ফজল-এর যুক্তিবাদ, দারা শিকাহ্‌-র ধর্মীয় সারগ্রাহিতা, এবং রাজা জয়সিংহের জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের যথেষ্ট

প্রশংসা করলেও একটা কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, আধুনিক প্রযুক্তিচর্চার কোনো লক্ষণ কোথাও ছিল। জয়সিংহের সুবিখ্যাত রচনা 'জিজ্-ই মহম্মদশাহী' (১৭৩২)-তেই সেটা ধরা পড়ে। এটির তাত্ত্বিক অংশটুকু কার্যত 'জিজ্-ই উলুগ-খানি' (প্রায় ৩০০ বছর আগে রচিত) থেকে আক্ষরিকভাবে নেওয়া ; সূচি এবং সারণিতে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। ইউরোপীয় জ্যোতির্বিদ্যায় জয়সিংহের আগ্রহ ছিল, এবং সেকথা তিনি মুখবন্ধে উল্লেখও করেছেন। কিন্তু নিউটন-এর আবিষ্কারকে তিনি খুব বেশি গুরুত্ব দেন নি। ফলে, তাঁর যুক্তিবিচার ও তত্ত্বচিন্তার সামগ্রিক কাঠামো, এবং সেগুলির প্রতিফলন ও সীমাবদ্ধতা, বস্তুতপক্ষে রয়ে গিয়েছিল ১২শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী আরব রচয়িতাদের মতোই। তাঁর কাজ গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং তা যথেষ্ট আলোড়নও এনেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা ছিল শুধু ঢেউতোলা—মানুষের মনন পাল্টানোর জন্য দরকার ছিল বাঁধ ভাঙা প্লাবনের।

[২]

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের মধ্য দিয়ে দু-ধরনের শাসনব্যবস্থা উদ্ভূত হল। একটিতে ছিল হায়দরাবাদ, অযোধ্যা ও বাংলার মতো 'উত্তরাধিকৃত রাজ্য' যেগুলিকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়েছিল—কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব ক্ষীয়মান এবং শাসন বা সহায়তাদানে অক্ষম হয়ে পড়ার পর। উত্তরাধিকার সূত্রেই যে-সব রাজ্যে মুঘল প্রশাসনযন্ত্র বহাল হয়েছিল। দ্বিতীয় ধরনটিতে ছিল মারাঠা মৈত্রীসঙ্ঘ, জাঠ ও শিখ এবং আফগানরা। শাসনব্যবস্থা হিসাবে এদের উদ্ভব মুঘল সাম্রাজ্যের মুখাপেক্ষী ছিল না, যদিও কখনো কখনো এরা মুঘলদের সঙ্গে সাময়িক কোনো চুক্তি করেছে, অথবা—প্রথম দুটির ক্ষেত্রে এও দেখা যায় যে, তারা মুঘল সম্রাটের প্রভুত্ব মেনে নিয়েছে সে প্রভুত্ব নামমাত্র হলেও। মুঘল প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কোনোকোনোটি ব্যবহার করলেও রাজ্যগুলির শাসনপদ্ধতি ছিল মোটামুটিভাবে সাম্রাজ্যশাসনের বিরুদ্ধপন্থী, এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। মারাঠা মৈত্রীসঙ্ঘের মধ্যেও হয়ত মুঘল বাহিনীর পেশাদার ঘোড়সওয়াররাই ছিল, কিন্তু তারা ছিল পিণ্ডারি রূপে, অর্থাৎ ইতিহাসের সেই ড্রাকুলার মতো যারা প্রভুরক্ত পান করতেও পিছপা হত না। এই অন্তর্বিরোধের পূর্ণচিত্রটি পাওয়া যায় আজাদ বিলগ্রামির প্রতিবাদ (১৭৬১) থেকে, যেখানে মারাঠা সর্দারদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যুদ্ধে জয়লাভ করার পরেও তাঁদের আচরণ রাজোচিত না-হয়ে জমিনদারদের মতোই থেকে গিয়েছিল।[১৪]

হায়দর আলি ও টিপু সুলতান-এর শাসনাধীন মহীশূর ছিল উপরোক্ত ধরন দুটির বাইরে, এবং কোনোকোনো দিক থেকে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। একদিকে

সেখানে সচেতন প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল মুঘল প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের, যদিও সাবেক মুঘল সাম্রাজ্যে এটি ছিল নামেমাত্র অঙ্গীভূত। ভূমি-রাজস্ব প্রশাসন এবং সেনাবাহিনীর (বিশেষত হায়দর আলির আমলে) মতো সংস্থাগুলি থেকেই সেটা স্পষ্ট। অন্যদিকে, এটিই ছিল ভারতে প্রথম রাজ্য যেখানে আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল—প্রথমত ও প্রধানত সেনাবাহিনী ও অস্ত্রনির্মাণে হলেও—বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও, এবং সে-ক্ষেত্রে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির পদাংক অনুসৃত হয়েছিল।[১৫]

১৮শ শতাব্দীর বিভিন্ন শাসনব্যবস্থার এই প্রাথমিক শ্রেণীবিভাগ বিশেষ প্রয়োজনীয় কারণ, কোনোকোনো রচয়িতা এমন বলতে চান যে, রাজ্যগুলির মূল প্রকৃতিতে বিপুল পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এদের সবকটির এক সাধারণ ভিত্তি খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এই রাজ্যগুলি ছিল 'আঞ্চলিক অভিজাতবর্গের উত্থানের প্রতিফলন, বা এগুলির মধ্য দিয়ে বিশেষ কয়েকটি গোষ্ঠীর হাতে (যারা এযাবৎ সীমিত ক্ষমতা ভোগ করছিল) সার্বভৌম ক্ষমতার অংশীদারি এসেছিল—এই তত্ত্ব হয় সমাজবিদ্যার প্রত্যক্ষ বিবৃতিমাত্র, নাহয় মুঘল সাম্রাজ্য সম্পর্কে অধর্তব্য কিছু অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কাজেই, মুঘল সাম্রাজ্য খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গিয়ে যদি প্রত্যেক খণ্ডে একটি করে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজ্য স্থাপিত হয়েই থাকে, তবে সেগুলির শাসকশ্রেণীও অবশ্যই স্বতঃসিদ্ধভাবে আঞ্চলিক হয়ে থাকবে। অতঃপর অযোধ্যায় কর্মরত কোনো অফিসারকে দাক্ষিণাত্যে পাঠানো যাবে না। কিন্তু এটি ছিল পরিণাম, কারণ নয়; এবং এই অঞ্চলভুক্তি স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না। বাংলার প্রসঙ্গটি—যা অনেক জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে[১৬]—খানিকটা অভিনব। সেখানে নাজিম বা সুবেদাররা প্রথমে যে-ব্যবস্থা চালু করে সেটিকে, কিছুকাল আগে হলে, চূড়ান্ত কেন্দ্রীকরণ বলা যেত। মুর্শিদ কুলি খান পেলেন জাগিরগুলিকে খালিস-এ রূপান্তরিত করার শাহী মঞ্জুরি, এবং এইভাবে নিশ্চিত হল বাংলা থেকে সামন্ত মুঘল জাগিরদার ও সেনাপতির উচ্ছেদ। অতঃপর তাঁর নাজিম পদাধিকারকে দেওয়ান (বা প্রাদেশিক রাজস্বমন্ত্রী) পদের সঙ্গে যুক্ত করার মধ্য দিয়ে তিনি খালিসগুলিরও পরিচালন-ভার নিজের হাতে নিলেন; এবং তিনি ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা মুঘল সম্রাটকে বিপুল খাজনা পাঠাতেন।[১৭] ১৭৪০ নাগাদ এই ব্যবস্থা আর রইল না। এইভাবে বাংলার নবাব বাংলার সমুদয় রাজস্বের মালিক হয়ে বসলেন যা-থেকে জাগিরদাররা কোনো বখরা পেত না। অর্থাৎ মুঘল আমিরবর্গের আর কোনো যথার্থ অবশেষ রইল না, যদিও নাজিম স্বয়ং রয়ে গেলেন। খালিস ব্যবস্থাপনার জন্য নবাব স্থানীয় জমিন্দার ও বণিক-সাহুকারদের মধ্য থেকে রাজস্বচাষী ও অফিসার নিয়োগ করলেন। এই ঘটনাকে ঠিকমতো বুঝতে না পারার ফলে নব্য অভিজাত সম্প্রদায়ের উত্থান সম্পর্কে বহু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। হায়দরাবাদ কিংবা

অযোধ্যায়, যেখানে পুরনো জাগির-ব্যবস্থাই চালু ছিল, এরকম সাম্প্রদায়িক উত্থানের নজির পাওয়া যায় না।

প্রশাসনিক ব্যাপারে ব্যবসায়ীদের ভূমিকা সম্পর্কিত তথ্যাদিকেই তাদের রাজনৈতিক সক্রিয়তার নজির বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। বস্তুত মুঘল সাম্রাজ্যেও তাদের ভূমিকা সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল।[১৮] প্রত্যক্ষত, ১৭শ শতাব্দীতে গুজরাতি ব্যবসায়ীরা মুঘল দরবারে যে পরিমাণ প্রভাব খাটাতে পারত তা এমন-কী ১৮শ শতাব্দীর বাংলার নগরশেঠদেরও ঈর্ষার বস্তু।

আমি আগেই বলেছি যে, মারাঠা মৈত্রীসঙ্ঘকে উত্তরাধিকৃত রাজ্যগুলির সঙ্গে এক করে দেখা যাবে না। এটির উদ্ভব যে হয়েছিল সাম্রাজ্য স্থাপনের এক অসফল প্রয়াস থেকে, সে-কথা সব ইতিহাসবিদ্‌ই স্বীকার করেন। ১৭৬১ পর্যন্ত এত সফলভাবে অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও মারাঠারা শেষ পর্যন্ত পারল না, সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য অত্যাবশক কয়েকটি রীতিবিধি চালু করতে। 'হিন্দু-পদ-পাদশাহী'-র শ্লোগান প্রায় জন্মলগ্নেই পরিত্যক্ত হল, কারণ, পেশোয়ারা তাঁদের নামেমাত্র অধিরাজ সাতারার রাজাকে অধিক মর্যাদা দিতে আগ্রহী ছিলেন না। এই অধীনতাটুকুর থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তাঁরা এমন-কী সম্রাটের নাম-কা-ওয়াস্তে প্রভুত্ব স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন—অবশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে তাঁদের লাভ হত। কিন্তু পেশোয়ারা যেমন তাঁদের রাজাকে খেতাবী মর্যাদার অতিরিক্ত অধিকার ছাড়তে নারাজ ছিলেন, পরবর্তীকালে নানা ফড়নবিশ তাঁদেরও সেইরকম নিছক খেতাবধারীতে পর্যবসিত করেছিলেন। এইভাবে, সার্বভৌম ক্ষমতার একটি স্থায়ী আধার পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি।

মারাঠা রাজত্বনির্বাহে আর যে সমস্যাটি দেখা দেয় তার মূলে ছিল রাজকার্যের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ লুণ্ঠন থেকে সংগ্রহ করা। প্রায়শঃই এমন ভাবার কারণ ঘটেছে যে, একটি দেশ সরাসরি যুদ্ধ করে জিতে নেওয়ার চেয়ে সেই দেশটিকে চৌথ এবং সরদেশমুখীর চাপে ছারখার করাতেই মারাঠাদের আগ্রহ বেশি ছিল। ফলে, যদিও বা কোনোখানে মারাঠা প্রশাসন পুরোদস্তুর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (এবং 'মীরৎ-ই অহ্‌মদী'-র লেখক মহম্মদ আলির ওপর আস্থা রাখলে এ-কথা বলা যায়, কোনোকোনো ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠা যথেষ্ট কৃতিত্বপূর্ণ হয়েছিল), কিন্তু তার আগেই সে-অঞ্চল এমনভাবে লুণ্ঠিত হয়ে গেছে যে, ঐ শূন্যভাণ্ডার পূর্ণ করার জন্য মারাঠাদের আরো ব্যাপকভাবে লুণ্ঠনে নামতে হয়েছে।

আফগানিস্তানের আবদালি বা দুরানি সাম্রাজ্যের একই ধরনের পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে আমি যাচ্ছি না। ১৮শ শতাব্দীর শেষার্ধে এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এখনকার পাকিস্তান ও কাশ্মির। কয়েকটি মূল লক্ষণ, বিশেষত লুণ্ঠন থেকে আসা অর্থের উপর নির্ভরশীলতার দিক থেকে এটির সঙ্গে মারাঠাদের মিল ছিল।

তাহলে এ-কথা বলা যায় যে, ভৌগোলিক কারণে বা প্রতিরোধের জন্য লুণ্ঠন কর্মকাণ্ডে একবার বাধা পড়লে স্রোত বিপরীত মুখে বইতে বাধ্য; এবং গৃহযুদ্ধ—অর্থাৎ রাজ্যগুলির অভ্যন্তরে লুঠতরাজ—শুরু হওয়াটা অনিবার্য। মারাঠা ও আফগান শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ার এই ব্যাখ্যা মোটামুটি যুক্তি-সংগত বোধ হয়।

এখানে আমি আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই যা সম্ভবত এক অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক পীড়নের সূত্রপাত করেছিল, এবং এমন এক সময়ে যখন রাজ্যগুলি অন্যান্য দিক থেকে অপকেন্দ্রিক ঝোঁকের মুখে পড়েছে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশের বাংলা বিজয় শুরু হল, এবং সাত বছরের মধ্যে এরা পূর্বভারতে সর্বেসর্বা হয়ে বসল। এই বিজয় শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক ঘটনা ছিল না—এটি ভারতের বাণিজ্যক্ষেত্রের চেহারাও পুরোপুরি বদলে দিয়েছিল। বাংলা ও বিহারের খাজনা দিয়ে গড়ে উঠল ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির বিপুল অর্থভাণ্ডার, এবং এরই সাহায্যে ইংরেজরা বাংলা, বিহার ও করমণ্ডলের পণ্য রপ্তানিকে সামগ্রিক ভাবে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে পারল। খুব দ্রুতই এ রপ্তানিমাত্রা ৫০ লক্ষ স্টার্লিং অতিক্রম করে গেল।[১৯] রপ্তানিবাণিজ্যের এই পূর্ণবিচ্যুতি নিশ্চিতভাবেই ভারতীয় বাণিজ্যের ধাঁচটিকে বিপর্যস্ত করেছিল। যে গুজরাত ও আগ্রায়—বাংলা থেকে যেখানে রেশম ও সূতিবস্ত্র আমদানি করা হত সেখানে বাণিজ্যমন্দা ছিল অনিবার্য। একইভাবে, আফগানিস্তান মারফৎ স্থলবাণিজ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। ১৯শ শতাব্দীর আরম্ভে ইংরেজরা যত ভেতরের দিকে ঢুকতে থাকল, দেশীয় বাণিজ্য মন্দাও তত বেশি করে চোখে পড়তে থাকে।

অর্থনৈতিক এই মন্দা মারাঠা মৈত্রীসঙ্ঘ বা আফগান সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ক্ষমতায় কতখানি ঘা দিয়েছিল সেটা সুনিশ্চিতভাবে বলা অসম্ভব। ১৮০৩-এ ইংরেজদের দিল্লি অভিযানের কয়েক বছরের মধ্যেই আফগান সাম্রাজ্যের আকস্মিক পতন (১৮০৯) হওয়ার ঘটনাটি বিস্ময়কর। এলফিন্‌-স্টোন—যিনি আফগান শাসক শাহ্‌ সুজার দরবারে একটি দৌত্য নিয়ে গিয়েছিলেন, এবং তাঁর কর্তৃত্বের পতন চাক্ষুষ করেছিলেন—তিনি দেখেছিলেন বাণিজ্যের এই অবনতি এবং আফগান উপজাতীয়দের ব্যবসা বর্জন ও কৃষিকর্মে প্রত্যাবর্তন।[২০] বাণিজ্যমন্দা অতএব ঘটেছিলই: এখন প্রশ্ন হল এটির সঙ্গে ব্রিটিশদের যুদ্ধজয়ের সম্পর্ক ছিল কিনা, এবং আফগান সাম্রাজ্য পতনের ক্ষেত্রে এটির কোনো ভূমিকা ছিল কিনা। আমার বিচারে, দুটি প্রক্রিয়াই এমন ক্রমান্বয়ে ঘটেছে যে, সম্পর্ক একটা কিছু সাময়িকভাবে হলেও স্বীকার করে নিতেই হয়। হয়ত প্রমাণাদির ভিত্তিতে নিবিড়তর গবেষণার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে কোনোদিন আমরা আরো নিশ্চিত হতে পারব।

শেষে, এই 'সংক্রমণকালীন শাসনব্যবস্থা'গুলি সম্পর্কে একটি প্রশ্ন। এমন

কেন হল যে, ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে মোলাকাৎ হওয়া সত্ত্বেও এদের মধ্যে আধুনিকীকরণের উদ্যোগ দেখা গেল না? হায়দর আলি ও টিপু সুলতানের আমলে মহীশূরের প্রসঙ্গটি ব্যতিক্রম হিসাবেই ধরতে হবে। মারাঠা সর্দাররা—যেমন সিন্ধিয়া—কয়েকটি বাহিনীর প্রশিক্ষণ ও সৈনাপত্যে ইউরোপীয় অফিসার নিয়োগের চেয়ে বেশি আধুনিকতা দেখাতে পারেননি।

অথচ এটা বোঝা যায় না কেন মতাদর্শের স্তরে ইউরোপীয় প্রভাব খুব বেশি গভীরে যেতে পারে নি। এ-কথা সত্যি যে, পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানচর্চা সম্পর্কে তথ্যাদি পাওয়া যেতে থাকে ফার্সি রচনাবলীতে; কিন্তু নিবিড় পর্যালোচনার ফলে দেখা গেছে সেগুলি লেখা হয়েছিল কোনো ইংরেজ অফিসার অথবা ধর্মযাজকের নির্দেশক্রমে। এছাড়া ফার্সি সাহিত্য মূলত তার প্রতিষ্ঠিত পথেই এগিয়েছে। বস্তুত ১৮শ শতাব্দীতেই ভারতে ফার্সি সাহিত্যের চূড়ান্ত অগ্রগতি হয়। সি. এ. স্টোরি-র 'পার্শিয়ান লিটারেচার—এ বায়ো-বিব্লিওগ্র্যাফিকাল সার্ভের', প্রথম খণ্ডে উল্লিখিত একটি তালিকায় ১৭শ শতাব্দীর মাত্র ৬ জন লেখকের নাম দেখি যাঁরা ফার্সিতে একটি করে বই লিখেছেন। ১৮শ শতাব্দীতে অন্তত ৩২ জন হিন্দু লেখকের নাম পাওয়া যায় যাঁরা মোট ঊনপঞ্চাশটি বই লিখেছিলেন। উত্তরপুরুষের জন্য অর্পিত মুঘল সাম্রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ ছিল ঐ রচনাগুলি। কিন্তু, তাছাড়া, ইউরোপ থেকে আগত নতুন সংস্কৃতির প্রতি ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আগ্রহ কেন এত কম ছিল এবং কেন তাঁরা ঐ সংস্কৃতিকে প্রায় বর্জন করেছিলেন—এর ব্যাখ্যাও বোধহয় ঐ বইগুলি থেকে আংশিকভাবে মেলে।

[৩]

'সিয়ার-অল মুতাখ্খিরিন'-এর লেখক, যিনি স্বয়ং ইংরেজদের আশ্রয়ে ছিলেন, মুঘল প্রশাসনের একটি আদর্শ চিত্র তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন, এবং সেটিকে নমুনা হিসাবে পেশ করেছেন তাঁর রক্ষাকর্তাদের কাছে। তাঁর রচনার সময়কাল ১৭৮১। পরবর্তীকালে গ্রাণ্ট, শোর ও কর্ণওয়ালিস-এর মধ্যে যে-বিতর্ক ওঠে—সুবিখ্যাত 'ফিফ্‌থ রিপোর্ট'-এ যেটি প্রকাশিত হয়েছে—তাতে দেখা যায় নতুন শাসকরাও মুঘল সাম্রাজ্যের অধিকার ও প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন। বিশেষত তাঁদের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা ছিল মুঘল দৃষ্টান্ত ও অনুশীলনের দ্বারা প্রভাবিত। এমনও বলা হয়ে থাকে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ বহিরাগত ছিল না, ১৭শ শতাব্দীর বাংলায় মুঘল সরকারের প্রশাসন পদ্ধতির মধ্যেই এর বীজ নিহিত ছিল।[২১] মনরো-র রায়তওয়ারি ব্যবস্থা ছিল মুঘল আমলের 'জব্‌ত' নির্ধারণ-পদ্ধতিরই বিকশিত রূপ। মহীশূরের কয়েকটি অধিকৃত এলাকায় তিনি ঐ পদ্ধতির

প্রচলন দেখেছিলেন। 'বশীভূত ও বিজিত প্রদেশ'গুলির ব্রিটিশ প্রশাসকরা ভারতীয় ভূমি-রাজস্ব বিশেষজ্ঞতার উপর কতটা নির্ভরশীল ছিলেন তার নজির পাওয়া যায় আসিয়া সিদ্দিকি-র বই থেকে।[২২] ঐ বিশেষজ্ঞতা ছিল মুঘল ভূমি-রাজস্ব প্রশাসনেরই বিবর্তিত রূপ, এবং 'দেওয়ান-পসন্দ'-এর মতো রচনায় তার স্পষ্ট প্রতিফলন চোখে পড়ে। দেশের সর্বত্র একই প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং একটিই সরকারি ভাষা (ফার্সি) চালু করার ক্ষেত্রে মুঘলরা যতদূর এগিয়েছিল তাতে ইংরেজরা যথেষ্ট উপকৃত হয়েছিল। তাদের সৃষ্ট প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কঠিন করে তুলতে পারে এমন আঞ্চলিক বৈচিত্র্য কমই ছিল—তবুও তা ছিল বিরাজমান পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[২৩]

এ-প্রসঙ্গে আমি একটি তুলনীয় ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। স্প্যানিয়াউরা যখন পেরুর ইনকা সম্রাটকে বন্দী করে সাম্রাজ্যের শাসনভার নিজেদের হাতে নিল, তখন ইনকাদের অত্যধিক কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ধাঁচটিই তারা পুনঃস্থাপন করল নিজেদের প্রভুত্ব দ্রুত প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের জন্য। কিন্তু এ-কথা কখনোই বলা চলে না যে, স্পেনের ঐ উপনিবেশে কোনো-না-কোনোভাবে ইনকা সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বজায় ছিল। ঠিক সেইরকম, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিতটাই এত অন্যরকম ছিল যে, কোনোভাবেই তাকে মুঘল সাম্রাজ্যের অনুবর্তন বলা চলে না। দেশের মোট রাজস্বের ধারণাটিই—ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির মোট লাভের মতো—ছিল ব্রিটিশরাজ পত্তনের মূলমন্ত্র; এবং সরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের মাধ্যমে এ-দেশের সম্পদ ইংল্যাণ্ডে পাচার করাই ছিল চূড়ান্ত অভীষ্ট। এইভাবে, মুঘল সাম্রাজ্যের যেটুকু ধ্বংসের পরেও টিঁকে ছিল তাকে নতুন প্রয়োগবিধিতে ঢেলে সাজানো হল, এবং পুরনো সাম্রাজ্যের সঙ্গে মেলে এমন কিছুকেই গড়ে উঠতে দেওয়া হল না। ঐ সাম্রাজ্যেও অন্যায়-অবিচার ছিল, কিন্তু নতুন আমলে সেগুলি হাজির হল আগাগোড়া আলাদা ধরন এবং অন্তর্বস্তু নিয়ে।

টীকা

১. উইলিয়ম আরভিন: 'লেটার মুঘলস্', সরকার সম্পাদিত, ২ খণ্ড; এবং জে. এন. সরকার: 'ফল অফ দ্য মুঘল এম্পায়ার', ৪ খণ্ড, বারংবার উল্লিখিত।

২. জে. এন. সরকার: 'হিস্ট্রি অফ অওরঙজেব', III, (কলকাতা, ১৯১৬), পৃ. ২৮৩-৩৬৪।

৩. সতীশ চন্দ্র: 'পার্টিজ্ অ্যাণ্ড পলিটিক্স অ্যাট দ্য মুঘল কোর্ট', ১৭০৭-৪০' (আলিগড়, ১৯৫৯), পৃ. xliii-xlvii।

৪. ইরফান হবিব: 'অ্যাগ্রারিয়ান সিস্টেম অফ মুঘল ইণ্ডিয়া, ১৫৫৬-১৭০৭' (বোম্বাই. ১৯৬৩), পৃ. ৩১৭-৫১।

৫. তুলনীয় এম. এন. পিয়ার্সন—'ইণ্ডিয়ান ইকনমিক অ্যাণ্ড সোস্যাল হিস্ট্রি রিভিউ', ix, পৃ. ১১৪ এবং টীকা।
৬. ১৪৫০-এর হিসাবটি জে. রাসেল-এর (ফন্টানা ইকনমিক হিস্ট্রি অফ ইউরোপ, খণ্ড ১, পৃ. ৩৬) এবং ১৭০০-র হিসাবটি দিয়েছেন আঁদ্রে আর্মেগ্যঁ (তত্রত্য, খণ্ড ৩, পৃ. ২৭)।
৭. শিরিন মুসওয়ি—'ইণ্ডিয়ান ইকনমিক অ্যাণ্ড সোস্যাল হিস্ট্রি রিভিউ' x, পৃ. ১৯৪।
৮. তাভার্নিয়ে : 'ট্রাভ্‌লস্‌ ইন ইণ্ডিয়া, ১৬৪০-৬৭' (বল অনুদিত, ক্রুক সম্পাদিত, লণ্ডন, ১৯২৫), II, পৃ. ২।
৯. ফিলিস ডীন ও ডব্লু. এ. কোল : 'ব্রিটিশ ইকনমিক গ্রোথ, ১৬৮৮-১৯৫৯' (কেম্ব্রিজ, ১৯৬২), পৃ. ৭।
১০. ইরফান হবিব : 'টেকনোলজি অ্যাণ্ড ইকনমি অফ মুঘল ইণ্ডিয়া', দেবরাজ চনানা মেমোরিয়াল লেকচারস্‌, ১৯৭১।
১১. ইরফান হবিব : 'এনকোয়ারি', N.S. III (৩), পৃ. ৫৫।
১২. মারাঠা সেনাবাহিনীর গঠন সম্পর্কিত তথ্যাদির জন্য দ্রষ্টব্য সতীশ চন্দ্র—'ইণ্ডিয়ান ইকনমিক অ্যাণ্ড সোস্যাল হিস্ট্রি রিভিউ', x, পৃ. ২১৭ এবং টীকা। তুলনীয় ইরফান হবিব : 'অ্যাগ্রারিয়ান সিস্টেম অফ মুঘল ইণ্ডিয়া', পৃ. ৩৪৬-৫১।
১৩. তুলনীয় অরভিন : 'লেটার মুঘলস্‌', II, পৃ. ৩৫২ (সরকার-এর পরিশিষ্ট)।
১৪. আজাদ বিলগ্রামি : 'খজানা-ই আমির, কানপুর' (১৮৭১) পৃ. ৪৭।
১৫. মহিব্বুল হাসান খান : 'হিস্ট্রি অফ টিপু সুলতান' (কলকাতা, ১৯৫১), পৃ. ৩৪৪-৭।
১৬. ফিল ক্যালকিন্স—'জার্নাল অফ এশিয়ান স্টাডিজ্‌', xxix, পৃ. ৭৯৯ ও তৎপরবর্তী।
১৭. তুলনীয় জেড. মালিক—'ইণ্ডিয়ান ইকনমিক অ্যাণ্ড সোস্যাল হিস্ট্রি রিভিউ', iv, পৃ. ২৬৯-৭০।
১৮. তুলনীয় পিয়ার্সন—তত্রত্য, ix, পৃ. ১১৮ ও তৎপরবর্তী।
১৯. ১৭৯৭-৯৮-এ 'ইস্ট ইণ্ডিয়া' থেকে ব্রিটিশ আমদানির পরিমাণ ছিল ৫,৭৮৫,০০০ স্টার্লিং (ডীন ও কোল : 'ব্রিটিশ ইকনমিক গ্রোথ', পৃ. ৮৭), এর মধ্যে চিন থেকে আমদানিও ধরা হয়েছে ; কিন্তু চিনের বাণিজ্যের মূলধন আসত বাংলার রপ্তানি থেকে।
২০. মাউন্টস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন : 'অ্যান অ্যাকাউন্ট অফ দ্য কিংডম অফ কাবুল' (লণ্ডন, ১৮৩৯), I, পৃ. ৩৮৩, ৩৮৭-৮ এবং অন্যত্র।
২১. ইরফান হবিব : 'অ্যাগ্রারিয়ান সিস্টেম অফ মুঘল ইণ্ডিয়া', পৃ. ১৭৫-৯।
২২. এ. সিদ্দিকি : 'অ্যাগ্রারিয়ান চেঞ্জ ইন এ নর্থ ইণ্ডিয়ান স্টেট' (অক্সফোর্ড, ১৯৭৩), পৃ. ১৭৮-৯।
২৩. দ্রঃ এরিক স্টোকস্‌-এর প্রত্যক্ষ মন্তব্য—'পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেন্ট', সংখ্যা ৫৮, পৃ. ১৪৪-৫. ১৪৬-৭।

দস্তাবেজ

রসিকদাসের নামে ফরমানঃ ভূমি রাজস্বের দস্তাবেজ

এস. মুসওয়ি

১৭শ শতাব্দীর সরকারি ও বেসরকারি দস্তাবেজ যথেষ্ট পাওয়া গেলেও এগুলির এক বিশেষ দুর্বলতা চোখে পড়ে। আবুল ফজল কৃত মুঘল সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক ও ভৌগোলিক আলোচনা 'আইন-ই আকবরী' (আকবর-এর রাজত্বকালের শেষদিকে, ১৫৯৫-৯৬ নাগাদ, সংকলিত)-র সঙ্গে তুলনীয় কিছুই এ-আমলে মেলেনা। আকবর-এর রাজত্বকালে দলিল-দস্তাবেজের সংখ্যাল্পতা সত্ত্বেও টোডরমল ও ফতেহ্‌উল্লাহ্‌ শিরাজি কর্তৃক সম্পাদিক রাজস্ব প্রশাসনের স্মারকলিপি ও বিবরণী, এবং আকবর কর্তৃক বলবৎ অধিনিয়ম সমূহ (দস্তুর-উল আমল) থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি।[১] এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে. রাজস্ব প্রাশসনের সাধারণ বিষয়াদির ওপর কোনো-এক রাজস্ব আধিকারিক রসিকদাসের নামে জারি অওরঙজেব-এর ফরমানটি অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের দস্তাবেজ হিসাবে এটি ছিল সত্তর বর্ষকালের মধ্যে প্রথম।

অওরঙজেব-এর ৮ম শাসনবর্ষে (১৬৬৫-৬৬) জারি এই ফরমান থেকে ঐ সময়ের কৃষি-পরিস্থিতি সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়; ব্যার্নিয়ে-এর বৃত্তান্তে উল্লিখিত কৃষিসংকটের একটি চিত্র ফুটে ওঠে; এবং ঐ সংকট প্রতিকারে সম্রাটের নির্দেশানুসার ব্যবস্থাগ্রহণের কথাও ফরমানটিতে বলা আছে। এতদুদ্দেশ্যেই এ-তে বর্ণিত হয়েছে রাজস্ব প্রশাসনের প্রচলিত পদ্ধতি, এবং—আকবর-এর মৃত্যুর এত বছর পরে—আমরা পাই মুঘল রাজস্ব প্রশাসনের একটি দুর্লভ চিত্র।

এই ফরমান প্রকাশের কৃতিত্ব স্যর যদুনাথ সরকারের। সম্পাদিত লিখনটির[২] সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেটির ইংরাজি অনুবাদও প্রকাশ করেন।[৩] অবশ্য মোরল্যাণ্ড[৪] এবং ইরফান হবিবই[৫] প্রথম এটির পারিভাষিক শব্দাবলি ব্যাখ্যা করেন, এবং অওরঙজেব-এর আমলের কৃষি-পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ফরমানটির গুরুত্ব নির্দেশ করেন।

দুর্ভাগ্যবশত আর-কোনো প্রামাণ্য পাণ্ডুলিপির সঙ্গে লিখনটিকে মিলিয়ে দেখা হয়নি, এবং এটি যে-একমাত্র পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে প্রস্তুত হয়েছিল সেটিকেও বিদ্যমান পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে সর্বোত্তম বলা চলে না। প্রতিলিপিকরণের অনেক ত্রুটি তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে, যেগুলির কয়েকটি গুরুতর। লিখনটির এবম্বিধ ত্রুটি ছাড়াও তাঁর অনুবাদে—পারিভাষিক শব্দাবলি বোঝার ক্ষেত্রে—বেশ কিছু

ভুলচুক চোখে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, 'সাল-ই কামিল ও মুতস্‌সিল'-এর অনুবাদ তিনি করেছেন 'গত বছর ও তার আগের বছর', অথচ এটির হওয়া উচিত ছিল 'পুরো উসুলের বছর ও তার আগের আগের বছর'। 'আমল-ই জরিব' এবং 'কনকুৎ' শুধু 'ফসলের বাস্তবিক মূল্যনির্ধারণ' হয়েই থেকেছে। এছাড়া 'জিন্স-ই কামিল'-এর অনুবাদ করা হয়েছে 'পুরো ফসল' কিন্তু উচ্চ বর্গের ফসল বা পণ্যশস্য বলা হয়নি। 'দস্তুর-উল আমল' হয়েছে 'রাজস্ব বিধি' যদিও তা স্পষ্টতঃই প্রযুক্ত হত নগদ রাজস্ব-হার হিসাবে। অনুচ্ছেদ ৮-এ তিনি 'সর্ফ-ই সিক্কা' (অর্থাৎ নবপ্রবর্তিত মুদ্রায় ছাড়)-কে ভুলবশতঃ 'সির্ফ সিক্কা' ('সির্ফ' শব্দের অর্থ কেবলমাত্র) পড়েছেন, এবং অনুচ্ছেদটির অর্থবিপর্যয় ঘটেছে। এ-ধরনের আরো অনেক ভুল দেখতে দেখতে মনে হয় নতুন একটি অনুবাদের প্রয়োজন, যাতে ফরমানটির সঠিক অর্থপ্রকাশ হতে পারে।

নিচে যে-অনুবাদটি দেওয়া হল সেটি ফরমান-এর ৯টি প্রাপ্তব্য নকলের সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি হয়েছে।[৬] ঐ পাণ্ডুলিপিগুলির ৮টি রসিকদাসের নামে জারি ফরমান-এর নকল, এবং নবমটিতে (অ্যাডিশ্‌নল ১৯,৫০৩, ৬২এ-৬৩বি) তাঁর নামটি প্রতিস্থাপিত হয়েছে 'মীর মহম্মদ মুইজ, দেওয়ান-ই খালিস, সুবা বিহার'-এর দ্বারা। এ-থেকে ইরফান হাবিব সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ফরমান-টি কোনও ব্যক্তিবিশেষের নামে জারি হয়নি; বরং এটি ছিল খালিস-এর সমস্ত দেওয়ান-এর জন্য একটি পরিপত্র।[৭] সেক্ষেত্রে, অন্তত খালিস-এর অন্তর্গত এলাকায় একটি সাধারণ আদেশ বলে বিবেচিত হওয়ার দরুন, এটির গুরুত্ব বেড়ে যায়—কোনো ব্যক্তিবিশেষের নামে জারি হলে যতটা হত—তার চেয়ে বেশি। অবশ্য, অনুচ্ছেদ ৭—আগে কোনো শাহজাদার অধিকারে ছিল এমন জাগির-এর অন্তর্গত একটি এলাকার এক বিশেষ মামলার সঙ্গে যেটি জড়িত—পড়ে মনে হয় রসিকদাসের উত্থাপিত কিছু প্রশ্নের কৈফিয়ৎ দিতে গিয়েই প্রথম জারি হয়েছিল; এবং পরে, এটির সাধারণ তাৎপর্য লক্ষ্য করার পর, অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রচারিত হয়েছিল। এত অধিকসংখ্যক পাণ্ডুলিপির নকলে ফরমানটির উপস্থিতি থেকে মনে হয় এটিকে সাধারণ অধিনিয়মাদির দলিল হিসাবেও মানা হত।

সরকার-এর মুদ্রিত লিখনটিতে রসিকদাস-এর নামের সঙ্গে 'করোড়ি' (রাজস্ব-সংগ্রাহক) উপাধিটি যুক্ত দেখা যায়। আর-কোনও পাণ্ডুলিপিতে এমন নেই। তাছাড়া ফরমান-টির অন্তর্গত প্রমাণাদি থেকেও একথা স্পষ্ট যে, দেওয়ান স্তরের উচ্চ পদাধিকারী কারো নামেই এটি জারি হয়েছিল।[৮]

প্রস্তাবনায় উল্লিখিত নজিরগুলি থেকে অওরঙজেব-এর অষ্টম শাসনবর্ষকেই ফরমান জারির সময়কালে বলে মনে হয়, এবং ঐটিই ফরমান-এর অধিনিয়ম কার্যকর হওয়ার বছর বলে আখ্যাত হয়েছে। বছরটির মেয়াদ মার্চ ১৬৬৫ থেকে মার্চ ১৬৬৬, কিন্তু ফরমান বলবৎ হওয়ার কথা ছিল ঐ বছরের খরিফ ফসলকাটার সময় (অর্থাৎ অগষ্ট মাস), এবং তাহলে সেটা ১৬৬৫-তেই হওয়া সম্ভব।

অনুবাদের সঙ্গে ফরমান-এ ব্যবহৃত পরিভাষাগুলির একটি শব্দার্থপঞ্জি দেওয়া হয়েছে (পৃ. ১২৭-৮ দেখুন)। পারিভাষিক ঐ শব্দগুলি গ্রন্থাংশের অনুবাদে মূলরূপেই রয়েছে।

ইসলামের আজ্ঞাবহ, বিবেকবান বিত্তাধিকারী রসিকদাস সম্রাটের কৃপার্থী থাকুন এবং একথা জানুন যে, সম্রাটের সমস্ত ধ্যান-জ্ঞান-সংকল্পই যেহেতু জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সাম্রাজ্যবর্ধন এবং সমুদয় 'রিয়ায়া' (কৃষক শ্রেণী) আর বিধাতার আশ্চর্য সৃষ্টি প্রজাসাধারণের কল্যাণে সমর্পিত সুতরাং, এখন, খালিস ও তুযুলদার-দের পরগণাগুলির 'আমল' (রাজস্ব সংগ্রহ)-এর বাস্তবতা সামনে রেখে শাহী কার্যাধিকারিকরা মহামহিমের বিচারার্থ এই প্রস্তাব পেশ করছেন যে, বর্তমান বর্ষে শাহী অধিকারভুক্ত এলাকার পরগণাগুলির আমিন (নির্ধারক)-রা 'সাল-ই কামিল' (সর্বাধিক রাজস্ব আদায়ের বছর), কৃষিযোগ্য জমির 'হাসিল' (রাজস্ব উসুল), কৃষক শ্রেণীর কর্মদক্ষতা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য মাথায় রেখে বছরের শুরুতেই পরগণার অধিকাংশ গ্রামের 'জমা' (অনুমিত রাজস্ব) নির্ধারণ করুন। যদি কোনো গ্রামের কৃষকরা রাজস্ব আদায়ের উক্ত পদ্ধতিটি পছন্দ না করে তাহলে তারা যেন জমার নির্ধারণ ফসল কাটার সময় জরিপ বা কনকুৎ বিধিমত করিয়ে নেয়। যে-সমস্ত গ্রামে কৃষকের দুর্দশা বা অপ্রতুল উৎপাদন-সাধনের কথা তাঁদের জানা আছে সেখানে আমিন-রা যেন (ফসলের) অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ অথবা দুই-পঞ্চমাংশ কিংবা কিছু কম-বেশি হারে 'গল্ল-বখ্‌শি' (ফসল ভাগ) করিয়ে নেন। বছরের শেষে তাঁর (দেওয়ান-এর) নিজস্ব 'তসদিক' (অনুমোদন) এবং করোড়ি-দের 'কবুল' (স্বীকৃতি) ও চৌধুরি তথা কানুনগো-দের দস্তখত (স্বাক্ষর) সহ, অধিনিয়মসমূহ ও বাস্তবিক কর্মনীতি অনুসারে, 'জমা-ই নকদি' (নগদ হিসাবে ঘোষিত জমা)-র 'তওয়ামির' (খাতা) যেন শাহী কার্যালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু শাহী কার্যালয় থেকে কৃষিজমি এবং রবি ও খরিফ ফসলের বিস্তৃত ভাষ্য পাওয়া গেলেও প্রত্যেক পরগণার অন্তর্গত 'আরজি' (মাপিত এলাকা)-র সেই বিবরণী মেলে না যাতে দেখানো আছে [ক] গত বছরে 'জিন্স-ই কামিল' (উচ্চ বর্গের ফসল) ও 'জিন্স-ই নাকিস' (নিম্ন বর্গের ফসল) কতটা (পরিমাণ জমিতে চাষ) হয়েছিল, এবং সে-তুলনায় বর্তমান বছরে হ্রাসবৃদ্ধি কিছু হয়েছে কিনা; [খ] 'মুস্তাজির' (রাজস্ব প্রদায়ী কৃষক), 'রিয়ায়া' (কৃষক শ্রেণী) ইত্যাদি রূপে বর্গীকৃত 'মুজারি' (ফসল উৎপাদক)-দের সংখ্যা কত। এ-থেকে প্রত্যেক মহলের অবস্থা এবং সেখানকার মুৎসদ্দি (ভারপ্রাপ্ত কর্মচারি)-দের যোগ্যতার বাস্তবিক পরিচয় পাওয়া যেত। ঐ মুৎসদ্দিরা—সংশ্লিষ্ট মহলের 'হাসিল' (রাজস্ব আদায়) নির্ধারিত জমা-র চেয়ে কম হলে পর, অনাবৃষ্টি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা ফসলের পড়তিদর কিংবা অন্য কিছুর ওজর দেখিয়ে—মোট জমা থেকে ছাড়ের অনুমতি দিতে পারেন। যদি প্রতিটি গ্রামে তাঁরা কৃষক ও কৃষির বাস্তব পরিস্থিতির সম্যক্

জ্ঞানের উপর দাঁড়িয়ে 'আমল-নুমায়ন্দ' (রাজস্ব) (নির্ধারণ ও) সংগ্রহ করেন, এবং কৃষিযোগ্য জমিতে চাষ, তথা 'জিন্স-ই কামিল' (উচ্চ বর্গের ফসল) বাড়ানোর চেষ্টা করেন তবে পরগণার গ্রামগুলি উৎপাদনশীল, কৃষক সমৃদ্ধ, ও 'মহমুল' (রাজস্ব, ফসল) বৃদ্ধি হবে। আর যদি কোনো (প্রাকৃতিক) বিপর্যয়ও আসে তবে প্রচুর ফসল মজুত থাকার দরুণ হাসিল-ও খুব পড়ে যাবে না।

(এতদ্বারা) বিশ্ব-দমক, ব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রক আদেশ এইমত জারি হয় যে, নিজের নিজের দেওয়ানী ও আমিনী-র অন্তর্গত পরগণাগুলির প্রতিটি গ্রামের বাস্তব পরিস্থিতি জানুন—যথা, সেখানে (তাঁর অধিকারভুক্ত এলাকায়) কৃষিযোগ্য 'আরজি' কত, তার মধ্যে কতটা জমিতে চাষ হয় কতখানিতে হয় না, প্রত্যেক বছর 'জিন্স-ই কামিল' (চাষ হয়েছে এমন জমি)-র পরিমাণ এবং উল্লিখিত আরজি-তে চাষ না-করতে পারার কারণ। এটাও বোঝার চেষ্টা করুন যে, আকবর-এর পবিত্র শাসনকালে রাজা টোডরমল-এর দেওয়ানীতে মহসুল আদায়ের দস্তুর (দর) কত ছিল ; 'সাইর' কর পুরনো অধিনিয়ম অনুযায়ী ছিল নাকি এই আমলের প্রথম বছর থেকে উচ্চ (হারে) স্থির করা হয়েছিল ; কতগুলি গ্রামে বসতি ছিল আর কতগুলিতে ছিল না, এবং বসতি না-হওয়ার কারণ কী। এ-সমস্ত বিষয়গুলি জেনেবুঝে একটি উপযুক্ত 'কৌল' (অঙ্গীকৃত রাজস্ব হার), উচিত 'কড়ার' (রাজিনামা) ও 'জিন্স-ই কামিল' বাড়ানোর সাথে সাথে নির্জন গ্রামগুলিতে বসতি স্থাপন ও কৃষিযোগ্য জমিতে ফসল ফলানোর চেষ্টা করতে থাকবেন। যেখানে যেখানে মেরামতযোগ্য কূয়া আছে সেগুলি মেরামত করিয়ে নিন এবং নতুন কূয়া খনন করান। জমা নির্ধারণ এমনভাবে করুন যাতে সমস্ত কৃষকই নিজের প্রদেয়টুকু মিটিয়ে দিতে পারে, আর 'মাল-ই ওয়াজিব' (অধিকারভুক্ত ভূমির রাজস্ব) সময়মত উসুল হয়ে যায়, এবং একটিও কৃষক নিপীড়িত না হয়। প্রতি বছর প্রতিটি গ্রামের কৃষকসংখ্যা এবং আরজি—কর্ষিত ও অকর্ষিত, উত্তম সেচযুক্ত ও কেবলমাত্র বৃষ্টিনির্ভর, উচ্চ ও নিম্নবর্গের ফসলের অন্তর্গত—আর কৃষিযোগ্য জমিতে চাষের সফলতা ও উচ্চবর্গের ফসল (চাষের অন্তর্গত জমির) বৃদ্ধি, এবং বহুকালের নির্জন গ্রামগুলিতে বসতিস্থাপনের বিবরণ প্রস্তুত করুন। অতঃপর পুরো বছরের হিসাব—এবং বিগত 'দস্তুর-উল আমল'-এর মধ্যে বৃদ্ধি, যদি কিছু হয়ে থাকে—তার বিবরণ (শাহী কার্যালয়ে) পাঠিয়ে দিন।

এই পদ্ধতির অধিনিয়ম ও আইন

মহামহিমের সিংহাসনারোহণের অষ্টম বর্ষের খরিফ ফসলের শুরু থেকে বলবৎ ধরে নিয়ে তদনুসার কার্য সম্পাদন করুন, এবং মহলের আমিল ও জাগিরদার-দের এতন্নির্দিষ্ট বিধিতে কাজ করার আদেশ দিন যে :

১. চৌধুরী ও আমিল দের ব্যক্তিগত মেলামেশার অনুমতি যেন দেওয়া

না হয় এবং দেওয়ানী (কার্যালয়ে) তাঁরা যেন অবশ্যই উপস্থিত থাকেন ; (অন্যদিকে) নিজের অবস্থা নিবেদন করতে-আসা 'রজা রিয়ায়া' (ক্ষুদ্র কৃষক) ও দরিদ্র জনতার সাথে যেন—নিজে ও সর্বসমক্ষে —উভয় প্রকারেই দেখা করেন এবং স্বয়ং পরিচিত হন, যাতে তাদের আপন যাচ্ঞা ব্যক্ত করতে অন্য কারও মধ্যস্থতার প্রয়োজন না হয়।

২. আমিল-রা যেন বছরের প্রথমেই গ্রামে গ্রামে লাঙল সংখ্যার সাথে সাথে কৃষকের (সংখ্যা) এবং আরজি-র পরিসীমা গণনা করেন। সচ্ছল কৃষকদের জন্য যেন এমন বন্দোবস্ত করা হয় যাতে তারা সকলেই, নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী, 'বুবাই'-এর অন্তর্গত জমি বাড়ানোর আয়াস করে, এবং এইভাবে, গত বছরের 'জিন্স-ই অদনা' (নিম্নবর্গের ফসল)-র চাষগুলিকে 'জিন্স-ই আলা' (উচ্চবর্গের ফসল) চাষে রূপান্তরিত করার পাশাপাশি কর্ষিত জমির পরিসীমা বাড়াতে পারে, কৃষিযোগ্য জমি যেন—যতদূর সম্ভব—'অফতাদ' (অকর্ষিত) পড়ে না থাকে। যদি কোনো 'কারিন্দ' (কৃষক) পলাতক হয় তবে (আমিল) যেন প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করেন এবং জন্মস্থানে তাকে ফিরিয়ে আনার সবরকম প্রচেষ্টা নেন। এইভাবে সর্বত্র থেকে কৃষকদের এনে একত্র করার জন্য তাঁরা যেন শান্তি ও সৌহার্দ্যের দৃষ্টান্তমূলক উদ্যোগ নেন। 'বঞ্জর' (কৃষিযোগ্য পতিত) জমির জন্য এমন 'দস্তুর' (রাজস্ব হার) ধার্য করুন যাতে সেগুলিতে চাষ শুরু হয়।

৩. পরগণাগুলির আমিন-রা যেন প্রতি বছর গ্রামে গ্রামে 'আসামী-ওয়ার' (কৃষক প্রতি) কৃষির 'মৌজুদান' (বাস্তব অবস্থা, সম্পত্তি)-এর হিসাব নেন, এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাইয়ের পর প্রশাসনিক 'কিফায়ৎ' (মিতব্যয়) ও কৃষক জনতার কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রেখে জমা নির্ধারণ করেন, এবং জমা-র 'ডৌল' (খাতা) অনতিবিলম্বেই শাহী কার্যালয়ে পাঠিয়ে দেন।

৪. জমা নির্ধারণের পর এমন ব্যবস্থা নিন যাতে 'নিয়ত' (পদ্ধতি) অনুসারে প্রত্যেক পরগণায় 'মাল'-ই ওয়াজিব' (পরিশোধ)-এর কিস্তি তৈরি হয়ে যায়। এ-ব্যাপারে (আমিল-দের) নির্দেশ দিন যাতে 'মহসুল' আদায় ঠিক সময়ে শুরু হয়, এবং নির্ধারিত মেয়াদ অনুসারেই চাহিদা পেশ করা হয় ; এবং (সংগ্রহের) সাপ্তাহিক বিবরণী স্বয়ং দেখুন। এমন নির্দেশ দিন যাতে ধার্য কিস্তির কিছুই অনাদায়ী না থাকে। প্রথম কিস্তির একেকটি ভাগ একত্র না-করা গেলে সেটা দ্বিতীয় কিস্তির সঙ্গে যেন উসুল করা হয়, এবং তৃতীয় কিস্তিতে—কোনও বকেয়া না রেখে— পুরো আদায় করে নিতে হবে।

৫. কৃষকের অবস্থা ও কর্মদক্ষতা অনুসারে (বিগত) বছরগুলির বকেয়া (পরিশোধ)-এর জন্য উপযুক্ত কিস্তি তৈরি করান। করোড়ি-দের

আদেশ দিন যাতে রাজিনামা অনুযায়ী (ঐ কিস্তি) আদায় করা হয়, এবং রাজস্ব সংগ্রহের অগ্রগতি স্বয়ং অবগত থাকুন। আমিল-দের অসাবধানতা বা অন্য কোনো অজুহাতেই যেন কালক্ষেপ না হয়।

৬. যখনই স্বয়ং পরগণাগুলির সঠিক পরিস্থিতি জানতে বেরোবেন তখন প্রতিটি গ্রামে কৃষির হাল, ফসল, কৃষকের কর্মদক্ষতা এবং জমার পরিমাণ নিরীক্ষা করুন। যদি দেখেন জমার ভাগবিন্যাসে প্রত্যেক ব্যক্তিগত করদাতার ক্ষেত্রে ন্যায্য ও সঠিক গণনা অনুসৃত হয়েছে তো ভালো; অন্যথায়—যদি চৌধুরি বা মুকদ্দম বা পটওয়ারিরা উৎপীড়ন করে থাকে তাহলে—কৃষককে আশ্বস্ত করুন ও তার প্রাপ্য ফিরিয়ে দিন; এবং 'মুৎগল্লিন' (ক্ষমতাবান)-দের 'গুঞ্জাইশ' (সুবিধা) কেড়ে নিন। বর্তমান বছরের নির্ধারিত জমা ও তার মৌজুদান ভাগবণ্টনের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তে নিজেকে নিয়োজিত করুন এবং (শাহী কার্যালয়ে) বিস্তারিত বিবরণ পাঠান, যাতে আমিন-দের ক্ষমতার সঠিক হাল ও তাঁর (অর্থাৎ বিত্তাধিকারীর, অর্থাৎ পত্রপ্রাপকের) ব্যবস্থপনা নিরীক্ষা করা যায়।

৭. খালিস প্রশাসনের রাজস্ব-অধিনিয়ম অনুসারে নানকার ও অন্য পারিতোষিক চালু রাখুন। শাহ্‌জাদা-রা আমিল-দের সহায়তায় সম্পত্তিবৃদ্ধি করল কিনা তার খোঁজ রাখুন যাতে ঐ প্রকারের অতীত মামলাগুলির দৃষ্টান্ত থেকে—তনখা (জাগির-প্রাপ্তির)-র শুরু থেকে তারা (নানকার ও পারিতোষিক প্রাপকরা) বকেয়া হিসেবে কত অনাদায়ী রেখেছে এবং অনাবৃষ্টি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কত ছাড় দিয়েছে—সেসব উসুল করা যায়; এবং ভবিষ্যতের জন্য এই স্থির করুন যে, তারা (ঐ প্রাপকরা) যখনই পরগণাগুলিকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারবেন, প্রত্যেককে তৎপ্রদত্ত পরিষেবার আনুপাতিক অনুদান দেওয়া হবে।

৮. এই ব্যবস্থা করুন যাতে 'ফোতখানা' (কোষাগার)-র ফোতদার (কোষাধ্যক্ষ) সৌভাগ্যসূচক আলমগীরী মুদ্রাই কেবলমাত্র গ্রহণ করেন। অকুলানের সময়ে বাজারে চালু মুদ্রা শাহ্‌জহানী চলান (তদবধি প্রচলিত শাহ্‌জাহানের মুদ্রা) গ্রহণ, এবং 'সর্ফ-ই সিক্কা'-র 'অবওয়াব' (শুল্ক) আদায় করলেও যেন কখনোই কম গুরুত্বের মুদ্রা—যা বাজারে অপ্রচলিত না নেন। তবে, যদি এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, দোষযুক্ত মুদ্রা ক্রমাগত বাতিল করতে থাকলে 'তহসিল'-এ (রাজস্ব সংগ্রহে) বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা, তখন যেন ন্যায্য বাটা নিয়ে (করদাতাদের) উপস্থিতিতে দোষযুক্ত মুদ্রাগুলিকে চালু মুদ্রায় বদলে দেন।

৯. ঈশ্বর না করুন, কোনো মহল যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে পড়ে তাহলে আমিন ও আমিলদের কড়া নির্দেশ দিন যাতে তারা পূর্ণ বিবেচনার

সাথে ফসল 'মৌজুদান'-এর তত্ত্বাবধান করেন, এবং কৃষকের মাথাপিছু (ক্ষতির পরিমাণ) অবগত হয়ে বিস্তারিত নিরীক্ষাপূর্বক 'হস্ত-ও বুদ' অনুসারে (কর) নির্ধারণ করেন। কোনো অবস্থাতেই যেন বিপদাপন্নতার কারণে 'আফাৎ-ই-সরবস্ত' (পুরো মকুব) না করেন—বিশেষত যেগুলির ভাগবণ্টন চৌধুরি, কানুনগো, মুকদ্দম ও পটওয়ারি-দের হাত দিয়ে হয়—যাতে 'রজা রিয়ায়া' (ক্ষুদ্র কৃষক)-রা নিজেদের ভাগ থেকে বঞ্চিত না হয় ও সর্বনাশ থেকে রক্ষা পায়, এবং ক্ষমতাবানরা তাদের উৎপীড়ন করতে না পারে।

১০. আমিন, আমিল, চৌধুরি, কানুনগো আর মুকদ্দম-দের 'মলবা'র সমাপ্তি, মাল (ভূমি রাজস্ব) ছাড়া অন্যান্য ব্যয় বিলোপ ও নিষিদ্ধ কর—যেগুলি কৃষকের হয়রানির উপলক্ষ্য হতে পারে—এই সব ব্যাপারে কড়া হুকুম দিন; তাঁদের থেকে অঙ্গীকারপত্র নিন যে, কখনো 'মলবা' বাড়াবেন না এবং শাহী দরবার কর্তৃক নিষিদ্ধ অথবা মকুব কর আদায় করবেন না; স্বয়ং এ-সমস্ত অবগত থাকুন; তথাপি যদি কেউ এ-কাজ করেন এবং নিন্দাবাদ ও নিষেধ সত্ত্বেও করে যেতে থাকেন তবে শাহী দরবারে মামলাগুলি উপস্থাপন করুন যাতে (অপরাধীকে) পদচ্যুত করা যায় এবং তাঁর স্থানে অন্য কাউকে নিয়োগ করা যায়।

১১. ভারতীয় কাগজপত্র ফারসিতে অনুবাদ করার জন্য প্রত্যেক 'আসামী' (কৃষক)-র আদায়কৃত 'বছ', 'বহরী মাল', 'ইখরাজাৎ' (গ্রামের ব্যয়) ও 'রসুমান' (অধিকার)-এর হিসাব দেখুন। কৃষকের থেকে সব রকমে প্রাপ্য সর্বমোট রাশি কোষাগারের হিসাবে এনে নামে নামে (আমিন, আমিল, জমিন্দার কর্তৃক নিয়োজিত) দেয়াদেয়ের বিবরণ প্রস্তুত করেন। যতদূর সম্ভব পরগণার সমস্ত গ্রামের 'কাগজ-ই কাম' (পটওয়ারি-র কাগজ) একত্রিত এবং অনূদিত করুন। যদি পটওয়ারি-র অনুপস্থিতি বা অন্য কোনো কারণে কয়েকটি গ্রামের কাগজপত্র না পাওয়া যায় তবে সব গ্রামের 'বরামদ' (হিসাব পরীক্ষা)-এর ভিত্তিতে একটি আনুমানিক রাশি খাতায় লিখে নিন। খাতা তৈরির পর দেওয়ান সেটি নিরীক্ষা করুন। যদি 'দস্তুর' (নিয়ম) মাফিক তৈরি হয়ে থাকে তবে অনুমোদন করুন, এবং অধিনিয়মাদি অনুসারে আমিল কর্তৃক দুর্নিয়োজিত এবং তৎসহ চৌধুরি, কানুনগো, মুকদ্দম ও পটওয়ারি কর্তৃক রসম (প্রচলিত অধিকার)-এর চেয়ে বেশি নিয়োজিত ধন উদ্ধার করে নিন।

১২. আমিন, করোড়ি ও ফোতদার-দের মধ্যে তাঁদের প্রত্যেকের নাম লিখুন যাঁরা বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠা সহকারে সেবা করেছেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে এতন্নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণপূর্বক প্রশংসনীয় কাজ করেছেন, যাতে তাঁদের

বিবেক ও বিশ্বস্ততার পুরস্কার মেলে। যদি কেউ নিয়মের বাইরে চলেন তবে শাহী দরবারে সেটি জ্ঞাপিত করুন যাতে তাঁদের পদচ্যুত করা যায় এবং উচিতদণ্ড দেওয়া যায়।

১৩. সময়মাফিক খাতা তৈরির উপর জোর দিন। মহলের—যেখানে তিনি স্বয়ং বাস করেন—মাল (ভূমি রাজস্ব) ও 'সাইর' কর সংগ্রহ তথা মূল্য-সূচির রোজনামচা প্রতিদিন, অন্যান্য পরগণার মাল ও 'মৌজুদান' সংগ্রহের রোজনামচা প্রতি পনের দিন অন্তর, ফোতদার-এর 'তহবিল' (গচ্ছিত ধন)-এর 'অরসথ' প্রতি মাসে, এবং প্রতি ফসলের সময় 'জমা', 'মুজমিল' ও 'জমাবন্দি'-র খাতার সঙ্গে ফোতদার-এর জমা ও খরচ (আয় ব্যয়)-এর হিসাব নিন। এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিবরণ দেওয়ার জন্য ডাকুন যাঁরা ন্যায্য রাশির চেয়ে কিছুমাত্রও বেশি নিয়োজিত করেছেন, এবং এই জ্ঞাপনী শাহী দরবারে পাঠান। খরিফ এবং রবিশস্যের কাগজপত্র যেন ওলটপালট না হয়ে যায়।

১৪. পদচ্যুত আমিন, আমিল বা ফোতদার-এর থেকে সমস্ত নথিপত্র আদায় করুন এবং তার সঙ্গে হিসাব মিটিয়ে ফেলুন। হিসাব নিরীক্ষাপূর্বক দেওয়ানীর বিধি অনুসারে 'অবওয়াব-ই বাজ্যাফ্ৎ' (উদ্ধারযোগ্য নিয়োজন) উসুল করুন। 'অবওয়াব-ই বদরনওয়সী' (নিরীক্ষিত নিয়োজন) উসুলের বিবরণ সহ কাগজপত্র শাহী কাছারিতে পাঠিয়ে দিন যাতে (পদচ্যুত আধিকারিক) ঐ কার্যালয় থেকে 'অজ মুহাসিব ফারগ' (হিসাব সাফ) (-এর প্রমাণ পত্র) পেয়ে যান।

১৫. প্রত্যেক ফসলের ওপর—নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে—দেওয়ানীর কাগজপত্র সংকলিত করুন, এবং নিজস্ব মোহর ও অনুমোদন সহ শাহী কার্যালয়ে পাঠিয়ে দিন।

i. অবওয়াব-ই বাজ্যাফ্তী : (মূল শব্দ অবওয়াব-ই বাজ্যাফ্তানী) উদ্ধারযোগ্য কর বা দুর্নিয়োজন
ii. আফাৎ-ই সরবস্ত : বিপত্তির কারণে পুরো মকুব
iii. আমল : রাজস্ব সংগ্রহ
iv আমল-ই জরিব : এলাকার মাপজোক দ্বারা ভূমি রাজস্ব নির্ধারণের বিধি
v. আমিল : রাজস্ব সংগ্রাহক
আমিন : রাজস্ব নির্ধারক
vi. অরসথ : কাগজপত্র যাতে নির্ধারণ উসুল ও বকেয়ার বিবরণ আছে
vii. আরজি : মাপিত এলাকা
viii. আসামী-ওয়ার : কৃষকপ্রতি

ix. বন্থ : গ্রামের ভূমি রাজস্ব সমুদায়ে কৃষকগণ কর্তৃক আদ-য় যোগ্য রাশি

x. বঞ্জর : কৃষিযোগ্য পতিত জমি

xi বাকি : ভূমি রাজস্বের বকেয়া

xii. বরামদ : যা পাওয়া যায়. হিসাব পরীক্ষা

xiii. বহরী মাল : কৃষকের ভূমি রাজস্বের প্রদেয়াংশ পূর্ণ করার জন্য প্রার্থিত ধন

xiv. চলনি : প্রচলিত মুদ্রা

xv. চৌধুরি : শাহী প্রশাসন দ্বারা স্বীকৃত পরগণা-আধিকারিক যিনি রাজস্ব একত্র করায় সহায়তা করে থাকেন

xvi. দস্তুর-উল আমল : নগদ রাজস্ব হার

xvii. ডৌল : রাজস্বের খাতা

xviii. দেওয়ান : রাজস্বের মামলাগুলি দেখার জন্য (সাধারণতঃ) সুবা-র প্রধান কার্যালয়ে যে-আধিকারিক নিযুক্ত হতেন

xix. ফোতদার : কোষাধ্যক্ষ

xx. ফোতখানা : কোষাগার

xxi. গল্ল-বখ্শি : ফসল ভাগ দ্বারা রাজস্ব আদায়ের রীতি

xxii. গুঞ্জাইশ : লাভ

xxiii. হস্ত-ও বুদ : অনুমিত মোট ফসলের ভিত্তিতে নির্ধারণের বিধি

xxiv. হাসিল : রাজস্ব উসুল ; ফসল

xxv. ইনাম : এমন জমি যেখানে কোনও দায় ছাড়াই রাজস্ব আদায়ের অধিকার প্রদত্ত হত এবং সেজন্য সেনা পোষারও ছিল না

xxvi. জাগিরদার : জাগির-এর অধিকর্তা

xxvii. জমা : অনুমিত রাজস্ব

xxviii. জমা-বন্দি : রাজস্ব নির্ধারণ

xxix. জমা-ও খরচ : আয় ব্যয়

xxx. তুযুলদার : জাগিরদার-এর সমার্থক

xxxi. জমা-ই নকদি : নগদ হিসাবে ঘোষিত জমা

xxxii. তওয়ামির : খাতা

xxxiii. উমনা : আমিন-এর বহুবচন

xxxiv. জমা ওয়াসিল বাকি : নির্ধারণ, সংগ্রহ ও বকেয়া-র বিবরণ

xxxv. জিন্স-ই কামিল : পণ্যশস্য, উচ্চ বর্গের ফসল [সমার্থক শব্দ : জিন্স-ই আলা]

xxxvi. জিন্স-ই নাকিস : নিম্ন বর্গের ফসল [সমার্থক শব্দ : জিন্স-ই অদনা]

xxxvii. কাগজ-ই কাম : গ্রামের পটওয়ারির কাগজপত্র

xxxviii. কনকুৎ : এলাকার মাপজোক এবং বিঘাপ্রতি অনুমিত ফসলের ভিত্তিতে ভূমি রাজস্ব নির্ধারণের এক রীতি যাতে প্রাপ্য ফসলের হিসাবে স্থির করা যায়

xxxix. করোড়ি : রাজস্ব সংগ্রাহক

xl. খালিস : শাহী কোষাগারের জন্য সংরক্ষিত জমি ও রাজস্বের উৎস

xli. মহসুল : রাজস্ব, ফসল

xlii. ইখ্‌রাজাৎ-ই দেহ্‌ : গ্রামের ব্যয়

xliii. মাল : ভূমি রাজস্ব

xliv. মাল-ই ওয়াজিব : অধিকারভুক্ত ভূমির রাজস্ব

xlv. মুজমিল : পাকা খাতা

xlvi. মুকদ্দম : গ্রামের মোড়ল

xlvii. মুস্তাজির : রাজস্ব কৃষক

xlviii. মলবা : গ্রাম-সমূহ দ্বারা কৃত—ভূমি রাজস্বের চাহিদা পূর্ণ করার জন্য যতটুকু তা ছাড়া—পরিশোধ

xlix. মৌজুদান : বাস্তাবিক অবস্থা, সম্পত্তি

l. মুহাসিব : হিসাব পরীক্ষা

li. সরিশ্‌ৎ-ই ওয়সুল-ই অবওয়াব-ই বদরনবিসী : অনধিকৃত নিয়োজন সংগ্রহের নিরীক্ষিত খাতা

lii. মুৎসদ্দি : আধিকারিক

liii. মুজারি : কৃষক

liv. নানকার : ভূমি রাজস্ব একত্রিত এবং জমা করার জন্য জমিদার ইত্যাদিকে দেয় ভাতা

lv. পটওয়ারি : কৃষকদের তরফে রাজস্বের বিবরণ রাখার গ্রাম-হিসাবরক্ষক

lvi. কানুনগো : বাদশাহ কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক যাঁর কাজ ছিল রাজস্বের বিগত নির্ধারণ ও সংগ্রহের বিবরণ রাখা এবং নির্ধারণের কাজে আমিন-কে সহায়তা করা

lvii. কড়ার : যে-চুক্তিতে করদাতা তার ওপর নির্ধারিত কর স্বীকার করে নেয়

lviii. কৌল : অঙ্গীকৃত রাজস্ব হার

lix. রজা রিয়ায়া : ক্ষুদ্র কৃষক

lx. রোজনামচা : দৈনিক হিসাব

lxi. রিয়ায়া : কৃষকশ্রেণী

lxii. রসুমাত : প্রথাগত অধিকার
lxiii. সাইর্‌ : ভূমি রাজস্ব ব্যতীত অন্য কর
lxiv. সাল-ই কামিল : সর্বাধিক রাজস্ব আদায়ের বছর
lxv. সর্ফ-ই সিক্কা : নবপ্রবর্তিত মুদ্রার উপর অধিশুল্ক
lxvi. সিক্কা : নবপ্রবর্তিত মুদ্রা
lxvii. তহ্‌সিল : রাজস্ব উসুল
lxviii. তহ্‌বিল : গচ্ছিত ধন
lxix. তসদিক : সমর্থন

টীকা

১. টোডরমল-এর বিজ্ঞপ্তির জন্য দেখুন আকবরনামা, খণ্ড III, অহমদ আলি কর্তৃক সম্পাদিত (কলকাতা, ১৮৭৭), পৃ. ৩৮১-৩; এবং ফাতুল্লাহ্‌ শিরাজি-র বিজ্ঞপ্তির জন্য ওখানেই, পৃ. ৪৫৭-৯।
২. জার্নাল অফ দ্য রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, জুন ১৯০৬, পৃ. ২৪৯-৫৫।
৩. সরকার : মুঘল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (কলকাতা, ১৯২৪), পৃ. ২১৩-২৯।
৪. ডব্লু. এইচ. মোরল্যাণ্ড : অ্যাগ্রারিয়ান সিস্টেম অফ মুঘল ইণ্ডিয়া (কেম্‌ব্রিজ, ১৯২৯), পৃ. ১৩২-৮।
৫. ইরফান হবিব : অ্যাগ্রারিয়ান সিস্টেম অফ মুঘল ইণ্ডিয়া (বোম্বাই, ১৯৬২), পৃ. ২২২, পাদটীকা ইত্যাদি।
৬. এর জন্য অধ্যাপক ইরফান হবিব-এর কাছে আমি ঋণী। তুলনীয় পাণ্ডুলিপিগুলি এই :
   (i) I.O. ১১৪৬
   (ii) I.O. ১৫৬৬
   (iii) নিগরনামা-ই মুনশি, বি.বি.
   (iv) নিগরনামা-ই মুনশি, বোদল্যেয়ন লাইব্রেরি
   (v) ব্রিটিশ ম্যুজিয়ম অ্যাডিশ্‌ন্‌স ১৯, ৫০৩, পৃ. ৬২এ-৬৩বি
   (vi) বার্লিন রয়াল লাইব্রেরি, এন্ট্রি ১৫(এ)
   (vii) নিগরনামা-ই মুনশি, মুদ্রিত লিখন
   (viii) সরকার-এর ব্যক্তিগত নকল
৭. ইরফান হবিব : উপরোক্ত, পৃ. ২২২ ও পাদটীকা।
৮. মোরল্যাণ্ড : উপরোক্ত, পৃ. ১৩৩, পাদটীকা।

পূর্ব রাজস্থানের ভূমি সম্বন্ধীয় ‘তকসিম” (১৬৪৯-১৭৬৭)

সত্যপ্রকাশ গুপ্তা

পূর্ব রাজস্থানের তকসিম[১] তথা মুবাজনা-ই দসসালা[২] লেখগুলি থেকে আমরা জানতে পারি ঐ পরগণা এবং কসবা ও গ্রামগুলির মোট মাপিত এলাকা, কৃষিযোগ্য এলাকা এবং কর্ষিত এলাকার উপর নির্ধারিত ও অনুমিত কর কত ছিল। এলাকাগুলি মুঘল সম্রাট কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত হয়েছিল জয়পুরের কছওয়াহা রাজাদের ‘তনখা জাগির’ হিসাবে। কয়েকটি পরগণা ছিল জয়পুরের সীমান্তবর্তী, এবং তার বাইরেও।[৩] উপরোক্ত লেখটি রাজস্থানী ভাষায় লিখিত এবং রাজস্থানে প্রত্নলেখ বিভাগ, বিকানীর-এ সংরক্ষিত। পরগণা স্তরের ‘তকসিম’ প্রস্তুত ও স্বাক্ষরিত হত কানুনগো কর্তৃক। প্রায়শই এটি দশ বছরের জন্য করা হত (দশসালা তকসিম), যদিও তদধিক মেয়াদের তকসিম-ও পাওয়া গেছে। সর্বাধিক মেয়াদেরটি ছিল ১৫ বছরের। সবচেয়ে পুরনো তকসিম-টি ১৬৪৯-৬৩ মেয়াদের (পরিশিষ্ট ১ক)।

মাপিত মোট এলাকার কৃষিযোগ্য জমি (লায়ক-উল জরায়ত), কর্ষিত জমি ও ‘নাবুদ’-এর আনুপাতিক বিন্যাসটিকে নিশ্চিতরূপে জানার জন্য লেখগুলি যথেষ্ট উপযোগী। মাপিত মোট এলাকার মধ্যে থাকত সেই জমিগুলিও যেগুলিতে কোনো কারণবশত চাষ করা যেত না (নাবুদ)[৪], এবং এ-জন্য অনুমিত হিসাবের বাইরে থাকত।

আমাদের লেখগুলিতে এলাকার মাপ দেওয়া আছে দফতরী বিঘায় (বিঘা-ই দফতরী) যেটি ইলাহী বিঘা-র (বিঘা-ই ইলাহী) দুইয়ের তিন ভাগ।[৫] এই অনুপাত আমরা লেখ থেকেই পাই। উদাহরণস্বরূপ, নিওয়াই পরগণার মাপিত মোট এলাকার বিবরণ এইভাবে দেওয়া হয়েছে :

	মোট এলাকা	
গ্রামের নাম	পাকা রশি (ইলাহী বিঘা)	কাঁচা রশি (দফতরী বিঘা)
ঠিকানা	২০০০	৩০০০
জগৎপুরা	১০০০	১৫০০

কাঁচা রশি ও পাকা রশির মাপ দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে ৭৫ হাত ও ৯৫ হাত। ক্ষেত্রফলের হিসাবে প্রথমটি দ্বিতীয়টির ৬২.৩ শতাংশের কাছাকাছি।[৬] দফতরী এবং এলাহী বিঘার ব্যবহারিক অনুপাতও প্রায় তাই।

প্রাপ্ত লেখাগুলি থেকে দেখা যায় মাপিত মোট এলাকার ১০-১৬ শতাংশ জমি কৃষিযোগ্য ছিল না। এর মধ্যে পড়ত বসতি, পাহাড়, নদী, নালা, জঙ্গল, বাগিচা,

সীর[৭], উষর, ডোবা ইত্যাদি। এলাকাগুলির প্রায়শই কমবেশি হতে দেখা যায়। সুতরাং এটা বলা অনুচিত হবে না যে, মাপিত মোট এলাকার মধ্যে কৃষিযোগ্য জমি, কৃষির অযোগ্য জমি এবং কৃষিযোগ্য কিন্তু অকর্ষিত (যেমন পতিত জমি যেগুলি ফসল বাড়ানোর জন্য কিছুকাল চাষ না করে ফেলে রাখা হত) জমিও পড়ত।

জমা নির্ধারণের জন্য মাপিত এলাকা ছিল মাপিত মোট এলাকার ৬০-৬৫ শতাংশ। বাকি জমি ছিল হয় পতিত নাহয় সীর, কিংবা ভালো কাজের পুরস্কার ও পুণ্যার্থে প্রদত্ত।

এ-সমস্তের ভিত্তিতে আমরা কয়েকটি পরগণার মাপিত এলাকার পরিসীমা 'আইন-ই আকবরী'তে বর্ণিত ঐ পরগণাগুলির পরিসীমার সাথে তুলনা করতে পারি। দ্বিতীয়টির সময়কাল ১৬শ শতাব্দীর শেষদিক। নিচের তালিকায় ঐ দুই পরিমাপ (দফতরী বিঘায়) দেওয়া হল:

পরগণার নাম	আইন	তকসিম	সাল
আতেলা ভাভরা	৩৭,৪৩৪	৬১,১৮০	১৬৪৯-৬৩
নরায়ণা	১,৩৩,৩০৭	৩,১৪,৩৭৮	১৭১১-২২
নিওয়াই	৫০,৮৯০	৩,০৫,৯৬৭	১৭৩২-৪১
হিণ্ডৌণ	৭,২৪,৩৯৫	৬,৯৯.৫২৭	১৭৩৩-৪২
উদই	৪,১১,১০০	৩,৮২,৫৪৩	১৭৩৪-৪৩
অমরসর	১,৭৪,৭১৩	৯৪,৭৭৬	১৭৫৮-৬৭

তালিকা থেকে এটা বোঝা যায় যে, ৬টি পরগণার ৩টিতে 'আইন'-কালীন মাপিত এলাকা 'তকসিম'-এর তুলনায় বেশি ছিল এবং অন্য ৩টিতে, কম। অবশ্য পরগণাগুলির সীমানা হামেশাই কমত বাড়ত এবং তার ফলে মাপিত মোট এলাকারও অদলবদল হয়ে যেত। লেখগুলি থেকে বিঘাপ্রতি 'জমা'-র বিষয়েও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায়। এই তালিকায় মোট জমা-কে কৃষিযোগ্য জমি (কর নির্ধারণের এলাকা)-র পরিমাণ দিয়ে ভাগ করা হয়েছে। তালিকাটিতে গিজগড় (১৭৩০-৪১) কসবা এবং তার কিছু গ্রাম ও পরগণা এবং হিণ্ডৌণ (১৭৩৩-৪২)[৮] এবং তার কিছু গ্রামকে বাছা হয়েছে।

সর্বাধিক অনুমিত জমা গিজগড়-এ বিঘাপ্রতি ২ টাকা ৭৯ পয়সা এবং ন্যূনতম ৮০ পয়সা ; আর হিণ্ডৌণ-এ যথাক্রমে ৩ টাকা ৩৯ পয়সা এবং ৪৩ পয়সা। এই তফাৎ অনেক কারণেই হয়ে থাকতে পারে—যেমন, দামের ওঠাপড়া, জমির শ্রেণী, সেচের যন্ত্রপাতি এবং কিছুদূর পর্যন্ত রাজনৈতিক উত্থানপতন। জমা নির্ধারণের পার্থক্যও দামের ওঠাপড়া থেকেই স্পষ্ট। অবশ্য—এগুলি ছাড়াও—ফসলের অনুৎকর্ষ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ইত্যাদি কারণও মনে রাখতে হবে। অনুমিত জমা-র উচ্চসীমা ১৭৩০-এর পরের বছরগুলিতে বিশেষভাবে চোখে পড়ে। এই বছরগুলিতে দামও চড়েছিল অনেক—যার আলোচনা

আমরা অন্যত্র করেছি।[১] 1740-এর পরে যেহেতু দাম পড়ে গিয়েছিল, সম্ভবতঃ সেইজন্যই বিঘাপ্রতি জমা-র মূল্যাঙ্কন কম হতে দেখা যায়।

তকসিম-এর এই পরিসংখ্যানগুলি থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে যে, অধিকাংশ জাগির পরগণাতে খরিফ-এর তুলনায় রবি ফসলের জমা বেশি নির্ধারিত হয়েছে। যদি তাই হয়, তাহলে কি এটা ভাবা যেতে পারে যে, ঐ এলাকাগুলিতে কৃষিতে বিনিয়োগ করার মতো পুঁজি যথেষ্ট ছিল? কারণ, রাজস্থানের ভৌগোলিক অবস্থান এমনই যে, পুঁজি বিনিয়োগ না-করে রবি ফসল ফলানো যায় না।

পরিশিষ্ট ১ক

মাপিত মোট এলাকার (টোটল মেজার্ড এরিয়া) বিঘটনের সূচী

জমির শ্রেণী	ক্ষেত্রফল	মোট ক্ষেত্রফলের শতাংশ
পরগণা আতেলা ভাভরা, সরকার আলওয়র, সুবা আকবরাবাদ (আগ্রা) (১৬৪৯-১৭৬৩)		
মোট এলাকা	৬১,১৮০	
কৃষিযোগ্য জমি	৩৯,৮০০	৭১.৩৯
কর নির্ধারিত হয়নি এমন জমি	২১,৩৮০	২৮.৬১
(সীর, পাহাড়, ঊষর, নদী ও নালা)		
পরগণা আতেলা ভাভরা, সরকার আলওয়র, সুবা আকবরাবাদ (আগ্রা) (১৬৯৬-১৭০৫)		
মোট এলাকা	৬১,১৮০	
কৃষিযোগ্য জমি	৩৯,৮০০	৭১.৩৯
কর নির্ধারিত হয়নি এমন জমি	২১,৩৮০	২৮.৬১
(পাহাড়, নদী ও পতিত)		

পরগণা লালসোট, সরকার এবং সুবা আকবরাবাদ (১৭১১-১৭২০)

মোট এলাকা	৩,৫০,০১১	
কৃষিযোগ্য জমি (প্রজাস্বত্ব এবং চাষযোগ্য পতিত জমিও এর মধ্যে ধরা হয়েছে)	৩,১৭,৮৬৪	৯০.৮১
বাস্তবিক কর্ষিত জমি	২,২৮,৮৭২	৭২.০০
পতিত জমি	৮৮,৯৯২	১৮.৮১
কর নির্ধারিত হয়নি এমন জমি (ঊষর, সীর)	২১,৭৭৭	৯.০৯

পরগণা নরায়ণা, সরকার আমীর, সুবা আজমীর (১৭১১-১৭২০)

মোট এলাকা	৩,১৪,৩৭৮	
কৃষিযোগ্য জমি	২,৮৫,৭২৪	৯০.৮৮
কর নির্ধারিত হয়নি এমন জমি (আবাদ জলাশয়, সীর, ঊষর, নালা ও পাহাড়)	২৮,৬৫৪	৯.১২

পরগণা গিজগড়, সরকার এবং সুবা আকবরাবাদ (১৭১৬-১৭২৫)

মোট এলাকা	৫০,৪৮৩	
কৃষিযোগ্য জমি	৪৪,৯৭২*	৮৯ ৯
কর নির্ধারিত হয়নি এমন জমি (বসতি, জঙ্গল, ঊষর, জলাশয়, নদী) এবং রাস্তা)	৫,৫১১	১০.০০

পরগণা নিওয়াই, সরকার রণথম্ভোর, সুবা আজমীর (১৭৩২-১৭৪১)

মোট এলাকা	৩,০৫,৯৬৭	
কৃষিযোগ্য জমি	২,৫৬,২৩৩	৮৩.৭৫
কর নির্ধারিত হয়নি এমন জমি (টিলা, খাল, নালা, বাগিচা)	৪৯,৭৩৪	১৬.০০

* আকবর তথা অওরঙজেব-এর ফরমান অনুসারে এর মধ্যে ৭০.০০ বিঘা 'মিলকী' জমি ধরা হয়েছে, বাকী বিঘা ৪৪৯০২।

পরগণা হিণ্ডৌণ, সরকার এবং সুবা আকবরাবাদ (আগ্রা)

মোট এলাকা	৬,৯৯,৫২৭	
কৃষিযোগ্য জমি	৪,৩২,৯৯৯	৬১.৮৯
কর নির্ধারিত হয়নি এমন জমি সীর, ঊষর	২.১৫.৪৫৮	
কসুর ইলাহী গজ	৫১,০৬৯	
মোট	২,৬৬,৫২৮	৩৮.১১

পরগণা উদই, সরকার এবং সুবা আকবরাবাদ (আগ্রা)

মোট এলাকা	৩,৮২,৫৪৩	
কৃষিযোগ্য জমি	৩,৩২,২০৪	৮৬.৮৫
কর নির্ধারিত হয়নি এমন জমি (বসতি, কূয়া, গাছ, নালা, গর্ত, ডোবা, নদী, পাহাড় ও রাস্তা)	৫০,৩৩৯	১৩.১৫

পরগণা অমরসর, সরকার নাগোর, সুবা আজমীর (১৭৫৮-১৭৬৭)

মোট এলাকা	১,০৭,৬৯৩	
কৃষিযোগ্য জমি	৯৪,৭৭৬	৮৯.৩০
কর নির্ধারিত হয়নি এমন জমি	১২,৯১৭	১০.৭০

পরিশিষ্ট ১খ

কসবা নিওয়াই (১৩৩২-১৭৪১)

মোট এলাকা	৩৪,৬০০	
ঊষর ইত্যাদি (টিলা, ডোবা, বাগিচা)	১১,২২০	৩২.৪৩
কৃষিযোগ্য জমি	২৩,৩৮০	৬৭.৫৭
উদিক ইনাম	৩,০০০	
বাড়দার চৌকায়াত	১,৩০০	
বাস্তবিক কর্ষিত তথা মূল্যাংকিত জমি	১৮,৩০০	৫৩.১২

কসবা হিণ্ডৌণ (১৭৩৩-১৭৪২)

মোট এলাকা	২৪,৫৭৬	
কর নির্ধারিত হয়নি এমন জমি	৯,৩০২	৩৭.৮৫
সীর, ঊষর	৭,৫০১	
কসুর ইলাহী গঞ্জ	১,৮০১	
কর্ষিত তথা মূল্যাংকিত জমি	১৫,২৭৪	৬২.১৫

কসবা উদই (১৭৩৪-১৭৪৩)

মোট এলাকা	১৭,৫৬০
নাবুদ (বসতি, জলাশয়, কূয়া, নালা, ঢিবি, রাস্তা, গাছ, সীর, ঊষর)	৫,০০০
অবশিষ্ট	১২,২৬০
অন্য গ্রামকে দেওয়া জমি	৪,০০০
বাকী	৮,২৬০

কসবা বসওয়া (১৭০৫-১৭১৩)

মোট এলাকা	৩,০৫,৯৬৭	
কৃষিযোগ্য জমি	২,৫৬,২৩৩	৮৩.৭৫
কর নির্ধারিত হয়নি এমন জমি (টিলা, খাল, নালা, বাগিচা)	৪৯,৭৩৪	১৬.২৫

কসবা গিজগড় (১৭১৬-১৭২৫)

মোট এলাকা	৬,১০১	
কৃষিযোগ্য এবং বাস্তবিক কর্ষিত জমি	৫,১০০	৮৩.৫৯
কর নির্ধারিত হয়নি এমন জমি (নাবুদ)	১,০০১	১৬.৪১

কসবা আতেলা ভাভরা (১৬৪৯-১৬৬৩)
তথা (১৬৯৬-১৭০৫)

মোট এলাকা	১২,০০০	
কৃষিযোগ্য জমি	৭,০০৭	৫৮.৩৩
কর নির্ধারিত হয়নি এমন জমি (সীর ইত্যাদি)	৫,০০০	৪১.৭৭

কসবা গিজগড় (১৭৩০-১৭৪১)

মোট এলাকা	৬,৫১১	
কর্ষিত জমি	৪,০৯০	৬২.৮০
অমূল্যাংকিত জমি	২,৪১১	৩৭.২০
ইনাম	১,৪১০	
বসতি, জঙ্গল, রাস্তা	১,০০১	

কসবা দৌসা, সরকার এবং সুবা আকবরাবাদ (১৭৩০-১৭৪১)

মোট এলাকা	১৩,২০০	
কৃষিযোগ্য জমি	১২,২০০	৯২.৪২
অমূল্যাংকিত জমি	৭,৮৬৭	৭.৫৮
নালা, খাল	১,০০০	
ইনাম	৬,৮৬৭	
বাস্তবিক কর্ষিত এবং মূল্যাংকিত জমি	৫,৩৩৪	

কসবা দৌসা (১৭০৯-১৭১৮)

মোট এলাকা	১৩,২০০	
অমূল্যাংকিত জমি	৭,৬৮১	৫৮.৭৮
নালা, খাল	১,০০০	
ইনাম	৬,৬৮১	
অবশিষ্ট	৫,৫২০	৪১.৮২
পতিত	১,০০০	১৮.১১
বাস্তবিত কর্ষিত এবং মূল্যাংকিত জমি	৪,৫০০	৮১.৮৯
খরিফ	৩,৮২০	
রবি	৭০০	

কসবা উদই (১৭৩৪-১৭৪৩)

কৃষিযোগ্য জমি	৮,২৬০	
বাড়দার	৬৭০	৮.২২
বাস্তবিক কর্ষিত তথা মূল্যাংকিত জমি	৭,৫৯০	৯১.৮৮

'কসবা লালসোট (১৭১১-১৭২০)

মোট এলাকা	১০,৪৪০	
নাবুদ	৩৩৬	৩.৩২
কৃষিযোগ্য জমি	১০,১০৪	৯৬.৭৮
পুণ্য	১,০৪৪	১০.০০
পতিত	২৬	
বাস্তবিক কর্ষিত তথা মূল্যাংকিত জমি	৯,০৩৩	৮৬.৪৮

টীকা

১. রাজস্থানী লেখগুলির মধ্যে তকসিম-কে গ্রাম, কসবা ও পরগণায় কর নির্ধারণ বা মূল্যাংকন ও ভূমি বন্টনের অর্থে নেওয়া হয়েছে। আরও দেখুন উইলসন : 'এ গ্লসারি অফ জুডিশিয়াল অ্যাণ্ড রেভিন্যু টার্মস্', পৃ. ৫০৩।

২. এই লেখগুলি থেকেও তকসিম-এর মতোই গ্রাম ও পরগণায় নির্ধারিত কর বা মূল্যাংকনের বিষয়ে জানা যায়। এগুলি বেশিরভাগই হত দশবছরী, কিন্তু ১২ বা ১৫ বছরেরও কখনো কখনো হতে দেখা যায়।

৩. পরিশিষ্ট ১ক, 'তকসিম' পরগণা আতেলা ভাভরা ১৬৪৯-৬৩।

৪. ইরফান হবিব : 'দি অ্যাগ্রারিয়ান সিস্টেম অফ মুঘল ইণ্ডিয়া', পৃ. ৫। রাজস্থানের 'তকসিম' লেখগুলিতে সেই জমিগুলিকে নাবুদ বলা হয়েছে যেগুলিতে জমা নির্ধারণ ও মূল্যাংকন করা হয়নি ; যেগুলিতে বসতি, কুয়া, গাছ, ডোবা, জলাশয়, রাস্তা (গ্রামে যাতায়াতের ছোটবড় রাস্তা ও আলপথ), নদী, পাহাড়, জঙ্গল ইত্যাদি আছে। এইগুলিতে চাষ করা যেত না। এর মধ্যে সেই জমিগুলি ধরা হয়নি যেগুলি দেবোত্তর অথবা বাড়দার বা চৌকায়ত (জমি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য) ইত্যাদিতে কিছু লোককে দান করা হত। জমিগুলি কৃষিযোগ্য ছিল, কিন্তু এগুলির উপর কর ধার্য হত না।

৫. ইরফান হবিব : প্রাগুক্ত, পরিশিষ্ট, পৃ. ৩৫৩-৬৩।

৬. 'তকসিম' পরগণা গিজগড় ১৭২৬ ; 'মুওয়াজনা দহসালা', পরগণা নিওয়াই ১৭৩৯ ; 'তকসিম' দহসালা' পরগণা উদই, সরকার এবং সুবা আকবরাবাদ (আগ্রা) ১৭৪৩।

৭. 'সীর' শব্দটি গ্রামের সেই জমিগুলির জন্য প্রযুক্ত হয়েছে যেগুলি গ্রামের জমিনদার (উত্তরাধিকার সূত্রে যিনি জমিটি পেয়েছেন) কর্তৃক কর্ষিত হত। এই চাষ তিনি স্বয়ং করাতেন, নিজের খরচে ও নিজের মজুরদের দিয়ে। বিনা ইজারা-র এই জমিগুলিতে কর ধার্য হত ন্যূনতর হারে, অথবা কোনও কর নেওয়া হত না যাতে ঐ জমিনদারদের নিষ্কর জমি বা জীবিকার জন্য কিছু দেওয়া যায়। (উইলসন : প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৫)

৮. পরগণা হিণ্ডৌণ-এ লেখক জমার অংককে কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ দিয়ে ভাগ করেছেন, যার মধ্যে পুণ্য 'উদিক' ও 'বাড়দার'-এর জমিও রয়েছে।

জমির পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় এই পরগণাতে অনুমিত জমা (বিঘাপ্রতি)-র ন্যূনতম হার অনেক কম দেখিয়েছে, বিশেষতঃ যখন কসবা গিজগড়-এর সঙ্গে এটিকে তুলনা করি।

৯. দামের বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন এস. পি. গুপ্তা ও শিরিন মুসওয়ি : 'ওয়েইটেড প্রাইস অ্যাণ্ড রেট ইণ্ডিসেস্ ইন ইস্টার্ন রাজস্থান' (১৬৫০-১৭৫০), ইণ্ডিয়ান ইকনমিক অ্যাণ্ড সোস্যাল হিস্টি রিভিউ, খণ্ড ১২, সংখ্যা ২ ; তুলনীয় এস. নুরুল হাসান ও এস. পি. গুপ্তা : 'প্রাইসেস্ অফ ফুড গ্রেইনস্ ইন দা টেরিটরিজ্ অফ আমীর' (১৬৫০-১৭৫০ নাগাদ), ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস (পাতিয়ালা, ১৯৬৮)।

সমীক্ষা

জে. এফ. রিচার্ডস : 'মুঘল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন গোলকুণ্ডা'

[অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, লণ্ডন (১৯৭৫),
xiv, ৩৫০ পৃষ্ঠা, মানচিত্র, টীকা, নির্বাচিত
গ্রন্থপঞ্জি ও অনুক্রমণিকা]

মুঘল আমলের বিশাল নথিসম্ভার সংরক্ষিত রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ ষ্টেট আর্কাইভ (হায়দরাবাদ) ও ইনায়ৎ জং কালেকশন-এ (ন্যাশনাল আর্কাইভ, দিল্লি), এবং মুঘল প্রশাসনের গবেষকরা বহুদিন পর্যন্ত এ-নিয়ে মাথা ঘামাননি। রিচার্ডস-ই প্রথম ঐ দলিলগুলির (বিশেষত ইনায়ৎ জং কালেকশন-এর) তথ্যাদি ঘেঁটে একটি আকর্ষক বিবরণী প্রকাশ করেন—১৬৮৭-তে অধিকৃত হওয়ার পর থেকে ১৭২৫-এ নিজাম-উল মুল্ক্ আসফ জাহ্-এর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত—পূর্বতন গোলকুণ্ডা রাজ্যের প্রশাসনিক সংগঠন সম্পর্কে।

রিচার্ডস-এর প্রয়াসটির বিশেষ গুরুত্ব এই যে, মুঘল অর্থব্যবস্থা, সৈন্য সংগঠন ও বেসামরিক প্রশাসন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার দরুন তিনি দেখাতে পেরেছেন অধিকৃত রাজ্যটিকে কত দ্রুত এবং কত বেশি পরিমাণে অন্যান্য মুঘল সুবাগুলির সমপর্যায়ভুক্ত করে ফেলা গিয়েছিল। তাঁর মতে, মুঘল প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছিল প্রথমত নিজস্ব ধাঁচের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করায়, এবং দ্বিতীয়তঃ জমিন্দারের প্রতিরূপী স্থানীয় ক্ষমতাবানদের (যারা সে-সময় উত্তর ভারতে যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল) সঙ্গে সক্রিয় কোনো বন্দোবস্ত স্থায়ীভাবে গড়ে তোলায়।

'খালিস' ও পয়বাকি জমির (যেগুলির রাজস্ব আরক্ষিত থাকত সম্রাটের জন্য, কিংবা সাময়িকভাবে গচ্ছিত থাকত—জাগিরদার পদে নিযুক্ত হতে পারেন এমন শাহী কর্মচারিদের কাছে) পরিমাণ সম্পর্কে চমকপ্রদ প্রমাণাদি খুঁজে পেয়েছেন রিচার্ডস ; এবং তিনি এ-কথা বলেছেন যে, আওরঙজেব-এর রাজত্বের *শেষদিকে জাগির-এর তত অভাব ছিল না, যত অভাব ছিল উচ্চ-রাজস্ব-উৎপাদক জাগির-এর।* তাঁর দেওয়া হিসাব থেকে দেখা যায় 'খালিস' ও 'জাগির' উভয়ের ক্ষেত্রেই হাসিল (যথার্থ আদায়)-এর পরিমাণ জমার (অনুমিত আয়) তুলনায় ক্রমহ্রাসমান।

ত্রিশের দশকে ভান ল্যুর-এর কাজ থেকে এমন ধারণা হয় যে, পর্তুগিজদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে এযাবৎ বাড়িয়ে বলা হয়েছে। মূলত ভান ল্যুর-এর মতে, যদি আমরা ইউরোপ-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করে এশিয়াকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বস্তু হিসাবে দেখি তাহলে পর্তুগিজদের ব্যাপারটার মতো ছোটখাট ব্যাপারগুলি এশিয়ার বিকাশধারার প্রশস্ততায় নিজের নিজের স্তর খুঁজে নেবে। ভান

ল্যের-ই প্রথম স্বীকার করেন যে, এমন একটি পরিপ্রেক্ষিত পাওয়া কঠিন কারণ ইউরোপীয় নিবন্ধীকরণের উপর নির্ভরশীল ইতিহাসবিদ্‌রা এশিয়াকে দেখেন—জাহাজের ডেক থেকে যেমন দূরের জিনিস দেখা হয়—সেই চোখে। ফারসি ও পর্তুগিজ দু'টি ভাষাই জানেন, আর মহাফেজখানাগুলিতে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন, এমন একজন গবেষক পিয়ার্সন-এর কাজ থেকেও ভান ল্যের-এর পর্তুগিজ-বিষয়ক তত্ত্বটি সমর্থিত হয়, এবং এই প্রথম পর্তুগিজদের প্রতি ভারতীয় মনোভাবের জাত ও জটিলতা সম্পর্কে একটা ধারণা আমরা পাই।

ঐ ভারতীয় মনোভাব নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করাই যেহেতু পিয়ার্সন-এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, গুজরাতকে গবেষণাক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেওয়াটা তাই ঠিকই হয়েছে। এখানে তিনি চূড়ান্ত ভরসা রাখতে পেরেছেন প্রামাণিক ফারসি ইতিহাসের উপর, পেয়েছেন সপ্তদশ শতাব্দীর ব্রিটিশ পরিসংখ্যানসমূহ, এবং অবশ্যই, গোয়ার মহাফেজখানাগুলি থেকে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যা তাঁর কাজকে যথার্থ গবেষণামূলক বৈশিষ্ট্য সমন্বিত করেছে। তাঁর বইটি তিনটি মুখ্য আলোচনার ভিত্তিতে রচিত। প্রথমে দেওয়া হয়েছে ১৬শ শতাব্দীর গুজরাত ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে স্থাপিত পর্তুগিজ ব্যবস্থার একটি বিচক্ষণ বিবরণ। তারপরে আছে গুজরাতি 'রাষ্ট্রে'র বিশ্লেষণ, এবং পর্তুগিজদের উপস্থিতি ও বলপ্রয়োগে তার প্রতিক্রিয়া। এইসঙ্গে গুজরাতি বণিকদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও আমরা জানতে পারি; গুজরাত-এর বণিক সম্প্রদায় ও রাষ্ট্রের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে একটি উৎকৃষ্ট আলোচনাও এই প্রসঙ্গে করা হয়েছে। অধ্যায়টি ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে লেখকের অনুচিন্তন, এবং এটি পড়ার পর পিয়ার্সন-কে—শুধুমাত্র একজন পুরাবিৎ ইতিহাসকার নয়—ভারতীয় বাস্তবতাকে বোঝার জন্য চিন্তার নতুন দ্বার উদ্ঘাটনে সচেষ্ট এক সমাজবিজ্ঞানী হিসেবেই স্বীকার করে নিতে হয়।

প্রাচ্যভূমিতে পর্তুগিজ দৌরাত্ম্যের প্রতিটি কৈফিয়ত নিয়েই সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলির মধ্য দিয়ে ১৫৩০ ও ৪০-এর দশকে গুজরাত-এর উপকূল বরাবর পর্তুগিজ হানার (যেগুলির কথা কম লোকে শুনেছে কিন্তু প্রচণ্ডতায় যেগুলি ছিল বিশাল) একটি মূল্যবান দলিল পাঠকের হাতে আসে। ইউরোপ-এর সঙ্গে পর্তুগিজদের নতুন বাণিজ্যের গুরুত্ব ন্যূনতার কথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে; ১৬শ শতাব্দীর শেষ নাগাদ ঐ বাণিজ্যের পরিমাণ গুজরাত-এর বার্ষিক বাণিজ্যের পাঁচ শতাংশের বেশি ছিল না, এবং সমুদ্রবাণিজ্যে নিয়োজিত গুজরাত-এর মোট পুঁজির 'সম্ভবত ৩ শতাংশ' ছিল ঐটির (পৃ. ৩৬, ১১৪)। পর্তুগিজরা গুজরাত-এর সমুদ্রবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, এবং তা থেকে কর আদায় করলেও, প্রতিদানে কিছু দেয়নি। "সব দিক বিবেচনা করে দেখলে," পিয়ার্সন বলেছেন, "পর্তুগিজ উপস্থিতির সপক্ষে বেশি কিছু বলা কঠিন" (পৃ. ১১৪)। অবশ্য তিনি ঐ উপস্থিতির স্তরবিভাজন করেছেন, এবং প্রবন্ধটির গুরুত্বপূর্ণ অবদানগুলির একটি হল পর্তুগিজ ব্যক্তিগত ব্যবসার

প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। যদিও এটি এমন একটি বিষয় যার সপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া যায় না, কিন্তু পিয়ার্স'ন আমাদের এমন একটি জগৎ সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন (যা বেসরকারি তো বটেই, হয়ত কোনকোনও ক্ষেত্রে সরকারবিরোধীও) যেখানে পর্তুগিজ ও ভারতীয়রা সমানে-সমানে মিলেমিশে গেছে।

বিশ্লেষণটি যথার্থ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে যখন পিয়ার্স'ন ভারতীয় 'রাষ্ট্রে'র সর্বেক্ষণে হাত দেন, সীমান্তে পর্তুগিজ উপস্থিতির ফলে যা আলোড়িত হয়েছিল। 'প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্রে'র একশিলা ধাঁচেই বিভিন্ন প্রশাসন-স্তর গড়ে উঠেছিল ; ১৬শ শতাব্দীর গুজরাতি অভিজাত সম্প্রদায়ের আগ্রহ ছিল সমুদ্র এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলে ; আর সুলতান ও তাঁর অধিকাংশ পার্ষদের দৃষ্টি ছিল দিল্লির দিকে এবং চিন্তা, মহাদেশীয় পরিসরে। মলিক আয়াজ, মলিক গোপী এবং খ্‌ওয়াজা সফর-এর মতো ব্যক্তিবর্গ—যাঁরা দিউ এবং সুরাত-এর মতো বন্দরনগরীর শাসক ছিলেন—তাঁদের সমমর্যাদার ব্যক্তিদের সমুদ্র সম্পর্কে আগ্রহী করতে পারেননি। পিয়ার্স'ন-এর অসাধারণত্ব চোখে পড়ে যেখানে তিনি পর্তুগিজ কবল থেকে সুরাত মুক্ত করার জন্য মহম্মদ কুলিজ্ খান-এর প্রচেষ্টার (১৫৮০-র দশকে) কথা লিখেছেন। এবং, তর্কসাপেক্ষে, বইয়ের সর্বোত্তম অংশটি হল মলিক আয়াজ-এর কর্মজীবনের পুনর্মূল্যায়ন, যিনি ছিলেন ১৫শ শতাব্দীর শেষে দিউ-র সমৃদ্ধিশীলতার মূল স্থপতি।

রাষ্ট্রের বিবরণের মতোই—অতটা সফল না হলেও গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ হয়েছে গুজরাতি বণিক সম্প্রদায়ের। প্রাথমিক এক দফা উদ্দীপিত প্রতিরোধের পরে গুজরাতি বণিকরা পর্তুগিজ বিধান স্বীকার করে নেন। পিয়ার্স'ন-এর মতে ঐ স্বীকৃতি পুরোপুরি অনৈচ্ছিক ছিল না। ১৬শ শতাব্দীর শেষ নাগাদ ভারতীয় বণিক ও পর্তুগিজ-দের মধ্যে পারস্পরিক সুবিধা ও সহযোগিতার একটি কাঠামো গড়ে তোলা হয়। সারস্বত ব্রাহ্মণ ও গুজরাতি বেনিয়ারা পর্তুগিজ পৃষ্ঠপোষকতায় গোয়া ও দিউ-কে সমৃদ্ধ করে তোলে, এবং অন্যদিকে, ক্যাম্বে লাভবান হয় ঐ শহরে 'প্রায় একশোটি পর্তুগিজ পরিবারে'র বসতিস্থাপন হওয়ায়। ভারতীয় জাহাজগুলি থেকে পর্তুগালের বন্দরে-বন্দরে আদায়কৃত রাজস্বের উপরেই নির্ভরশীল ছিল পর্তুগিজ উপকূল-সাম্রাজ্য। পর্তুগিজ কর্মচারী-রা ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যের মাধ্যমে, এবং বেনিয়া-দের সঙ্গে অংশীদারি করে, জীবিকা অর্জন করত। চার্লস বক্সার তাঁর 'পর্তু' গ্রন্থে এই মতপ্রকাশ করেছেন যে, শাসকশ্রেণীর রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রগুলি বাস্তবিকই ছিল রুগ্ন ও সংকীর্ণ—একেক সুবা-তে একেকভাবে সেটা বহিঃপ্রকট হত—যেমন, গোলকুণ্ডা-য় 'জাগির' থেকে আদায় কমে যাওয়া, কিংবা আওরঙ্গাবাদ-এ পয়বাকির অনটনের মধ্য দিয়ে (পৃঃ ২০১ দেখুন)। তবে, রিচার্ডস-এর এই বিবৃতিটি মেনে নেওয়া কঠিন যে, "মনসবদার-রা এমনিতেই পারতেন

নিয়োগাদেশ অস্বীকার করতে" (পৃ. ২০২)। অনুৎপাদী জাগির-এর বিরুদ্ধে আবেদন করার অধিকার মনসবদারদের ছিল, কিন্তু কোনভাবেই তাঁরা পারতেন না একটি 'জাগির' প্রত্যাখ্যান করতে—যদি না তাঁরা চাইতেন যে, একটিও জাগির তাঁদের না থাকুক।

যদিও এটা রিচার্ড'স-এর কৃতিত্ব যে, ফারসি পাণ্ডুলিপির ব্যাপক ব্যবহার তিনি করতে পেরেছেন, তবুও, তাঁর ব্যাখ্যাগুলি সব জায়গায় প্রশ্নাতীত নয়। উদাহরণস্বরূপ, পৃ. ২০৩-এ তিনি 'অহদি' শব্দটিকে নিয়েছেন সম্রাটের ব্যক্তিগত ঘোড়সওয়ার ('সদ্বংশীয় অশ্বারোহী')—এই বিশিষ্ট অর্থে, যদিও প্রসঙ্গবর্ণনা থেকে মনে হয় শব্দটিকে প্রচলিত অর্থ 'যে-কেউ' হিসেবে নিলেই ভালো হত।

কখনো কখনো রিচার্ড'স-এর রাজনৈতিক ইতিহাসজ্ঞানের ঘাটতি চোখে পড়েঃ যেমন, পৃ. ৩৬-এ বলা হয়েছে (১৬৩৬-এর বন্দোবস্ত প্রসঙ্গে) যে, "পরবর্তী চল্লিশ বছর (১৬৩৬-৭৬) ধরে এই অপ্রতিহত বন্দোবস্তের দরুণই বহুলাংশে সম্ভব হয়েছিল বিজাপুর, গোলকুণ্ডা এবং দাক্ষিণাত্যের মুঘল সুবাগুলির শান্তি ও সমৃদ্ধি।" বস্তুতঃ, বন্দোবস্তুটির আয়ুষ্কাল ছিল খুব বেশি হলে কুড়ি বছর। ১৬৫৬-তে মুঘলরা গোলকুণ্ডায় হানা দেয় এবং পরের বছরেই, বিজাপুরে।

বইটির আদ্যাংশে 'তেলুগু সমাজ' সম্পর্কে যে-বর্ণনা রিচার্ড'স দিয়েছেন সেটাকে আরো উৎকৃষ্ট করা যেত বলে আমার মনে হয়েছে। গোলকুণ্ডা রাজ্যের প্রশাসন সম্পর্কেও তাঁর বর্ণনা অনেক ক্ষেত্রেই তথ্যাদির প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণরহিত। এতৎসত্ত্বেও সারসংক্ষিপ্ত বিবরণ হিসেবে এটি যথেষ্ট মূল্যবান। ১৬৮৭-র পরবর্তী ঘটনাবলী সম্পর্কেই প্রধানত আগ্রহী---এমন পাঠকের জন্য বিবরণটি পর্যাপ্ত হওয়ারই কথা।

একটি লঘু অনুযোগ (যদিও অযৌক্তিক—অন্তত আমার দিক থেকে—কারণ, এই ব্যাপারটিতে নিজেরও দুর্বলতা সম্পর্কে আমি সচেতন) রয়েছে লিপ্যন্তরের অসমরূপতা নিয়ে। যেমন, Qasim-কে লেখা হয়েছে Kasim, কিন্তু qanungo-তে এই বদলটা করা হয়নি। এইরকম 'ain এবং hamza শব্দদুটিকে একইভাবে মহাপ্রাণ (') যুক্ত করে দেখানো হয়েছে। অন্যান্য উচ্চারণভেদক চিহ্ন আদৌ ব্যবহৃত হয়নি, কিন্তু এই গাফিলতির দায় লেখকের চেয়ে মুদ্রাকরেরই বেশি বলে মনে হয়।

বইটির গ্রন্থপঞ্জি বেশ ভালো, অনুক্রমণিকাটিও পর্যাপ্ত। মানচিত্রগুলি সবিশদ না হলেও নির্ভুল। সব মিলিয়ে, রিচার্ড'স-এর কাজটি মুঘল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাসে এক মূল্যবান সংযোজন। এটি দেখিয়ে দেয়—অন্যান্য মুঘল সুবাগুলির একেকটির উপর এই ধরণের একেকটি বিভাগীয় প্রবন্ধ থাকলে—তা কত কাজের হতে পারত। আরেকটি প্রয়াস এ-পর্যন্ত দেখা গেছে—এস. এন. সিন্‌হা : 'সুবা অফ এলাহাবাদ আণ্ডার দ্য গ্রেট মুঘলস্ ১৫৮০-১৭০৭' (নিউ দিল্লি, জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, ১৯৭৪) যদিও কাজটিতে

সেই ধরণের প্রশ্নগুলি আলোচিত হয়নি যা রিচার্ডস এবং ভারতের আরও অনেক ইতিহাসকারকে ভাবিয়ে তুলেছিল।

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস বইটির দাম বেশিই করেছেন—ভারতীয় মুদ্রায় ২০০ টাকার মতো। অর্থাৎ ভারতীয় গবেষকদের এ-বইটি পড়তে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে গিয়ে।

এম আতহার আলি

এম. এন. পিয়ার্সন : 'মার্চেন্টস্ অ্যাণ্ড রুলারস্ ইন গুজরাট; দ্য রেসপন্স টু দ্য পর্তুগিজ ইন সিক্সটিন্থ সেঞ্চুরি'

(বার্কলে, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, ১৯৭৬, পৃ. xii ; ১৭৮, মানচিত্র ২, দামের উল্লেখ নেই)

১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীর তথ্যসম্ভারের দিক থেকে গুজরাত রীতিমত সমৃদ্ধ। এগুলির অধিকাংশই লেখা—গুজরাতি ছাড়াও—ফারসি, পর্তুগিজ, ডাচ ও ইংরাজিতে। প্রদেশটি, কাজেই, নজর কেড়েছিল মুঘল ও প্রাক্-মুঘল ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহী গবেষকদের। পর্তুগিজ তথ্যাদির অবশ্য পর্যাপ্ত ব্যবহার করা হয়নি। ঐ সামগ্রী থেকে আহৃত তথ্য উপস্থাপন বা ব্যবহার ক'রে রচিত যে কোনো কাজই—অতএব, একান্ত কাম্য। যেমন আলোচ্য রচনাটি।

গুজরাতের বাণিজ্য প্রসঙ্গে পিয়ার্সন যে-চিত্র তুলে ধরেছেন তা মোটামুটি এইরকম : ১৫শ শতাব্দীতে গুজরাতি ও আরব বণিকরা গুজরাতের বন্দরগুলিতে ও লোহিত সাগরে এবং মশলা-দ্বীপগুলির সঙ্গে মোটামুটি শান্তিপূর্ণ বাণিজ্য চালাত। ঐ শতকের শেষ দিকে পর্তুগিজরা এল 'আধা ধার্মিক, আধা-আর্থিক' উদ্দেশ্য নিয়ে, বাণিজ্যে 'একাধিকার বা নিয়ন্ত্রণ ও কর' আরোপ করার লক্ষ্যে। বস্তুত তারা 'সাফল্যের খুব কাছে' পৌঁছে গিয়েছিল। পর্তুগিজ বাণিজ্যের প্রভাব সম্পর্কে পিয়ার্সন-এর দৃষ্টিকোণ মূলত বক্সার-এরই অনুসারী, যাঁর মতে পর্তুগিজ উপস্থিতির ফলে সমুদ্রবাণিজ্যের পরিমাণ খুব বেশি বাড়েনি এবং ভারতীয় বণিকদের সঙ্গে পর্তুগিজদের সম্পর্ক মোটের উপর বৈরীমূলক ছিল না। পিয়ার্সন-এর মতে গুজরাতের বণিকরা তাদের শাসকগণের সাহায্যে পর্তুগিজদের হটিয়ে দিতে পারত, কিন্তু তার সামান্য প্রাথমিক প্রতিরোধের পর আত্মসমর্পণ করেছিল। অন্যদিকে শাসকরা—গুজরাতের

সুলতান অথবা মুঘল যে-ই হোক না কেন—ঐ ব্যাপারে উদাসীন থেকেছিল, এবং কোনোরকম উদ্বেগ বা অসন্তুষ্টি ছাড়াই পর্তুগিজদের অনুমতি দিয়েছিল বণিক প্রজাদের কাছ থেকে শাসকদের প্রাপ্যাংশে ভাগ বসাতে।

বইটিতে পিয়ার্সন-এর মুখ্য প্রয়াস হয়েছে ঐ উপপত্তিটিকে তথ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা, এবং অতঃপর পর্তুগিজ আক্রমণের এহেন মোকাবিলার কারণগুলি খুঁজে বার করা।

শাসকদের উদাসীনতার প্রধান কারণগুলি পিয়ার্সন-এর মতে এইরকম : (১) কৃষিজ উৎপাদনের তুলনায় সমুদ্রবাণিজ্য অনেক বেশি লাভজনক হওয়া সত্ত্বেও গুজরাতের মোট রাজস্বের মাত্র ৬ শতাংশ আসত বণিকদের থেকে ; (২) 'জাগির' হিসাবে নির্ধারিত হওয়ার দরুণ কৃষিজমির গুরুত্ব ছিল বন্দর কিংবা বাণিজ্যের তুলনায় বেশি ; (৩) পর্তুগিজ ব্যবস্থা 'ততটা গুরুভার' ছিল না কারণ, বন্দরগুলি থেকে কর আদায়টা তাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, লোহিত সাগরের বাণিজ্য বন্ধ করে দিয়ে তা থেকে ফায়দা ওঠানোর চেয়ে ; (৪) তখনকার সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামো এমন ছিল যে, বণিকরা শাসকদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকেই কারবার চালাতে পারত। পিয়ার্সন-এর মতে গুজরাতের সমাজ বিভক্ত ছিল বহুবিধ 'অনুভূমিক' ও 'উল্লম্ব' স্তরে, যে-স্তরগুলি ছিল নিজ নিজ রীতিনীতি ও নেতার অধীনে স্বয়ংশাসিত।

জরুরি যে-প্রশ্নটি পিয়ার্সন সরাসরি তোলেননি—যার উত্তরটিই যথেষ্ট ব্যাখ্যাপ্রদ হতে পারত—তা হল : ধরা যাক, শাসকরা আন্তরিকভাবেই চেয়েছিল তাদের বণিক-প্রজাদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু সত্যিই কি সে-ক্ষমতা তাদের ছিল? পর্তুগিজদের আটকাতে হলে তাদের থাকা দরকার ছিল এক সুসংবদ্ধ নৌবাহিনী যা পোত, কামান ও নাবিক—সবকটি দিক থেকেই পর্তুগিজদের তুলনায় উন্নততর। সমকালীন ইউরোপীয় ও ভারতীয় প্রযুক্তির আপেক্ষিক স্তরবিচারের ভিত্তিতে বলাই চলে যে, ঐ ধরনের উন্নততর নৌবাহিনী থাকাটা বাস্তবিকই সম্ভব ছিল না। যদি তা-ই হয় সেক্ষেত্রে, নৌ-যুদ্ধে সন্মুখ প্রতিরোধ গড়ে তোলার কোনো সুযোগই তাদের হাতে ছিল না, পরিস্থিতির অন্যান্য দিকগুলি যা-ই নির্দেশ করুক না কেন।

বাণিজ্যের প্রতি সুলতানদের উত্থাপিত উদাসীনতার কারণগুলিকে যুক্তিনির্ভর করার জন্য পিয়ার্সন-এর প্রতর্কগুলি সম্পর্কে সন্দেহ থেকেই যায়। বাণিজ্যের আপেক্ষিক অর্থকরিতার যে হিসাব তিনি করেছেন তার ভিত্তিটাই অপ্রমাণ্য। কারণ, তিনি মূলত নির্ভর করেছেন 'মীরৎ-ই-অহমদী' (১৭৬১-তে রচিত)-তে প্রদত্ত আংশিক হিসাবের উপর, কিন্তু 'মীরৎ'-এ—হিসাবগুলি ১৫৭১-র বলে উল্লেখ করা হলেও—প্রামাণ্য কোনো উৎসের কথা বলা হয়নি, এবং পিয়ার্সন নিজে এমন কোনো কারণ দেখাননি যাতে ঐ হিসাবগুলিকে প্রামাণ্য বলে ধরে নেওয়া যায়।

১৬শ শতাব্দীর সর্বাধিক বিশ্বাসযোগ্য পরিসংখ্যানটি পাওয়া যায় ১৫৯৫-এ সম্পাদিত আবুল ফজল-এর 'আইন-ই-আকবরী'-তে।

এটির থেকেই পিয়ার্সন উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, বন্দর থেকে আদায়যোগ্য কর ছিল ৮০,০০০ টাকার, কিন্তু শেষমেশ ঐ পরিমাণটিকে কমসম বলে বাতিল করেছেন। ঐ হিসাব তিনি ঠিক কিসের ভিত্তিতে করেছিলেন তার কোনো ইঙ্গিত দেননি। সোরঠ বা সৌরাষ্ট্রের ১৩টি বন্দর থেকে রাজস্ব আদায় ছিল অনেক বেশি (১৬২,৬২৮ মহ্‌মুদি = ৬,৫০৫০ টাকা)। ক্যাম্বে, ঘোঘা (ব্লকম্যান সম্পাদিত বইটির পরিসংখ্যান-সারণিতে 'বন্দর ঘোঘা'-কে ভুলক্রমে 'বন্দর সোলা' বলা হয়েছে) এবং গান্ধার ইত্যাদি বন্দরগুলি যে-সমস্ত 'মহল'-এর অন্তর্গত ছিল সেগুলির 'জমা'-র হিসাব পৃথক পৃথকভাবে 'আইন-ই-আকবরী'-তে দেওয়া হয়েছে। যদি এর সবটাই বহিঃশুল্ক থেকে আসত বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলেও গুজরাতের মোট বন্দর রাজস্ব (১৫৯৫-এ) ৮০,০০০ টাকার বেশি হতে পারে না—পিয়ার্সন অনুমিত ৪০,০০,০০০ টাকার চেয়ে যা অনেক কম।

তবে, বন্দরে যে-পরিমাণ করই আদায় হোক না কেন, তা বাণিজ্যের মূল্যসূচক হতে পারে না কারণ, আমদানিদ্রব্যের কর বন্দরে আদায় করা হলেও রপ্তানিদ্রব্যের উপর কর বসত মূল বাজারেই।

বাণিজ্য থেকে আগত রাজস্বের সঠিক পরিমাণটি জানা গেলেও 'বাণিজ্যের মূল্য' বা পুঁজির আবর্তন, কার্যতঃ, কৃষিজ উৎপন্নের মূল্যের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না। বাণিজ্যহেতু 'সংযোজিত' মূল্যের (অর্থাৎ, উদাহরণস্বরূপ, পরিবহণের ব্যয় এবং বণিকের মুনাফা) সঙ্গেই কেবলমাত্র ঐ তুলনা চলতে পারে—কৃষি ও বাণিজ্যের তুলনামূলক অর্থনৈতিক গুরুত্ববিচারের জন্য।

আরেকটা কথাও মনে রাখতে হবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রভাব ভূমি-রাজস্বেও পড়েছিল। মুঘল রাজস্ব-ব্যবস্থায় তুলা, আফিম, নীল ইত্যাদি ফসলের স্থান ছিল উঁচুর দিকে, এবং নির্ভর করত দূরদেশীয় বাজারে এগুলির চাহিদার উপর। এটা সুতরাং বোঝা যায় না, কেন ভূমি-রাজস্বে সুলতানদের অত্যধিক আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বাণিজ্য এর অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

গুজরাতের সমাজ সম্পর্কে পিয়ার্সন-এর অধ্যয়ন আমাদের বর্তমান জ্ঞানে বিশেষ কিছু সংযোজন করে না। পর্তুগিজ নথিপত্রের ব্যবহার হয়েছে যৎসামান্য। শেষ দুটি অধ্যায় পুরোটাই লেখা হয়েছে এযাবৎ সুবিদিত ফারসি নথিপত্র এবং হালের কাজগুলিকে ভিত্তি করে। ফারসি নথিপত্রের অনুবাদের উপরই পিয়ার্সন নির্ভর করেছেন, যেগুলির বেশ কয়েকটিই নির্ভরযোগ্য নয়।

প্রসঙ্গত পৃ. ৭০-এ প্রদত্ত একটি বিবৃতির কথা ধরা যেতে পারে। এতে বলা হয়েছে : 'ভারত থেকে লোহিত সাগরগামী মশলার জাহাজে পর্তুগিজ

আক্রমণের ফলে মামলক ঈজিপ্ট-এর রাজস্ব গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল... ।' ঐ দাবির সপক্ষে কোনো প্রমাণ দেওয়া হয়নি।

উপরোক্ত সমালোচনাগুলি সত্ত্বেও, পিয়ার্স'ন-এর বইটি কিছু সার্থক প্রশ্ন তুলে ধরেছে ; এবং যদি তাঁর তথ্যাদি বা উত্তরগুলি আমাদের সন্তুষ্ট করতে না পারে তবে হয়ত আমাদের অবগতির বর্তমান হালই সেজন্য দায়ী।

বইটির ছাপা সুন্দর। মানচিত্র দুটি তথ্যবহ. এবং গ্রন্থপঞ্জিটি বিশদ।

শিরিন মুসওয়ি

মনোহর সিংহ রাণাওয়ৎ ঃ শাহ্‌জাহান-এর হিন্দু মনসবদার

(হিন্দি সাহিত্য মন্দির, যোধপুর, পৃ. ১২৬)

মহারাজা কুমার রঘুবীরসিংহ-এর বিবেচনায় মনোহর সিংহ রাণাওয়ৎ রচিত 'শাহ্‌জাহান-এর হিন্দু মনসবদার' গ্রন্থটিতে প্রদত্ত সূচিগুলি ইতিহাস পাঠকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। লাহৌরি-কৃত 'পাদশাহনামা', ওয়ারিস-কৃত 'পাদশাহনামা' ও কম্বু-কৃত 'আমল-ই সালেহ'-তে শাহ্‌জাহান-এর অন্তিম বছরগুলিতে পদস্থ মনসবদার-দের সূচি এবং তাছাড়া ঐসব গ্রন্থে বর্ণিত হয়নি এমন মনসবদার-দের বিবরণ অন্যত্র থেকে নিয়ে-ইতিহাস শিক্ষার্থীর জ্ঞান আহরণের জন্য একত্র করা হয়েছে। এছাড়া, রাণাওয়ৎ-এর অন্যান্য গ্রন্থের সাহায্যে প্রস্তুত আমিরবর্গে'র পরিচিতিটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ-থেকে লেখকের অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া যায় এবং এটা জানা সহজ হয় যে, ব্যক্তি (আমির) বিশেষ কার কার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতেন অর্থাৎ তিনি মারাঠা না রাজপুত, ক্ষত্রিয় না ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং যদি রাজপুত হন তো কোন্ উপজাতির ছিলেন।

আরো ভালো হত যদি লেখক ৫00-র অনধিক জাঠ আছে এমন মনসবদারদেরও সূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতেন, যাঁদের বর্ণনা আছে হায়দরাবাদের 'অর্জ-ও চেহরা', রাজস্থানের রাজ্য সংগ্রহশালা, বিকানীরের 'ফরমান' ও 'নিশান', শেখ ফরিদ চক্করি-র 'জখিরাৎ-উল খানিন', কেবলরাম-এর 'তজকিরাৎ-উল বমরা', 'আদব-ই আলমগিরী' ও 'ফ্যাক্টরি রেকর্ড'স্' এবং জালাল তবাৎবাই-এর 'বাদশাহনামা'-তে। যদি লেখক সূচিগুলির ভিত্তিতে বিভিন্ন বর্গে'র ক্ষমতার একটা হিসাব কষতেন তবে তা থেকে জানা যেত কোন্ জাতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল, এবং কেন। উদাহরণস্বরূপ, সূচি থেকে জানা যায় শাহ্‌জাহান বড় বড় মনসব দিয়েছিলেন বিঠ্‌ঠলদাস পরিবারকে। কেন? এর জবাবে বলা

যায় যে, বিঠ্ঠলদাস উত্তরাধিকারের বিবাদে খুরম-এর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, এবং তাঁকে সেজন্য পুরস্কৃত করা হয়েছিল। এইরকম দেখা দরকার অন্য কোন্ আত্মীয়দের মনসব বাড়ানো বা কমানো হয়েছিল। তার কারণই বা কী ছিল?

আলোচ্য গ্রন্থটির গুরুত্ব অত্যধিক বেড়ে যায় এই কারণে যে, লেখক এমন কিছু মনসবদারকে তাঁর সূচিতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন যাঁদের বর্ণনা উপরোক্ত তথ্যগুলিতে মেলে না। উদাহরণস্বরূপ 'হুকুমৎ রী ওয়হি'-র ভিত্তিতে লেখক এমন কিছু মনসবদার-এর সূচি দিয়েছেন যাঁদের উল্লেখ 'পাদশাহনামা'-তে নেই। কিন্তু লেখক ঐ মনসবদার-দের মনসবদারির কাল করেননি। ফলে পাঠককে দ্বিধায় পড়তে হয়—কোন্ বছরের সূচিতে ঐ মনসবদারদের অন্তর্ভুক্ত করবেন—এই নিয়ে।

সর্ববিদিত তথ্য এই যে, মুঘল আমলে বিভিন্ন জাতের মধ্যে আমির পদ বণ্টিত হয়েছিল। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থটি অধ্যয়ন করলে এ-কথাই মনে হয় যে, শাহ্জাহান-এর আমির-রা কেবলমাত্র দুটি জাত থেকেই আসতেন—মুসলমান এবং হিন্দু।

আলোচ্য গ্রন্থটির সূত্রাধার গ্রন্থসূচি ত্রুটিযুক্ত। পাঠক এটা জানতে পারেন না কোন্ গ্রন্থের কোন্ সংস্করণটির উল্লেখিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি-তে সংরক্ষিত 'পাদশাহনামা'-য় প্রদত্ত মনসবদারদের সূচি রাণাওয়ৎ কর্তৃক উপস্থাপিত ওয়ারিস-এর সূচি থেকে পৃথক, যেমন কিছু মনসবদার—রাজা দেবীদাস বুন্দেল ২০০০/২০০০, শ্যাম সিংহের পুত্র করমসিংহ রাঠোর ১৫০০/৬০০, ভোজরাজ খঙ্গর ১০০০/৫০০, হম্মীর রায় ৫০০/৪০০—প্রমুখের নাম রাণাওয়ৎ কর্তৃক উপস্থাপিত ওয়ারিস-এর সূচিতে নেই। অপরপক্ষে, কিছু মনসবদার—যেমন রায় রায়সিংহ শিশোদিয়া ৫০০০/২৫০০, রাজা পাহাড় সিংহ বুন্দেলা ৪০০০/৩০০০—প্রমুখের বর্ণনা ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত সংস্করণটিতে মেলে না।

ছাপা চমৎকার, কিন্তু কোথাও কোথাও মুদ্রণপ্রমাদ চোখে পড়ে যা শুদ্ধিপত্রে দেওয়া হয়নি।

এ-সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও হিন্দিভাষী ইতিহাস শিক্ষার্থীদের জন্য গ্রন্থটি যথেষ্ট জ্ঞানগর্ভ ও উপযোগী হবে বলেই মনে হয়।

সুনীতা বুধওয়ার

নফিস অহ্‌মদ সিদ্দিকিঃ পপুলেশন জিওগ্রাফি অফ মুস্লিমস্ ইন ইণ্ডিয়া

(এস চাঁদ এ্যাণ্ড কোং, ১৯৭৬, পৃ. xii+১৮৯, ৩০ টাকা)

পরিচ্ছন্ন এই প্রবন্ধটিতে নফিস অহ্‌মদ সিদ্দিকি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ১৯৭১-এর আদমশুমারি থেকে ভারতে মুসলমান জনসংখ্যার ভাগবণ্টন সম্পর্কিত তথ্যাদি নিয়ে। স্বাধীনতার পর থেকে জনপরিসংখ্যানগত পরিবর্তন-গুলির কৌতূহলোদ্দীপক কয়েকটি সংলক্ষণও তিনি তুলে ধরেছেন। ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদের একটি সর্বভারতীয় জনগোষ্ঠী হয়ে ওঠার সহায়ক প্রক্রিয়াটির উপযুক্ত ব্যাখ্যাসন্ধানী গবেষকরা এতদিন পর্যন্ত যে স্বতঃসিদ্ধগুলি থেকে শুরু করতেন, নফিস অহ্‌মদ-এর বিশ্লেষণ সেগুলির বেশ কয়েকটিকে আমূল পাল্টে দেয়। তিনি অনেকাংশে এই মতটি খণ্ডন করতে সফল হয়েছেন যে, ভারতীয় মুসলমানদের অপেক্ষাকৃত দ্রুতহারে বংশবৃদ্ধির পিছনে 'বিশেষ' কোনও কারণ ছিল। উদাহরণস্বরূপ তিনি দেখিয়েছেন যে, ১৯৬১-৭১ পর্যায়ে মুসলমানদের সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বেড়েছিল কেবলমাত্র সেই এলাকাগুলিতেই যেখানে তারা সংখ্যায় ছিল নগণ্য, অথবা সংশ্লিষ্ট জেলাটির মোট জনসংখ্যার তুলনায় নিতান্তই কম। যে-সমস্ত জেলায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল (১৯৬১-তে) সেখানে তাদের বংশবৃদ্ধির হার ছিল নিজেদের তো বটেই, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরও গড় হারের চেয়ে অনেক কম। তাঁর বিশ্লেষণ থেকে এটা বেরিয়ে আসে যে, বৃহৎ জনগোষ্ঠীগুলির—হিন্দু বা মুসলমানদের—বৃদ্ধিহার খুব বেশি ছিল না; ক্ষুদ্রতর জনগোষ্ঠীগুলির অল্প সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটলেই আনুপাতিক হার গণনায় তা অস্বাভাবিক দাঁড়িয়ে যেত। অতএব কোনো কোনো জনসংখ্যাবিদ যেভাবে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অনগ্রসরতার যুক্তি দিয়ে 'মুসলমান নারীদের উচ্চহার উর্বরতা'র ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করেন (কিংসলে ডেভিসঃ 'দ্য পপুলেশন অফ ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড পাকিস্তান, প্রিন্সটন,) তা টেঁকে না।

মুসলমানদের গ্রাম-শহর জনসংখ্যাবিন্যাস সম্পর্কে নফিস অহ্‌মদ-এর সিদ্ধান্তটিও সমান আগ্রহজনক। মুসলমানরা যে প্রধানত ছিল শহরভিত্তিক জনগোষ্ঠী—কয়েকজন বিশ্লেষক এই সিদ্ধান্তে (ছোট শহর ও পৌর কেন্দ্রগুলিতে মুসলমান যথেষ্টসংখ্যক থাকার ভিত্তিতে) পৌঁছলেও নফিস অহ্‌মদ এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি হাজির করেছেন যে, এ রকম সংস্থিতি ছিল কেবলমাত্র সেই অঞ্চলগুলিতে যেখানে মুসলমানরা সংখ্যালঘু ছিল। যে-সমস্ত জেলায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, বা জনসংখ্যার একটা বৃহদংশ ছিল, সেখানে

তারা ছিল গ্রামবাসী। উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় ৯৮.৮ শতাংশ, মালদায় ৯৮.৭ শতাংশ, মুর্শিদাবাদে ৯৬.৩ শতাংশ, নদীয়ায় ৯৭ শতাংশ, বীরভূমে ৯৬.৫ শতাংশ, বাঁকুড়ায় ৯৫.৪ শতাংশ, এবং মেদিনীপুরে ৯৩.২ শতাংশ মুসলমানের বসবাস ছিল গ্রামাঞ্চলে।

ঐতিহাসিক কার্যকারণসমূহ

ভারতে মুসলমান জনসংখ্যার ভাগবণ্টন সম্পর্কিত যেকোন অধ্যয়নেই ঐতিহাসিক ও অন্যান্য কারকগুলির আলোচনা এসে পড়ে যেগুলি সহায়তা করেছিল এক বৃহৎ মুসলমান জনগোষ্ঠীর উত্থানে, এবং নির্ধারণ করেছিল ভারতীয় উপমহাদেশে এটির ভাগবণ্টনের ধাঁচটি। নফিস অহম্‌দ ঐ কার্যকারণগুলির কয়েকটি শনাক্ত করতে অবশ্যই প্রয়াসী হয়েছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ঐতিহাসিক কারকগুলির ব্যাখ্যা—তাঁর অন্যান্য বিশ্লেষণগুলির মতো—মৌলিক বা যুক্তিনির্ভর হয়নি। স্পষ্টতই ভারতে মুসলমান জনসংখ্যাবৃদ্ধির ইতিহাস তাঁর প্রত্যক্ষ অধ্যয়ন-পরিসরের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, এবং আলোচ্য গ্রন্থটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়—যেখানে যথাক্রমে 'ভারতীয় জনতার ধর্মীয় বহুত্ববাদ' ও 'ভারতে মুসলমানী উত্তরাধিকার' নিয়ে আলোচনা হয়েছে—তিনি মূলত নির্ভর করেছেন গৌণ প্রমাণাদি ও পরোক্ষ অধ্যয়নের উপর। ভারতীয় সমাজে ইসলামের প্রভাব সম্পর্কে আধুনিক ইতিহাসকারদের বিরোধমূলক দৃষ্টিভঙ্গি তিনি বিনাবিচারে গ্রহণ করছেন। লেখকের এই মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে সারণি IV ('অনুমিত মোট এবং মুসলমান জনসংখ্যা—১০০০ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের ভারতে')-এ যেখানে অনুমিত সংখ্যাগুলি পুরোপুরিই নির্ভরশীল কে. এস. লাল-এর বিশুদ্ধ দূরকল্পনামূলক অনুমানের উপর (কে. এস. লাল : 'গ্রোথ অফ মুসলিম পপুলেশন ইন মিডিয়েভ্যল ইণ্ডিয়া', দিল্লি, ১৯৭৩)।

এই রকম বিনাবিচারে কে. এস. লাল-এর মতগ্রহণ করার ফলে নফিস অহ্‌মদ বুঝতে পারেননি যে, তাতে করে তিনি নিজেরই দৃষ্টিকোণের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর সেই দৃষ্টিভঙ্গি হল এই—যে, ধর্মান্তরের মূলস্রোতটাই এসেছিল হিন্দুসমাজের নিম্নস্তর থেকে যারা ইসলামি নীতিমালার 'উচ্চতর আদর্শে'র প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তাঁর এই দৃষ্টিকোণ অবশ্য সম্পূর্ণ মৌলিক ছিল না। ১৭শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত মুসলমান জনসংখ্যার অনুমিত বৃদ্ধি কে. এস. লাল দিয়েছিলেন, এবং এটি তিনি তৈরি করেছিলেন পুরোপুরিই কালপঞ্জিকারদের অতিশয়োক্ত বিবরণীর (হিন্দু জনতার বলপ্রয়োগে ধর্মান্তরিত ও দাসে পরিণত হওয়ার) ভিত্তিতে। তাছাড়া, চরকা, তুলা ঝাড়াইয়ের ধুনচি, কাগজ উৎপাদন, ধাতু নিষ্কাশন ও শোধন এবং জল উত্তোলনের উন্নত পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে হস্তশিল্প ও কৃষির ব্যাপক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই যে ভারতে মুসলমান শাসনের আবির্ভাব হয়েছিল—অর্থনৈতিক ইতিহাসকারদের এই বক্তব্যকে নফিস অহ্‌মদ

একেবারেই স্বীকার করেননি। এর ফলে একদিকে দেখা দেয় ইসলামি দুনিয়া থেকে কারিগরদের ব্যাপক অভিবাসন (কারণ, নতুন প্রকৌশলে দক্ষ কারিগরের চাহিদা ক্রমবর্ধমান হয়ে উঠেছিল) এবং অন্যদিকে, কারিগর জনগোষ্ঠীতে নতুন জাতপাতের—বেশিরভাগই মুসলমানি—উদ্ভব যেগুলি গড়ে উঠছিল মুসলমান হানাদারদের আনা উন্নত প্রকৌশলগুলিকে কেন্দ্র করে (ইরফান হবিব: 'টেক্‌নোলজিকাল চেঞ্জেস্ অ্যাণ্ড সোসাইটি, থার্টিনথ্ অ্যাণ্ড ফোর্টিনথ্ সেঞ্চুরিস'—সভাপতির অভিভাষণ, মিডিয়েভ্‌ল ইণ্ডিয়া সেকশন, ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস, ১৯৬৯)।

অভিবাসন

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মুসলমান জনসংখ্যাবৃদ্ধির অন্যতম কারক অভিবাসন (১৮শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত)-কেই যথাযোগ্য গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। যদিও এটা সত্যি যে, উপমহাদেশের মুসলমান জনসংখ্যার গরিষ্ঠাংশটিই স্থানীয় ধর্মান্তরিতদের বংশধর, কিন্তু এদেরও অভিবাসী-বংশজদের যে-আনুপাতিক হিসাব জনসংখ্যাবিদ্‌রা দিয়েছেন তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। ঐ হিসাবে স্থানীয় মুসলমানদের সংখ্যা বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে। উদাহরণ-স্বরূপ, ১৯১১-র আদমশুমারিতে অনুমিত হয়েছে যে, পঞ্জাবের মুসলমানদের ৮৫ শতাংশই স্থানীয় বংশোদ্ভূত। এরই ভিত্তিতে কিংসলে ডেভিস ধরে নিয়েছেন দেশের অন্যান্য অংশে স্থানীয় ধর্মান্তরিতদের সংখ্যানুপাত আরো বেশিই হবে।

কিন্তু অন্যদিকে, ১৯৩১-এর আদমশুমারিতে সমগ্র উপমহাদেশের মুসলমান জনতার জাতওয়ারি বিভাজন করা হয়েছে যা-থেকে ঐ দুই অংশের এক অন্য সংখ্যানুপাত বেরিয়ে আসে। ১৯৩১-র আদমশুমারি অনুযায়ী শেখ, পাঠান, সৈদ ও মুঘল—যাদের পূর্বপুরুষ ভারতে এসেছিল সিন্ধুর ওপার থেকে—উপমহাদেশের মোট মুসলমান জনসংখ্যার এরা ছিল ৪১.১ শতাংশ। আপাত-দৃষ্টিতে এই অংশ ভাগ আরো বেশিই হয়ত হবে পঞ্জাব ও গাঙ্গেয় সমভূমিতে কারণ, সর্বাধিকসংখ্যক অভিবাসী ঐ পথেই ভারতে এসেছিল। বহিরাগত মুসলমানদের এই সংখ্যানুপাতকে শুধুমাত্র বহু শতাব্দীব্যাপী ইসলামীকরণের ফলাফল ধরে নিলে ভুল হবে। মুসলমানদের মধ্যে, যে-গোষ্ঠীগুলি প্রথম যুগের অভিবাসী-বংশজদের স্বজন বলে দাবি করত তারা আবার স্থানীয় ধর্মান্তরিতদের গোষ্ঠীভুক্ত করতে চাইত না। জাতি উত্তরণশীলতা—যার মধ্য দিয়ে ১৪শ ও ১৫শ শতাব্দীতে বহু আদিবাসী এবং অজ্ঞাতকুল উপজাতি ও গোষ্ঠী রাজপুত জমিন্‌দারদের জাতভুক্ত হয়, এবং কালক্রমে ক্ষত্রিয়ের মর্যাদালাভ করে—মুসলমানদের মধ্যে তেমন চোখে পড়ে না। তাদের ক্ষেত্রে, কোনো গোষ্ঠীর 'উচ্চ বংশ' হিসাবে স্বীকৃতিলাভের জন্য দরকার হত ঐ গোষ্ঠীভুক্তদের ব্যক্তিগত বংশবৃত্তান্ত যার ফলে প্রক্রিয়াটি বিলম্বিত হত; এই রীতিটি তাই কার্যতঃ সীমিত হয়ে গিয়েছিল অত্যুৎসাহী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে।

তথাপি, বইটির ঐতিহাসিক পাঠ্যাংশটুকুর যে-দুর্বলতা নিয়ে আলোচনা করা হল তাতে নফিস অহ্‌মদ-এর কাজটির যথার্থ গুরুত্বের হানি হয় না। তাঁর কাজের তাৎপর্য প্রধানত হল স্বাধীনতার পর থেকে ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থানকে প্রভাবিত করেছে এমন জনসংখ্যাগত পরিবর্তনগুলির স্বচ্ছ বিশ্লেষণ। দেশভাগের পরবর্তী পর্যায়ে ভারতীয় মুসলমানদের জীবনযাপন ও সামাজিক অবস্থান সম্পর্কিত অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এই মূল্যবান সংযোজনটির জন্য নফিস অহ্‌মদ নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। সমকালীন ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর কোনো শিক্ষার্থীই পারবেন না—অন্য আরো অনেক দিক থেকে উপযুক্তভাবে লেখা—এই প্রবন্ধটিকে এড়িয়ে যেতে।

ইক্‌তিদার আলম খান